ভৃগুজাতক

শ্রীব্রারেশচন্দ্র শর্মাচার্য

মিত্র ও ঘোষ

১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

তৃতীয় সংস্করণ, আষাঢ় ১৩৬৩

—সাড়ে পাঁচ টাকা—

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

অপরূপা

জ্যোতিষীর ডায়েরী

ছক ও ছবি

মায়াকঙ্কণ

গোধূলির রঙ

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কন—বিভূতি সেনগুপ্ত

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও নিউ শ্রীদুর্গা প্রেস, ২।১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ হইতে শ্রীগৌরচন্দ্র পাল কর্তৃক মুদ্রিত।

বাবা ও মায়ের পুণ্যস্মৃতি

স্মরণে

শ্রীমতী শৈলরাণী দেবী

গীতা, দীপক, রেখা, সোমা, দীপ্তেন্দু ও টুকুনের

হাতে দিলাম

"কথা কও, কথা কও!
অনাদি অতীত, অনন্ত রাতে
কেন বসে চেয়ে রও!
কথা কও, কথা কও!
যুগযুগান্ত ঢালে তার কথা
তোমার সাগরতলে,
কত জীবনের কত ধারা এসে
মিশায় তোমার জলে।
সেথা হতে তার স্রোত নাহি আর,
কলকল ভাষ নীরব তাহার—
তরঙ্গহীন ভীষণ মৌন,
তুমি তারে কোথা লও।
হে অতীত, তুমি হৃদয়ে আমার
কথা কও, কথা কও!"

হ্যাঁ, আমি ভৃগুই তো। তোর বিয়ে হবে এক আকাট মুখখু বুড়োর সঙ্গে। ভারি আমার রূপসীরে! বড় দেমাক তোর! সব ভেঙ্গে দেবে সেই বুড়ো।

কি বললি রে কেলে ভূত? যেমনি কার্তিক দেখতে, তেমনি কথার ছিরি! উনি ভৃগু হয়েছেন! দাঁত ভেঙ্গে দেবো।

ঠাস্ ঠাস্ ক'রে চড় পড়ে গালে। পাঁজির ছেঁড়া পাতা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে কুঁচি কুঁচি ক'রে ফেলে দেয়। পা দিয়ে দূরে ঠেলে দেয় ছেঁড়া পাতাগুলো। ফণিনীর মত ফোঁস্ ফোঁস্ ক'রে গর্জে ওঠে সে—আমিও বলছি, ওই পাঁজির পাতা ঘেঁটেই তোকে সারা জীবন কাটাতে হবে।

শৈশবের খেলাঘরের ছবি ভেসে ওঠে স্মৃতির পটে। সত্যিই বুড়ো না হোক, এক আধা বুড়োর সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। আর তার পরিণামও হয়েছিল বড় মর্মান্তিক। খেলাঘরের স্বেচ্ছাবৃত সেই ভৃগু-নাম অভিশাপের মত যে আমার জীবনধারাকে এমন ভারাক্রান্ত ক'রে তুলবে, তখন তা বুঝতে পারিনি। আজ অর্ধ শতাব্দীর অপর পারে বসে যখনি ছেঁড়া পাঁজির পাতা ঘাঁটি, তখনই পিতৃব্য-কন্যা সুব্রতার সেই অভিশাপের কথা মনে পড়ে। আর ভেসে ওঠে সেই স্মৃতি, তার সঙ্গে একের পর এক উঁকি মারে জীবনের ফেলে-আসা দিনগুলি।

স্মৃতির সংহিতায় দেখি ভৃগু-সংহিতার মত বহু বিচিত্র জীবনের জীবন-লিপি; স্মৃতির পাতা উল্টে যায় এলোপাতাড়ি ঝড় ঝাপটায়—ছকের পর ছক জ্বল জ্বল ক'রে ওঠে চোখের সামনে; ভিড় ক'রে দাঁড়ায় কত প্রিয়জন, কত আপনজন। অথচ আজ তারা আমার কেউ নয়, তারা বহুদূরে। কেউ বা পিছনে, কেউ বা সামনে, কেউ বা আমার বহু আগে আমাকে ফেলে চলে গেছে; অফুরন্ত তাদের মিছিল।

ভৃগু-নামের মোহে অলৌকিক রহস্যের সন্ধানে কত অদ্ভুত মানুষের সংস্রবে এসেছি। তারাও দাঁড়িয়েছে একধারে,—তাদের কেউ গৃহী, কেউ সন্ন্যাসী, কেউ রোজা বা ফকির,—তান্ত্রিক, ভৈরব কিংবা ভৈরবী। তাদের কারো কারো কণ্ঠস্বর এখনও যেন মাঝে মাঝে শুনতে পাই। কেউ বা জীবন্ত মূর্তিতে আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। চমকে উঠি। তারপর সব কোথায় মিলিয়ে যায়। স্মৃতির কিংবা দৃষ্টির বিভ্রম কিছুই বুঝতে পারি না। হতাশ হয়ে পড়ি; তবু মন বলে, "তারা সত্য—তারা

বনমালী কবরেজ ছিলেন বেশ খানিকটা দুর্জ্ঞেয়। তিনি কবরেজী করেন। দূর-দূরান্তের গ্রাম থেকেও তাঁর কাছে লোকজন আসে। তিনি রোগীর নাড়ী দেখেন, নিদেন হাঁকেন; ওষুধপত্র দেন। লাল, নীল, হলদে, বাদামী—নানারঙের বড়িতে কয়েকটি শিশি সাজানো; কয়েকটা সাদা-কালো বোতলে আবার নানা ধরণের তেলও আছে।

কবরেজীর চেয়েও তাঁর আর এক ক্ষমতা ছিল। সেটা আমার কাছে অলৌকিক দৈবীশক্তি বলেই মনে হ'ত। তাঁর সেই শক্তিই আমাকে বেশী মুগ্ধ করেছিল। ভূত, প্রেত, দৈত্যদানা, বেহ্মদৈত্যি কিংবা পিশাচের উপদ্রব দূর করতে সেই অঞ্চলে বনমালী কবরেজের খুব নাম ডাক ছিল। নাদুস-নুদুস গোলগাল চেহারা, তার উপর মস্ত বড় ভুঁড়ি; মাথায় টাক। বনমালী কবরেজ সব সময়ই হেসে হেসে কথা বলতেন। তাঁর কথায় ভয় দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে আবার অভয়-হাসিও ফুটে উঠত। তিনি বলতেন, "প্রায় সব রোগেরই গোড়ায় আছে ঐ সকল অপদেবতার কারসাজি! মা কালীর পূজো দাও, ঢাক ঢোল বাজাও, হরিনাম কর, সব ব্যাটা পালাবে!

জ্বরের ঘোরে রোগী চেতনা হারিয়েছে; বনমালী কবরেজের ডাক পড়ল। তিনি গিয়েই রোগীর মাথায় মন্ত্র প'ড়ে জল ঢাললেন; পায়ের তলায় আদার রস গরম ক'রে বুলোতে দিলেন। তারপর রোগীর মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে কবরেজ মশাই ব'লে উঠলেন, "আর একটু দেরি হলে সেরেছিল আর কি? একে ব্রহ্মপিশাচে পেয়েছে!" রোগীর পাশে টুলের উপর বসে বনমালা কবরেজ ঝাড়ফুঁক চালালেন,

আগড়ম্ বাগড়ম্ ভুজং ঝা।
কামাখ্যা মাইয়ের মাথা খা॥
পিশাচ, পিশাচ, ব্রহ্মদৈত্যি।
কামাখ্যার নামে তিন সত্যি॥
ফু-ফা, ফু-ফা, ভুজং ঝা।
দূরে যা, দূরে যা, ঝাঁটা মারি।
নইলে যাবি যমের বাড়ি॥

ঝাড়ফুঁক শেষ হলে দেখা যায় রোগীর চেতনা ফিরেছে; রোগী জল খেতে চাইছে। মাথায় জল ঢালা, পায়ে আদার রস মালিশ করা কিংবা ঝাড়ফুঁকের জন্যই হোক্ রোগী বেশ আরাম বোধ করত। ফলে কবরেজ

মশায়ের গুণপনা বেড়ে যেত। কবরেজ অভয়-হাসি হেসে বলতেন, "ওহে নন্দলাল, ছেলে তো এযাত্রা বেঁচে গেল। দিলেম ব্যাটা বেহ্মাপিশাচকে তাড়িয়ে। কিন্তু বাবা, ব্যাটা সহজে ছাড়বার পাত্তর নয় ; তার শান্তির জন্ম মা-কালীকে পাঁঠা দিতে হবে। আজই চাই, সন্ধ্যেয় পুজো দিতে হবে। একেবারে নিখুঁত কালো,—বুঝলে ?"

ছেলের বাবা নন্দ মালাকরকে আদেশ করেন বনমালী কবরেজ। খানিকক্ষণ চোখ বুজে থেকে আবার বলে ওঠেন, "আর ঐ যে ঈশান কোণে আমগাছটা রয়েছে, ওতে আস্তানা গেড়েছে পিশাচটা ; ওটা কেটে ফেলে গাঙে ভাসিয়ে দিও। না হয় কোন বামুন-বাড়িতে জ্বালানির জন্যে দিয়ে দিও। নিজের কাজে একটা পাতা পর্যন্ত লাগাবে না।"

অপ্রতিহত প্রভাব বনমালী কবরেজের। ওই সব লোকের কাছে তিনি কবরেজ ঠাকুর, ঠাকুরবাবা ও দাদাঠাকুর নামে পরিচিত। তাঁর আদেশ অমান্য করতে কেউ সাহস করত না। প্রায়ই নিখুঁত কালো, কিংবা নিখুঁত সাদা পাঁঠার মাংসে ভোজ লাগত মা কালীর কৃপায়। বনমালী কবরেজ বেশ ভোজন-বিলাসী ছিলেন ; দশজনকে খাওয়াতেও ভালবাসতেন। বেশ আরামে ছোটবেলার কয়েকটি বছর আমার ক্ষেত্রদিদির বাড়িতে কেটেছে। শৈশবেই মাকে হারিয়েছিলাম। ক্ষেত্রদিদিকে পেয়ে সেই স্মৃতি প্রায় ভুলে গিয়েছি। তাঁদের বাড়িতে থেকেই সেখানকার হাই স্কুলে পড়তাম, সে প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার কথা।

ক্ষেত্রদিদি আমার নিকট 'খনা' হয়ে উঠেছিলেন। কথায় কথায় তিনি ছড়া কাটতেন। কড়ে আঙুল অনামিকার দ্বিতীয় পর্ব ছেড়ে গেলে না কি বাপের চেয়েও বড় হয়। তিনি বলতেন, "কড়ে আঙুল বাড়িয়া, বাপকে যায় ছাড়িয়া।" আমারই কড়ে আঙুল দেখে তিনি এ মন্তব্য করেছিলেন। বাপের অধিক সুনাম হয়েছে কিনা জানি নে, বাপকে ছাড়াতেও হয় নি ; বাবা অকালেই মারা গেছেন। আর ঘটনাচক্রে পিতৃভূমি ছেড়েছি আজ অনেক বৎসর।

বিচিত্র গুণ ক্ষেত্রদিদির। পেটের গোলমাল হলে কিংবা পেট কাঁপলে তিনি নুনপড়া দিতেন। প্রায়ই সন্ধ্যার সময় পাড়ার কেউ না কেউ পান আর নুন নিয়ে হাজির হত। ক্ষেত্রদিদির হাতে পানের উপর নুন রেখে দিয়ে

বলত,—"দিদি, ছেলেটার পেট কেঁপেছে ; কোন দুষমন নজর দিয়েছে ; তার একটা বিহিত কর।" দিদি পান আর নুন মুঠোর ধরে মন্ত্র পড়তেন,

"নুন, নুন, নুন—পেটকে গেলে করে গুণ।
রোগ-নাড়া করে খুন,—নুন, নুন নুন ॥
কার আজ্ঞে? কাউরের কামাখ্যার আজ্ঞে।
যা, যা, যা—চণ্ডী মা'র মাথা খা ॥

—হ্যাঁ গা! ছেলেটাকে একটু সাবধানে রাখতে পার না? ভারি নজর লেগেছে। এই নাও খাইয়ে দাওগে। পাঁচ পয়সা মা-কালীর নামে পুজো দিয়ে যেও।"

এইরকম করেই পাড়াগাঁয়ের সংসার তাঁদের চলে যায়। ভগিনী আর ভগিনীপতির অলৌকিক দৈবী-ক্ষমতার মোহ আমাকে পেয়ে বসল। যে কোন উপায়েই হোক না কেন, এটা আয়ত্ত করতে হবে। এ গুপ্ত বিদ্যার চাবিকাঠির সন্ধান করতে লাগলাম। দিদির কত তোষামোদ করি। দিদি বলেন, "দূর পাগলা, এগুলো শিখে কি হবে? লেখাপড়া করবি ; বড় হয়ে হাকিম হবি ; কত লোকের বিচার করবি। বংশের মুখ উজ্জ্বল হবে।"

ক্ষেত্রদিদির কথায় জ্যোতিষী মামা সারদাপণ্ডিতের কথা মনে পড়ে। তিনি বলতেন, এ ছেলে একদিন দারোগা হবে।

পুলিসের দারোগা! দারোগারা ঘোড়ায় চড়ে বেড়ায়। তাঁদের সঙ্গে চলে যত লাল পাগড়ি পুলিস ; মন্দ লালে না দেখতে। ঘোড়ায় চড়া শিখতে হবে, এ খেয়াল চেপেছিল। ঘোড়া না পেয়ে একদিন একটা মহিষের উপর চেপে বসেছিলাম। অমনি মহিষপুঙ্গব ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। ভয়ে চীৎকার করে উঠলাম; কিন্তু কে কার কথা শোনে? কখন যে মহিষের উপর থেকে পড়ে গিছলাম, ঠিক মনে পড়ে না। যখন জ্ঞান ফিরে এল, তখন দেখি বাড়িতে বিছানায় শুয়ে আছি ; সারা গায়ে বিষম ব্যথা। পা টানতে পারিনে। টানতে গেলে লাগে ; ডান পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। মাসদেড়েক পরে ঘরের বাইরে যেতে পেরেছিলাম। সেই থেকে কোন চতুষ্পদ জন্তুতে চড়বার কথা শুনলেই আমার আতঙ্ক উপস্থিত হয়।

ক্ষেত্রদিদির কথায় ভয় হ'ল। তাঁর কথা যে অব্যর্থ! চোখে জল এল। দিদিকে বললাম—"না দিদি, আমি হাকিম হতে চাইনে; ওরা যে ঘোড়ায় চাপে।"

"আচ্ছা, তুই মাষ্টার হবি,—ওই বড় স্কুলের হেড মাষ্টার!"—দিদি হাসিমুখে আমাকে সান্ত্বনা দেন।

উত্তরে বলি,—"তা মন্দ নয় দিদি! কিন্তু তোমার ঐ ছড়াগুলো আমায় শিখিয়ে দিতে হবে। স্কুলের ছেলেরা আমায় বড্ড ধরে। তারা বলে—তুই ক্ষেত্রদিদির ভাই; মন্তর-টন্তর নিশ্চয় জানিস। তোর দিদি মুখ দেখে মনের কথা বলতে পারেন। চৌধুরীদের জগন্নাথবাবুকে উনিই বলেছিলেন, হাকিম হবে।"

ক্ষেত্রদিদি আমার কথা শুনে হাসলেন—"আচ্ছা শিখিয়ে দেবো। কাউকে কিন্তু ফাঁস করে দিবিনে, আগে বল।"

উৎসাহিত হয়ে বলি,—কক্ষনো নয়; তোমার দিব্যি!

দিদি পিঠে হাত দিয়ে বলেন—কথায় কথায় দিব্যি করতে নেই। বেশ, শিখিয়ে দেবো।

উৎপলের কথা মনে পড়ে গেল। ভয়ে ভয়ে বলে ফেললাম,—আচ্ছা দিদি, ওই উৎপলটা বারবার ক্লাসে ফেল করে, তার একটা কিছু ব্যবস্থা করে দাও তুমি।

তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন—ওঃ। এই জন্যে মন্তর শিখতে চাস তুই! মন্তরের গুণে পরীক্ষায় পাশ করা যায় না রে বোকা! তোর বন্ধুকে মন দিয়ে লেখাপড়া করতে বল।

ক্ষেত্রদিদির কথা বিশ্বাস হ'ল না। মনে হ'ল তিনি আমায় এড়িয়ে যেতে চাইছেন। অভিমানের ভঙ্গীতে বলি,—বুঝেছি দিদি, তুমি আমায় ভালবাস না। এবার এখান থেকে চলে যেতে হবে দেখছি।

—কেন চলে যাবি? কি হয়েছে?

—এখানে থাকলে ছেলেরা আমাকে তিষ্ঠতে দেবে না। তুমি থাকতে তাদের কোন উপকারেই আমি লাগব না? সে হয় না।

দিদি বললেন—আচ্ছা, সেই হাসিমুখো ছেলেটা তো? বেশ, তাকে একদিন নিয়ে আসিস্।

হাসিমুখ উৎপলকে আর পরীক্ষা দিতে হয় নি। কয়েক দিনের মধ্যেই হঠাৎ ওলাউঠায় তার হাসি চিরকালের জন্য মুছে গিয়েছিল। তার হাসি-মুখ এখনও উঁকি ঝুঁকি মারে স্মৃতির পর্দায়। আর সেই সন্ধ্যায় তার সে অশ্রুঝরা আকুতি আজও ভুলতে পারিনি।

ক্ষেত্রদিদি উৎপলের আকস্মিক মৃত্যুর কথা শুনে আপসোস করেন। আমি তাঁকে বলি—তুমি যদি আগে আমাকে মন্তরটা শিখিয়ে দিতে, তাহ'লে এমন কাণ্ড হ'ত না! ফেল করবার ভয়েই সে মরে গেছে!

করুণার হাসি ফোটে দিদির মুখে; তিনি বললেন,—আচ্ছা বোকা তুই! সে কি পরীক্ষায় পাশ না করার জন্য মরেছে?

আমি উত্তর দিই,—নিশ্চয়ই। ভয়েই তার কলেরা হয়ে গেছে; না হ'লে এত কাঁদে? বড় কষ্ট হয় দিদি!

দিদি বলেন,—কষ্ট হবে বৈ কি? যাক্, এ সব কথা ভেবে আর লাভ নেই। মন দিয়ে পড়াশোনা কর।

আমি বললাম,—তার জন্য ভেবো না দিদি। আমি কি কখনও ফেল করেছি? কিন্তু উৎপলের মত কত ছেলে আছে দিদি, তাদের তো কোন উপকারই করতে পারি নে। তুমি জান না দিদি, অন্নদা মাষ্টারের চড়-চাপড়, কিল-ঘুষি আর বেতের ভয়ে কত ছেলে পড়া ছেড়ে দিয়েছে। তুমি অন্নদা মাষ্টারের মনটা একদম বদলে দাও দিদি। না হয় মাস-দুয়েক খুব অসুখ লাগিয়ে দাও—ব্যস্।

তিনি বললান,—তারপর কি হবে? আবার তো ফিরে আসবে?

আমি বললাম,—ততদিনে গায়ের বল অনেকখানি কমে যাবে; কিন্তু প্রাণে মেরো না দিদি, অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। ওদের তা হ'লে বড় কষ্ট হবে।

আমার কথা শুনে দিদি হো হো করে হেসে উঠলেন। তিনি বললেন, —আবার দরদও আছে দেখছি। অন্নদাবাবুর দোষ কি বল? কই, কোন ভাল ছেলেকে তো উনি মারধোর করেন না। মন দিয়ে পড়াশোনা করবি নে, সারাদিন কেবল আড্ডা আর ইয়ার্কি! মারেন,—বেশ করেন অন্নদাবাবু।

তাঁর কথা শুনে আর কোন উত্তর যোগায় না। তবুও অনুযোগের সুরে বলি,—সব ছেলের কি মাথা সমান দিদি! তাহলে তো সবাই ফার্স্ট হত!

দিদি হেসে উত্তর দেন,—একবার সবাই ফার্স্ট হয়ে দেখিয়ে দে না!

উত্তর দিই—সে হয় না দিদি। তুমি জান না অন্নদাবাবুর সে কিরকম মার; মেঝের উপর গড়াগড়ি দিলেও রক্তারক্তি না ক'রে ক্ষান্ত হন না তিনি।

দিদির মন বুঝি অনেকটা নরম হ'ল। তিনি বললেন,—তোদের সুমতি হোক! আমি অন্নদাবাবুর মাকে বলে দেখব।

তারপর কয়েকদিন কেটে গেল। অন্নদাবাবুর দাপট যেন কিছুটা কমে গেছে, দিন-কয়েক তাঁকে খুব বিমর্ষ দেখাতে লাগল। দু'এক ঘণ্টা ক্লাস করেই তিনি বাড়ি চলে যান। পাঁচ সাত দিন পর তাঁর স্কুলে আসাও বন্ধ হ'ল। শুনলাম, অন্নদাবাবুর ছেলের টাইফয়েড হয়েছে! আমরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। কিন্তু মনটা উস্‌খুস্‌ করতে লাগল।

অন্নদাবাবুর ছেলে আমাদের নীচের ক্লাসে পড়ত। ছেলেদের মধ্যে কেউ সাহস করে তাঁর বাড়ি যেত না। একদিন আমাদের ইংরেজীর মাষ্টার কনকবাবু বললেন,—"অন্নদাবাবুর ছেলে বাঁচে কি না সন্দেহ।" তাঁর কথা শুনে আমার বুকটা দুরু দুরু ক'রে কেঁপে উঠল। ভাবলাম, তা হ'লে কি ক্ষেত্রদিদি মন্ত্রবাণ ছেড়েছেন?

ছুটির পর বাড়ি ফিরে গিয়ে প্রায় কেঁদে ফেললাম। ক্ষেত্রদিদি বললেন,—এ কি রে, কাঁদছিস কেন?

তাঁকে বললাম—তুমি এ কি করলে দিদি? আমি কি অন্নদাবাবুর ছেলেকে এমন করে মেরে ফেলতে তোমায় বলেছি! .

দিদি বললেন,—কেন, কি হয়েছে? অন্নদাবাবুর ছেলের টাইফয়েড হয়েছে, তা আমি জানি। কেউ কি কারো এমন অনিষ্ট চিন্তা করতে পারে রে বোকা? তোরাই রাতদিন তাঁর অনিষ্ট চিন্তা ক'রে এমন সর্বনাশটা করেছিস। ভয় নেই, সে ভাল হবে।

আমি বললাম,—বাঃ রে, আমরা কি করেছি?

তিনি বললেন,—তোরাই তো অন্নদাবাবুকে জব্দ করতে চেয়েছিলি। ও-রকম করতে নেই। মা কালীর কাছে প্রার্থনা কর, ছেলেটা ভাল হয়ে উঠুক।

ক্ষেত্রদিদির কথায় সত্যই আপসোস হ'ল। সত্যই তো আমরা অন্নদা-বাবুকে জব্দ করতে চেয়েছিলাম। মনে মনে প্রার্থনা করলাম, অন্নদাবাবুর ছেলে ভাল হয়ে উঠুক।

তার পরদিন আমাদের ক্লাসের দুর্দান্ত ছেলে রমানাথ সাহস ক'রে অন্নদা-বাবুর বাড়ি গেল। রমানাথ ক্লাসে একদম পড়াশোনা পারত না; কিংবা তৈরী হয়ে আসত না। দুরন্তপনায় রমানাথ ছিল বিশেষ পাকা। অন্নদাবাবু কয়েকদিন আগেও রমানাথকে এমন বেত মেরেছিলেন যে তার পিঠ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে গিয়েছিল; তবুও রমানাথের স্বভাব বদলায় নি। আমাদের স্কুলের

টিলার উপরে অনেকগুলি কাঁঠালগাছ ও কমলাগাছ ছিল; কাঁঠালের দিনে কাঁঠালগাছে, আর কমলালেবুর দিনে কমলাগাছে রমানাথ আর তার জুড়িদার সত্যেন আদিত্যকে দেখা যেত; তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ব্রজেন। ব্রজেন নীচ থেকে ঢিল ছুঁড়ত। রমানাথ পাকা কাঁঠালের কোয়া ছুঁড়ে অনেকের জামা কাপড় নষ্ট করে দিত। এ নিয়ে প্রায়ই হৈ চৈ হ'ত স্কুলে।

সেই রমানাথ অন্নদাবাবুর ঘরে ঢুকতেই অন্নদাবাবু কেঁদে ফেললেন।—রমানাথ, এসেছিস বাবা, এই ছাখ্, খোকা আমার কেমন হয়ে গেছে। তোরা কেউ তো একদিনও দেখতে এলি না?

রমানাথ বললে,—সে কি স্যার? কেউ আসে না? আমি আজই শুনলাম—প্রদীপের অসুখ। তাই ক্লাসে না গিয়েই চলে এসেছি।

অন্নদাবাবু খুশী হলেন। সেদিন থেকে রমানাথ তার অত্যন্ত প্রিয়জন হয়ে উঠল। রমানাথের সঙ্গে অনেক ছেলেই রীতিমত অন্নদাবাবুর বাড়ি যাতায়াত করতে সুরু ক'রে দিল। প্রায় মাস খানেকের মধ্যেই অন্নদাবাবুর ছেলে প্রদীপ কতকটা সুস্থ হয়ে উঠল। অন্নদাবাবু সেই থেকে সম্পূর্ণ বদলে গেলেন। সকাল বিকাল তাঁর বাড়িতে কোচিং ক্লাস বসে গেল। যে যে বিষয়ে কাঁচা অন্নদাবাবু তাকে সে বিষয়ে পাকা করবার ভার নিজের হাতে নিলেন। আমাদের রমানাথের দুরন্তপনা অবশ্য কমে নি, কিন্তু ক্রমে সে শ্রীশবাবুর রামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রধান পাণ্ডা হয়ে উঠল। সেই রমানাথও প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল।

প্রদীপের অসুখকে কেন্দ্র ক'রে স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে একটা সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল। কনকবাবু ইংরেজী আর অঙ্ক পড়াতেন। সকলে তাঁকে খুব ভালবাসত; অবিবাহিত ছিলেন তিনি। অন্নদাবাবুর সঙ্গে আগে আমাদের একটা ব্যবধান ছিল, কনকবাবুর সঙ্গে কিন্তু সে-রকম ছিল না। কার কোথায় অভাব, কে কোনদিন খেয়ে আসেনি, কে কেন মাইনে দিতে পারলে না—এসব ছিল তার নখদর্পণে। তাঁর হৃদয়টাও ছিল উদার, তিনিই শেষে আমাদের সকল অনুষ্ঠানের নেতৃত্বে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। আমাদের দোষে তাঁর কত পয়সা যে নষ্ট হয়েছে, তা ভাবলে এখন লজ্জিত হয়ে উঠি।

যাক্ অন্নদাবাবুর স্বভাব বদলেছে! এ ঘটনার পর ক্ষেত্রদিদির উপর আমার ভক্তি আরও বেড়ে গেল; ইতিমধ্যে আমি অনেকগুলো ছড়া মুখস্থ ক'রে ফেলেছি;—কত রকমের ছড়া! নুনপড়া, তেলপড়া, ধুলোপড়া, আরো

কত কি ? সকল কথা এখন মনে নেই। ধুলোপড়াটা সাপ-তাড়ানো মন্ত্র ! সে অঞ্চলে সাপের বড় ভয় ! মুঠোর মধ্যে ধুলো নিয়ে দিদি মন্ত্রপূত ক'রে দিতেন। ঘরে ছড়িয়ে দিলে সে ঘরে আর সাপ আসতে পারত না।

কালীয়া, কালীয়া, কেউটের বাচ্চা,
বেহুলা-লখাই, মনসা ভরসা ॥
ধুলো ধুলো বেহুলার হাতে !
কার আজ্ঞে ? মা মনসার আজ্ঞে।
ধুলোর বন্ধনে বাঁধিনু ঘর।
দূরে যা, দূরে যা—সতীনের বর ॥

বর্ষাকালে মাঠে জল। পথঘাটে নৌকা চলে। শুধু বড় বড় পাকা রাস্তাগুলি পাহাড়ের আঁকাবাঁকা গহ্বর থেকে বের হয়ে মাঠের মাঝখান দিয়ে অজগর সাপের মত কোথা চলে গেছে ! সে দেশে ধানের ক্ষেতে সত্যই ঢেউ খেলে যায়। কুমুদ, কহ্লার আর নানারঙের জলজ ফুলে বর্ষার মাঠ পরম রমণীয় হয়ে ওঠে। বড় বড় মাঠ বা হাওর বিশাল সাগরের আকার ধারণ করে। মাঝে মাঝে হিজল আর বরুণ গাছের সারি। নানা ধরণের নৌকা চলে তার উপর দিয়ে। স্কুলেও বাইচ খেলার দুখানি নৌকা ছিল। বর্ষাকালে সে এক মজার খেলা ! বাইচ খেলা বা নৌকা দৌড়ের চেয়ে নৌকা ডুবিয়ে দিয়ে সাঁতার কাটাতেই ছিল আমাদের বেশী মজা।

ক্ষেত্রদিদির বাড়ির নীচে দিয়ে তরতর ক'রে বয়ে যায় পাহাড়ী ছড়া। বর্ষায় তা ধীরে ধীরে পূর্ণ হয়ে ওঠে। কত নৌকা চলে সে পাহাড়ী ছড়া দিয়ে। একদিন নৌকা ক'রে একজন রোগীকে নিয়ে জন কয়েক লোক বনমালী কবরেজের নিকট এল। পাগল রোগী। সে আবোল-তাবোল বকছে ; তাকে নাকি ভূতে পেয়েছে। দু'তিনজনে তাকে জোর ক'রে ধরে নিয়ে বসল উঠানে। কবরেজমশাই চোখ বুজে বললেন,—একে কালপিশাচে পেয়েছে।

এক মুঠো সরষে হাতে নিয়ে তিনি অবোধ্য ভাষায় ছড়া কাটতে লাগলেন। আর ফাঁকে ফাঁকে "ফুঁ—ফা দূর হ"—বলে রোগীর মাথায় সরষে ছড়াতে লাগলেন। তারপর একটি কালো বোতল থেকে ততোধিক কালো রঙের

একরকম তেল বের ক'রে নেকড়ার সলতে ভিজিয়ে বারবার লোকটার নাকে গুঁজে দিতে লাগলেন।

লোকটি কিছুক্ষণ ধরে অনবরত হাঁচতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে সে কতকটা প্রকৃতিস্থ হয়েছে বলে মনে হ'ল। বনমালী কবরেজ এইবার তার হাতে কয়েকটা সরু সরু শিকড় দিয়ে বললেন,—এগুলো হাতে রাখ। পিশাচ-টাকে বের করছি।

উঠানের একপাশে কবরেজের হুকুমে আগুন জালান হ'ল। তিনি একখানা খুন্তি চেয়ে নিয়ে তার মাথাটা সেই আগুনে গুঁজে দিলেন। খুন্তির মাথা লাল হয়ে উঠল। বনমালী কবরেজ একহাতে হুঁকোয় দম দেন, আর অপর হাতে ভুঁড়িতে হাত বুলোতে থাকেন। তারপর বলে উঠেন,—দাঁড়াও, ব্যাটাকে আগুনের সেঁকা দেবো!

লোকটির হাতে বনমালী কবরেজের দেওয়া শিকড়গুলো রয়েছে। তার উপর তিনি দু'তিন ফোঁটা জল ঢেলে দিলেন। শিকড়গুলো কিলবিল ক'রে নড়াচড়া করে উঠল। আর লোকটা ভয়ে থরথর ক'রে ভয়ে কাঁপতে লাগল। উপস্থিত সকলে ভয়ে বিস্মিত হ'ল। সত্যই তো ভূত এসেছে! ব্যাপার দেখে আমার গায়ের লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠল।

কবরেজ গর্জন ক'রে উঠলেন,—এক্খুনি চলে যা, নইলে গায়ে খুন্তির সেঁকা দেবো।

তিনি খুন্তি তুলে ধরতেই পাগল কেঁদে উঠল.—বাবাঠাকুর, মোরে বাঁচাও, তোমার ছিচরণে মাথা খুঁড়ে মরব।

তিনি গম্ভীরভাবে উত্তর দেন,—না, না, না। তোর পেজোমি আমি আজ বের করব। মিছেমিছি এ লোকটাকে চেপে ধরেছিস্! আগে তিনসত্যি কর, আর অমন করবি নে!

পাগল হাউমাউ ক'রে কেঁদে উঠল,—সত্যি, সত্যি, সত্যি। আর অমন কাজ করব না।

কবরেজ বললেন,—বল কালীমায়ের দিব্যি!

পাগল বলল,—দিব্যি, দিব্যি, কালীমায়ের দিব্যি।

এবার কবরেজমশাই হাতের খুন্তি ফেলে দিয়ে শিকড়গুলোর উপর বেশী করে জল ঢাললেন। শিকড়গুলো নিস্তেজ হয়ে গেল। তিনি বললেন—ঠিক আছে, ব্যাটা ভয়ে পালিয়েছে।

রোগী শান্ত হয়ে রইল। বনমালী কবরেজ হঠাৎ বের হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর কিছু লতাপাতা আর গাছের শিকড় হাতে নিয়ে তিনি ফিরে এলেন। একজনকে তিনি এগুলো বেশ ক'রে বেটে দিতে হুকুম করলেন।

রোগীর ভাই কমল মাঝি কবরেজ মশাইয়ের পায়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। কমল মাঝি বললে,—কি হবে বাবাঠাকুর? আর তো ভয় নেই?

বনমালী কবরেজ হেসে জবাব দেন,—না, না, ভয় নেই। কিন্তু কাল-পিশাচটা একজন কাউকে না নিয়ে তোদের গাঁ ছাড়বে না!

কবরেজের কথা শুনে আঁতকে ওঠে তারা। হাউমাউ ক'রে কমল মাঝি বলে,—বাবাঠাকুর! আপুনি রয়েছেন; আমরা কার কাছে যাব? কি উপায় হবে?

—উপায় একটা নিশ্চয়ই হবে।—কবরেজ ঘন ঘন হুঁকোয় টান দিতে লাগলেন।

এদিকে লতাপাতা ও শিকড় একসঙ্গে শিলনোড়ায় বাটা হয়ে গেল। সেই মণ্ডের কতকটা আগের সেই কালো বোতলের তেলে বেশ ক'রে নেড়ে মিশিয়ে নিলেন বনমালী কবরেজ। তারপর কাঁচি দিয়ে লোকটার ব্রহ্ম-তালুর চুল গোড়া থেকে কেটে দিলেন। পরে তালুর উপর সেই লতাপাতার মণ্ড ডেলার আকারে চাপিয়ে দিয়ে কবরেজ বললেন,—খবরদাব, তিনদিন এটা মাথাতে রাখবি; খুলবি নে।

খানিকটা নেকড়া নিয়ে তিনি তালুর উপরে সেই মণ্ডটা ঠিক ক'রে রেখে ব্যাণ্ডেজের মত বেঁধে দিলেন। কিছুটা মণ্ড একটা কলাপাতায় রেখে কমল মাঝিকে বললেন,—এটা তিন ভাগ ক'রে তিন সন্ধ্যে খাওয়াবি। তিন দিনেই ভাল হয়ে যাবে।

কমল মাঝি হাত জোড় ক'রে কবরেজের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপব বললে,—বাবাঠাকুর আদেশ করুন।

কবরেজ ভুঁড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন,—ওঃ, পিশাচটাকে গাঁ-ছাড়া করতে হবে তো!

কবরেজের কথা শুনে আবার রোগী চঞ্চল হয়ে উঠল; ভয়কাতর তার চাহনি। সে কবরেজের পা দুখানি দুহাতে জড়িয়ে ধরল।

কবরেজ হেসে বললেন,—তোর আর কোন ভয় নেই ব্যাটা। খাবিদাবি

ফুর্তি করবি। কিন্তু ওই তোদের গাঁয়ের অগ্নিকোণে মজা-দীঘির পাড়ে যে চালতা গাছটা আছে, ওখানে কখনো যাবি নে।

গাঁয়ের লোকও দু'চারজন এদের সঙ্গে ছিল, কবরেজ তাদের শুনিয়ে বললেন,—অপঘাতে মরেছে বাবা! কোন এক মাঝিরই ছেলে,—তোদের চৌদ্দপুরুষ আগে। তার কোন গতি হয় নি।

তারা সকলে একসঙ্গে বলে উঠল,—কি করলে তার গতি হবে বাবা-ঠাকুর?

—সে তোরা পারবি নে বাবা! গয়ায় পিণ্ডি দিতে হবে,—যথানামগোত্রায় বলে। সে তোমরা পারবে না।

—সে আবার কি বাবাঠাকুর?

-বনমালী কবরেজ হাসেন;—গয়া, গয়া জানিস নে? গয়া, কাশী, বিন্দাবন? গয়ায় পিণ্ডি দিলে প্রেতত্ব দূর হয়। সে অনেক দূর দেশ বাবা। তার চেয়ে এক কাজ কর! সিঁদুর মেখে মঙ্গলবার ভর সন্ধ্যেয় একটা কালো পাঁঠা ছেড়ে দে ওই চালতাগাছের তলায়। খবরদার কক্‌খনো ওই পাঁঠাটাকে আর ছুঁবি নে।

লোকগুলো সাষ্টাঙ্গে কবরেজ মশাইকে প্রণাম ক'রে বিদায় হ'ল। অবশ্য মা-কালীর পুজোর দরুণ কাপড়-চোপড়, ফলপাকড় আর কালো পাঁঠার বরাদ্দ বাদ পড়ে নি।

বনমালী কবরেজের বিচিত্র বিত্তার রহস্যময় খেলা আমাকে আরও আকৃষ্ট করল। মুগ্ধ হয়ে ভাবি, কি ক'রে এ বিত্তার অধিকারী হওয়া যায়।

তিনি বললেন,—শ্মশানে বসে ঘোর অমাবস্যার নিশাকালে সাধনা করতে হবে, সে তুমি পারবে না। তোমার যা ভূতের ভয়!

কবরেজের কথা শুনে আতঙ্ক হয়। সত্যই আমার বড় ভূতের ভয় ছিল, এগাছে ভূত, ওগাছে ব্রহ্মদৈত্য, বাঁশঝাড়ে পেত্নী—সেই জঙ্গুলে দেশের সর্বত্রই ভূতের বাস! সন্ধ্যার পর ফুলগাছে পর্যন্ত ভূতের আবির্ভাব হয়। তারা আবার পরী। পরীরা নাকি সন্ধ্যার পর ফুলগাছে নেমে আসে। তারাই নাকি ফুলের কুঁড়ি ফোটায়, রাতের বেলায় তাই ফুলবাগানে যাওয়া নিষেধ ছিল। ছোট ছোট মেয়ে তারা,—ওই পরীরা। পিঠে আবার পাখীর মত ডানাও আছে, জ্যোৎস্নারাত্রে চাঁদের জ্যোৎস্নায় তারা উড়ে উড়ে বেড়ায়। দুধে-আলতার মত গায়ের রঙ তাদের। সুন্দর ছেলেমেয়েদের নাকি তারা

ভুলিয়ে নিয়ে যায়! তাদেরই মত পরী ক'রে পরীর রাজ্যে নিয়ে গিয়ে রেখে দেয়। পরীদের দেখবার প্রবল আগ্রহ থাকলেও সকলকে ছেড়ে পরীর রাজ্যে চিরকালের জন্য চলে যেতে মন চায় না।

সন্ধ্যার পর একাকী বের হবার মত সাহস আমার ছিল না। আর টিলার নীচে দিয়ে যে আঁকাবাঁকা পথগুলো রয়েছে, তার বেশীর ভাগই দিনের বেলায় প্রায় অন্ধকার হয়ে থাকত। ভগিনীপতিকে বললাম,—আচ্ছা, আপনার তো ভূতের ভয় নেই!

তিনি সহাস্যে উত্তর দেন,—সে কি সহজে হয়েছে? ভূতগুলো এখন আমাকেই ভয় করে। গুরুর মন্ত্র পেয়েছি কি না।

আমি জিজ্ঞেস করি,—আপনি পরী দেখেছেন?

তিনি বললেন,—দেখেছি বৈ কি? পরীর দেশেও গেছি। দুধের পুকুরে তারা স্নান করে, জ্যোৎস্নার শাড়ী পরে, চাঁদের ক্ষীর খায়।

আমার কৌতূহল বাড়ে, আবার প্রশ্ন করি,—কি করে তাদের দেশে গেলেন? সেখান থেকে তো আর ফিরে আসা যায় না।

বনমালী কবরেজ এবার অর্থপূর্ণ হাসি হাসলেন। তারপর বললেন,—গুরুর মন্ত্র; বুঝলে হে, গুরুর মন্ত্র!

আমি জিজ্ঞেস করি,—বলুন না কি ক'রে এমন মন্ত্র পেলেন?

তিনি বললেন,—চৌদ্দটি ঘোর অমাবস্যা গুরুর সঙ্গে বসে শ্মশানে সাধনা করতে হয়েছে।

অমাবস্যা আর শ্মশানের নাম শুনে আমার গায়ের লোমগুলো খাড়া হয়ে ওঠে। ক্ষেত্রদিদি শুনতে পেয়ে বলে ওঠেন,—কি যে গল্প কর ছেলেমানুষের সঙ্গে! রাত্রে ঘুমোতে পারবে না, চীৎকার করে উঠবে। ছিঃ, ছিঃ!

বনমালী কবরেজ বলেন,—কি করব? ও যে মন্তরতন্তর শিখতে চায়! আমাকে তো গুরু হ'তে হবে। আগে তাই শিষ্যকে তৈরী ক'রে নিচ্ছি।

হেসে ওঠেন তিনি। দিদি বলেন,—থাক্, থাক্, আর শিষ্য তৈরী করতে হবে না।

দিনের বেলা অবশ্য আমার ভয়-ডর বিশেষ কিছু থাকে না; রাত্রের অন্ধকারেই আমার যত ভয়। আর শ্মশান?—শ্মশান যে কি জিনিস, তা তখনও পর্যন্ত দেখিনি। শুনতাম মানুষ মরে গেলে নদীর ধারে শ্মশানে

তাদের পুড়িয়ে ফেলে। আর কচি ছেলে-মেয়ে মারা গেলে বড় হাঁড়িতে পুরে সরা চাপা দিয়ে শ্মশানের জঙ্গলে পুঁতে রাখে। তার পরে বাখারি দিয়ে খাঁচার মত বেড়া দেওয়া হয়; আর চাপানো হয় কাঁটাগাছের ডালপালা। তাতে শিয়াল কুকুর মাটি খুঁড়ে মড়া বের করতে পারে না।

আমারই এক কচি ভাই মারা যায়। কিন্তু তাকে কি করা হ'ল দেখতে পেলাম না। কারণ ছোটদের তা দেখতে দেওয়া হ'ত না। কয়েক দিন পর পাশের বাড়ির ভুগী এসে বলেছিল, সন্ধান পেয়েছি রে। তোর ছোট ভাইটাকে কোথা রেখেছে, দেখে এসেছি! তার সঙ্গে গিয়ে কাঁটা দিয়ে ঘেরা কচি ভাইয়ের সমাধি দেখতে পেলাম। দুজনে অনেক কষ্টে কাঁটাগুলো সরিয়ে মাটি খুঁড়ছিলাম। আমাদের ধারণা ছিল, ভাইটিকে তুলতে পারলেই সে বেঁচে যাবে; মাটির নীচে দম বন্ধ হয়ে সে বড় কষ্ট পাচ্ছে। মৃত্যুর পরিণতি সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই তখন আমাদের ছিল না। বুড়ো ধনাই মাঝি কাঠ কুড়োতে এসে আমাদের কাণ্ড দেখে তাড়া করে।

বাড়ি ফিরে মাকে বললাম,—কেন তোমরা কচি ভাইটিকে ওরকম ক'রে চাপা দিয়ে রেখেছ? তার যে ভারি কষ্ট হচ্ছে!

আমার কথা শুনে মায়ের চোখ দিয়ে দরদর করে জল গড়িয়ে পড়ল। তিনি আকাশের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন,—ওরে বোকা! সে কি মাটির নীচে রয়েছে? মাটির নীচে তোর কচি ভাই নেই। সে আছে ঐ আকাশে।

মায়ের কথা বোঝবার মত শক্তি তখন আমার ছিল না। ভোলাকাকা বললেন,—খবরদার আর কোনদিন শ্মশানে যাসনে, ভুতে ধরবে।

বনমালী কবরেজের শ্মশান-সাধনা সেইজন্যে আমাকে বিশেষ উৎসাহিত করল না। তাঁকে বললাম,—ওই শ্মশানে-মশানে আমি যেতে পারব না।

কবরেজ তখন গম্ভীর ভাবে বলে ওঠেন,—তাহলে বুঝে দেখো, কত শক্ত এ কাজ। যে-সে লোকের কাজ নয় রে! আমার গুরুজী যে-সে লোক ছিলেন না; তিনি হাসনাবাদের রাজাকে অমাবস্যার দিন পূর্ণিমার চাঁদ দেখিয়েছিলেন।

তাঁর কথায় কৌতূহল বেড়ে যায়। মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে,—অমাবস্যায় পূর্ণিমার চাঁদ? ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, সে অসম্ভব!

বনমালী কবরেজ বললেন,—তুমি কি বুঝবে বল? গুরুজী অসম্ভবকে

সম্ভব করতে পারতেন। দীন-দুঃখী কেঁদে পায়ে পড়লে কাঁকর তুলে হাতে দিতেন, তা টাকা হয়ে যেতো।

বুঝতাম সন্ন্যাসী ও মহাপুরুষদের অসাধ্য কিছুই নেই, তাই তো তাঁরা নেংটি পরে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান, দিব্যি নাদুস-নুদুস চেহারা,—গা থেকে যেন তেল ঝরে পড়ছে। মনে মনে এরকম সন্ন্যাসী হবার সাধ জেগে উঠত। কিন্তু আগে তো ভূতের ভয় দূর করতে হবে!

কবরেজ বলেন,—গুরুজী পাগলাবাবা মরা মানুষ বাঁচাতে পারতেন, তাঁর কাছে অসম্ভব কিছুই ছিল না, দিব্যি আগুন জেলে তার উপর বসে দিনের পর দিন জপ করতেন।

তারপর বনমালী কবরেজ পাগলাবাবার গল্প সুরু করলেন,—পাগলা বাবার বাবা ছিলেন রাজার গুরু। পাগলা ছোট বেলা থেকেই একটু বোকা ধরণের ছিলেন, লেখাপড়া শেখেন নি। তাঁর বাবার এ জন্যে দুঃখের সীমা ছিল না। পাগলাবাবা আবোলতাবোল যা খুশী বকে বেড়াতেন। রাজগুরু তাতে লজ্জায় মরে যেতেন। মাঝে মাঝে আবার শ্মশানে গিয়ে বসে থাকতেন পাগলা, দু'তিন দিন বাড়ি ফেরবার নামও করতেন না। প্রথম প্রথম তাঁকে খোঁজ-খবর ক'রে ধরে আনা হ'ত, কিন্তু কে কার কথা শোনে? লোকে বলত পাগল। হাড়ি-ডোমরা বলত পাগলাবাবা। লোকের কথা শুনে তিনি শুধু হাসতেন। পরে এমন হ'ল যে সাত আট দিন তাঁর কোন পাত্তাই পাওয়া যেতো না।

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করি,—সাত আট দিন না খেয়ে শ্মশানে বসে থাকতেন?

—হ্যাঁ, বুদ্ধদেবের কথা শুনিস্ নি? ছ'বছর না খেয়ে বটগাছের তলায় বসে ছিলেন?—বনমালী কবরেজ হাসতে থাকেন।

তাই তো, তাতে আর আশ্চর্য কি? ইতিহাসের পাতায় দেখা বুদ্ধদেবের ধ্যানগম্ভীর মূর্তি তখন চোখের সামনে ভেসে উঠত।

কবরেজ বলতে থাকেন,—হাড়ি, ডোম আর মুচিরা তখনই বুঝতে পেরেছিল। তারাই মাঝে মাঝে কাঁচা দুধ রেখে আসত তাঁর সামনে। লোকে বলত, তিনি তখন ওদের হাতে ভাতও খেতেন। তাই তাঁর জাতও গিয়েছিল। বাড়ি ঢোকবার হুকুম ছিল না, বাড়িতে এলে গোয়াল ঘরের একপাশে পড়ে থাকতেন তিনি। তাঁর বাবার মনে এতে খুব আঘাত লাগে।

একমাত্র পুত্রের এ অধঃপতন দেখে তিনি সহ্য করতে পারেন নি। রাজগুরু অকালে দেহরক্ষা করলেন। রাজবাড়িতে পাগলাবাবার যাওয়া নিষেধ ছিল। পাগলাকে সবাই কত বোঝালে কিন্তু পাগলা কোন কথা বলে না। অবশ্য রাজবাড়ি থেকে নিত্য একটা সিধে বরাদ্দ ছিল, তাতে কোনরকমে মা-পোয়ের খাওয়াটা চলে যেতো। একদিন হঠাৎ পাগলা ঠাকুর রাজসভায় গিয়ে হাজির হলেন। পাগলাকে দেখে সবাই হাসাহাসি করতে লাগল। তাঁকে অপদস্থ করবার জন্যে একজন হঠাৎ প্রশ্ন করলেন,—ওহে ঠাকুর! আজ কোন তিথি?—পাগলা আকাশের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলেন,—আজ পূর্ণিমা।

সেদিন অমাবস্যা ছিল। রাজা শুনে ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁরই গুরুপুত্র এমনি গোমূর্খ! তিনি হুকুম দিলেন,—পাগলাকে গারদে পুরে রাখ। ওকে আজ পূর্ণিমা দেখাতে হবে। নইলে নিস্তার নেই!

আমি বললাম,—কেন? একে তো পাগল, তার ওপর গুরুর ছেলে! রাজা তাঁকে ক্ষমা করতে পারলেন না?

কবরেজ বললেন,—তা হলে আর মাহাত্ম্যটা প্রচার হবে কি ক'রে? হনুমান যদি মাথায় ক'রে সীতাকে সাগর পার ক'রে নিয়ে আসত, তাহ'লে কি আর রাবণ বধ হ'ত? সাতকাণ্ড রামায়ণ লেখা হ'ত? এসব মহামায়ার লীলা!

আমি বললাম,—রাজা খুব বদরাগী ছিলেন বলুন?

কবরেজ বললেন,—বাব্বা! সেকালের রাজারাজড়া! দরকার পড়লে নিজের ছেলেকেই জ্যান্ত পুঁতে ফেলত।

গল্প-গুজবে, রূপকথায়, এমন কি ইতিহাসেও জ্যান্ত মানুষকে পুঁতে ফেলার অনেক কাহিনী শুনেছি বা পড়েছি। সুতরাং কবরেজের কথায় চুপ ক'রে গেলাম। এদিকে অসহায় পাগলাঠাকুরকে যেন রাজার গারদে বন্দী অবস্থায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি; তাঁর জন্য দুশ্চিন্তা হ'ল। তাঁর পরিণাম জানতে কৌতূহল হ'ল। রাজার হাত থেকে কি ক'রে তিনি নিষ্কৃতি পেলেন? প্রশ্ন করলাম, —তারপর কি হ'ল?

কবরেজ গম্ভীরভাবে বললেন,—কি আর হবে! পাগলা রাজার গারদে গেলেন। তিনি তো মোটেই বোকা কিংবা মুখখু ছিলেন না; আসলে ছদ্মবেশী পরমজ্ঞানী সিদ্ধপুরুষ তিনি। তাঁর কাছে কি গারদ, কি নরক, কি

স্বর্গ সবই সমান। সন্ধ্যে হয় হয়, পাগলা ঠাকুর তাঁর গুরু আগমানন্দকে স্মরণ করলেন। তিনি তখন তিব্বতে শতমুখী বরফের গুহায় সমাধিমগ্ন। আগমানন্দ শিষ্যের বিপদ বুঝতে পারলেন। তিনি ডাকলেন মা কালীকে। মা কালী আগমানন্দের সামনে সশরীরে হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করলেন,—"কি বাবা? হঠাৎ ডাকলে যে? কি করতে হবে?" আগমানন্দ বললেন,—"যাও মা, ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করোগে; আজ অমাবস্যায় পূর্ণিমার চাঁদ দেখাতে হবে।" কালী মা বললেন,—"বহুৎ আচ্ছা।" আকাশে উড়লেন তিনি। নিমেষের মধ্যে হাসনাবাদের আকাশে নিজের বাঁ-পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ ছুঁড়ে মারলেন। আকাশে উঠল পূর্ণিমার চাঁদ। রাজা দেখে শুনে স্তম্ভিত হলেন। যে পণ্ডিত পাগলাবাবাকে ঠাট্টা করেছিল, সে হ'ল মূর্ছিত!

কবরেজের গল্প শুনে আমি স্তম্ভিত ও তন্ময় হয়ে পড়েছিলাম। মনে হ'ল হাসনাবাদের আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে আমিও চাঁদ দেখছি। কোথায় তিব্বত আর কোথায় হাসনাবাদ? পাগলাঠাকুরের উপর ভক্তি বেশ বেড়ে উঠল। কবরেজকে প্রশ্ন করলাম,—তারপর রাজা কি করলেন?

বনমালী কবরেজ যেন ভক্তিতে গদগদ হয়ে উঠলেন। তিনি দু'হাত জোড় ক'রে কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। তারপর বললেন,—ভয়ে রাজা থরহরি কাঁপতে লাগলেন; মূর্ছা হয় আর কি! হন্তদন্ত হয়ে তিনি গারদে ছুটে গেলেন। পাগলা তখন হিঃ হিঃ করে হাসছে, আর আওড়াচ্ছে—

চতুর্ভুজাং লোলজিহ্বাং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্।
নীলোৎপলদলপ্রেক্ষাং শত্রুসংঘবিনাশিনীম্॥
নরমুণ্ডং তথা খড়্গাং কমলঞ্চ বরং তথা।
বিভ্রাণাং রক্তবদনাং দংষ্ট্রালীঘোররূপিণীম্॥
অট্টাট্টহাসনিরতাং সর্বদা চ দিগম্বরীম্।
শবাসনস্থিতাং দেবীং মুণ্ডমালা বিভূষিতাম্—

—রাজা তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন,—ঠাকুর মাপ কর। অপরাধ হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছিলেন রাজসভাসদ্ পণ্ডিতেরা। পাগলার মুখে এমন সংস্কৃত আবৃত্তি শুনে তাঁরাও হতবাক্। হাঁটুগেড়ে হাতজোড় ক'রে তাঁরা পাগলার স্তুতি করতে লাগলেন,—"ছদ্মবেশী হে মহাভাগ! আমাদের অপরাধ মার্জনা কর।" পাগলা তো হেসেই খুন। তারপর বললেন,—"ওঠ রাজা, ওঠ, অজ্ঞান তুমি; তোমার অপরাধ হয় নি। কালী-মা তোমায় ক্ষমা

করেছেন।" রাজা উঠে দেখেন পাগলা নেই; এতগুলো চোখের সামনে পাগলা একদম অদৃশ্য হয়ে গেছে। পরের দিন দেখা গেল, সাগরদীঘির পাড়ে এক বটতলায় পাগলা বসে রয়েছে। রাজা মন্দির ক'রে দিলেন। সে অবস্থায় পাগলাবাবা কমসে কম সেখানে তিনশো বছর বেঁচে ছিলেন। রাজার দেওয়া সে মন্দিরেই হাসনাবাদের কালীর প্রতিষ্ঠা করে গেছেন পাগলাঠাকুর। এখনও লোকে বলে, হাসনাবাদের মন্দিরের উঠোনে দাঁড়ালে অমাবস্যার রাত্রেও নাকি চাঁদ দেখা যায়।

পাগলাবাবার গল্প আমাকে মোহিত করল। বনমালী কবরেজের কাছে এর পর পাগলাবাবার অনেক অলৌকিক কাহিনী শুনেছি। পাগলা নাকি দশ বছর আগেও বেঁচে ছিলেন! এমন মহাপুরুষকে আর দেখতে পাব না ভেবে আপসোস হ'ল। উপস্থিত পাগলাবাবার শিষ্য বনমালী কবরেজের দৈবী ক্ষমতার উপরই আমার লোভ বেশী। কিন্তু শ্মশানের কথা ভাবতেই যে গা শিউরে ওঠে; রাত্রির অন্ধকারকেই ভয় ক'রে, তার ওপর অমাবস্যা তো আরও ভয়াবহ ব্যাপার। সেই ভূতের দেশে সন্ধ্যার পর ঘর থেকে বের হতেই আমার সাহস হ'ত না।

বাসুদেবের রথের কথা আজও আমার মনে পড়ে। দিদির বাড়ি থেকে বাসুদেবের মন্দির এক ক্রোশের মধ্যেই। উঁচু টিলার উপর মন্দির। টিলাটি ঘিরে চক্রাকারে সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে কমলালেবুর গাছ, তার মাঝে মাঝে আবার সুদৃশ্য নাগকেশর ও চাঁপা গাছের সারি। তার মাঝখান দিয়ে উপরে ওঠবার জন্য পাথরের সোপান শ্রেণী। টিলার সামনে প্রকাণ্ড দীঘি; বারো মাস দীঘিতে জল থই থই করে; বড় বড় মাছ খেলে বেড়ায়। বাসুদেবের দীঘির মাছ ধরতে নিষেধ আছে। এই দীঘির পাড় দিয়েই রথ টানা হয়। আট দশ দিন রথের মেলা থাকে। সে কয়েকদিন এ অঞ্চলটা বেশ সরগরম হয়ে ওঠে। কত পশারী, দোকানী জড় হয় সে মেলায়।

রথের মেলা দেখা এক প্রলোভনীয় আকর্ষণ। এদিকে বন্ধুদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গভীর হ'তে লাগল; বাসুদেবের পূজারীদের মধ্যে ব্রজেন আমারই সহপাঠী ছিল। রথের কয়েকদিন ছুটির পর তার বাড়িতে আমাদের আড্ডা জমত। রাস্তায়ই পড়ত উৎপলের বাড়ি। সেখানেও ছিল আমাদের আড্ডা। উৎপল নেই, সুতরাং তার বাড়ির দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাসই

পড়ত। বন্ধুদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রথের মেলায় সন্ধ্যা কাটানো যেন একটা বাতিক হয়ে উঠল। ক্ষেত্রদিদি মাঝে মাঝে বকতেন; আর বনমালী কবরেজ হেসে বলতেন,—আমার সাকরেদ হবে কি না, তাই সাহস বাড়াচ্ছে; ভয় কাটাচ্ছে।

আসলে কিন্তু আমার ভয় মোটেই কাটেনি। বন্ধুদের কেউ না কেউ সে সময় আমার সঙ্গী হ'ত। তাদের মধ্যে সুমন, রমাপদ আর ওয়াহিদের কথা বেশী মনে পড়ে; ওয়াহিদ ছিল অসমসাহসী। তার বাড়ি ছিল আমাদেরই পাড়ায়। সম্ভ্রান্ত মুসলমান-ঘরের ছেলে সে। ভূতপ্রেত কিংবা দৈত্যদানায় সে বিশ্বাস করত না! ওয়াহিদের পাল্লায় পড়ে আমারও সাহস বেড়ে গেল। ওয়াহিদ ছিল আমার সেই ভূতপ্রেত-সমাকীর্ণ অন্ধকার পথের সঙ্গী। আমি ভয়ে থরথর ক'রে কাঁপতাম; গা ছমছম ক'রে উঠত। ওয়াহিদ প্রায় বুকে জড়িয়ে ধরে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিত। ওয়াহিদের সেই সুন্দরকান্তি তেজভরা মুখ, সে স্নেহস্পর্শ—আজও আমার অনুভূতি থেকে মুছে যায় নি।

রথের মেলায় গিয়েছি; সেদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ওয়াহিদ আজ সঙ্গে নেই। ভাবনা হ'ল, বাড়ি ফিরব কি ক'রে? আমাদের গলির পথে যে ভূতের বাস। বন্ধুদের তো তা প্রকাশ করতে পারিনে! তারা দু'একজন বড় রাস্তার মোড় পর্যন্ত আমার সঙ্গে এসে ফিরে গেল। তারপরই নিচু গলির আঁকাবাঁকা পথ। রাস্তার ধারেই একটা কাঁচা বাঁশের গুঁড়ি পড়েছিল, তা তুলে নিলাম; ভাবলাম, বিপদের সময় কাজে লাগবে! পথ নয়ত, একটা সুড়ঙ্গ বলা চলে।

দু'ধারে উঁচু টিলা। টিলার ওপর আনারসের বাগান। মাঝে মাঝে তেজপাতা ও আম কাঁঠালের গাছ; টিলার নীচেব ধাপে বাঁশের ঝাড়। দুধারের গাছপালা সুড়ঙ্গপথের উপর একটা আবরণ সৃষ্টি করেছে। তারই ফাঁক দিয়ে কোন কোন জায়গায় চাঁদের আলো পড়েছে সুড়ঙ্গ পথের ওপর। বুকটা ঢিপ ঢিপ করতে থাকে। ওপরের ডালপালা হাওয়ায় নড়ে ওঠে। চাঁদের আলো-পড়া রাস্তার অংশটায় যেন ছায়ামূর্তি নেচে ওঠে। জোর ঝাপ্‌টা লাগে কোন গাছের ঝোপে। হয়ত, কোন শিয়াল পালিয়ে যায়।

আজ যে রকম সহজভাবে কথাটা লিখছি তখন কিন্তু আমার মনের অবস্থা এমন সহজ ছিল না। চাঁদের আলো আর গাছের ছায়া আমার

মতিভ্রম ঘটাল। পিছনে ফিরতে ভয়, সামনে এগিয়ে যেতেও ভয়; ভূতেরা যেন আমাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। গাছের শুকনো পাতা ঝরে পড়ছে; তার ওপর দিয়ে সাপ, ব্যাঙ কিংবা শিয়াল চলে যাচ্ছে; খস্ খস্ শব্দে গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। ক্ষেত্রদিদির উপর আমার বড় অভিমান হ'ল। আমাকে যদি ভূতের মন্ত্রটা শিখিয়ে দিতেন! সামনে তাকিয়ে দেখি,—অদ্ভুত ধরণের কি একটা জীব আমার সুমুখ দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

কি আশ্চর্য! কি অদ্ভুত দেখতে! এ কি মানুষ? না, অন্য কোন জন্তু? গোরু না গাধা? কিছুই ঠাহর করতে পারছিনে। চাঁদের আলো যখন কোন ফাঁকে তার ওপর পড়ে, তখন মনে হয়, হাতীর মত তার মাথা অথচ নীচের দিকটা মানুষের মত। আবার মনে হয়,—ঘোড়ার মত মুখ, নীচের দিকটা মানুষের মত! এ কি কিন্নর?—বটতলার মহাভারতে তাদের ছবি দেখেছি! কিন্তু তারা তো থাকে হিমালয়ে!

মহা ভাবনায় পড়লাম। হঠাৎ মনে হ'ল, এটা নিশ্চয়ই ভূত। আর রক্ষে নেই; মরীয়া হয়ে উঠলাম; হায়, ওযাহিদ্ কোথা তুই? দিদি বলেছিলেন, ভূতকে আঘাত করলেই মরে যায়; আঘাত ক'রে আর ভূতের দিকে তাকাতে নেই; ছুটে পালাতে হয়। তাহ'লে পরের দিন দেখা যাবে, একটা মরা কাক সেখানে পড়ে রয়েছে।

আর যখন কোন উপায়ই নেই, তখন শেষ পন্থাই ধরতে হবে। ছুটে গিয়ে বাঁশের সেই গুঁড়িটা দিয়ে ভূতের মাথায় গায়ের জোরে আঘাত করলাম; কিন্তু ছুটতে গিয়ে ভয়ে পড়ে গেলাম। প্রাণপণ চীৎকার ক'রে উঠলাম—"মাগো, মেরে ফেললে রে।" আমার আর্তনাদের প্রতিধ্বনি আমাকে আরো ভয়ার্ত করে তুলল।

সেই ভূত বলে উঠল,—"কে রে ছোঁড়া? দেখি,—এ কি? ক্ষেত্রদিদির ভাই?" এই বলে—সত্যিকারের ভূত নয়,—ক্ষেত্রদিদির ভক্ত বংশী মালী, মাথার বোঝা ফেলে দিয়ে আমাকে ভূমিশয্যা থেকে টেনে তুলল। তার মাথায় ছিল বস্তা-বোঝাই আনারস। রথের বাজারে বেচতে গিয়েছিল; আঘাতটা আনারসের বস্তার উপর দিয়েই গিয়েছে।

বুড়ো বংশী মালী বললে,—কি হয়েছে? ভয় পেয়েছিস? এমন রাত বিরেতে একলা বের হয়?

আমার ভয় কাটে না। শুনেছিলাম, ভূতেরা মায়া জানে; তারা নানান রূপ ধরতে পারে। তাই চাক্ষুষ বংশী মালীকে দেখতে পেয়েও আমার আতঙ্ক দূর হ'ল না। তার কথায় কোন সাড়া না দিয়ে থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগলাম। বংশী আবার বোঝা মাথায় নিয়ে আমার হাত ধরে বললে,—চল, চল, ভয় কি রে? তুই যে ক্ষেত্রদিদির ভাই!

বংশী আমাকে প্রায় ঠেলে নিয়ে চলল; রাস্তায় জিজ্ঞেস করলে,—কেন এমন করে বাঁশের গুঁড়িটা মারলি? কি মনে করেছিলি বলত?

আমার মুখে কোন কথা সরে না, তবুও বংশী বিড়বিড় করে কত কি বলতে লাগল। বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে বংশী পথের কাহিনী বর্ণনা ক'রে বলল,—বড্ড ভয় পেয়েছে দিদি, আমি আসি।

বংশী চলে গেল। আমার ভূতের ঘোর তখনও কাটে নি। উপস্থিত সবাই তখন আমার কাছে ভূত। মনে হ'ল, আমি ভূতের রাজ্যে ভূতের বাড়িতে এসেছি। ক্ষেত্রদিদিকে দেখে কিছু সাহস হ'ল বটে, কিন্তু প্রদীপের আলোতে তাঁর ছায়া মাটিতে পড়ে কি না বারবার লক্ষ্য করতে লাগলাম।

সেই রাত্রে আমার খুব জ্বর এল। কয়েকদিন প্রায় বেহুঁশ ছিলাম। আমার জন্য নামকরা এলোপ্যাথ ডাক্তার এলেন। বনমালী কবরেজ চিকিৎসা করেন নি, কিংবা ঝাড়ফুঁক ক'রে ভূতও তাড়ান নি।

যেদিন কিছু জ্ঞান হ'ল, চোখ খুলে দেখি, বন্ধুদের অনেকেই আমার পাশে রয়েছে। ওয়াহিদের চোখে জল, তার সে কি আপসোস! সেদিন থেকে সে আর কখনও সন্ধ্যায় বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত আমার সঙ্গ ছাড়া হ'ত না। সুমনকুমার প্রতিষ্ঠাবান্ লোকের ছেলে; অনেক নিচু ক্লাসে পড়লেও তারা কয়েকজন সেই থেকে আমার কিশোর জীবনের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল; অদ্ভুত ধরণের অসুখ নাকি আমার হয়েছিল। বিকারের ঘোরে নাকি আমার মুখে দৈববাণী শুনেছিল অনেকে।

বনমালী কবরেজ আমার অবস্থা দেখে রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। আমার তাপসী ক্ষেত্রদিদি কত রাত যে আমার শিয়রে বসে বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছেন, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। সৌম্যমূর্তি দাশ-মহাশয়ের কথা মনে পড়ে।—তিনি ছিলেন সেখানকার স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। বড় মহান্ ও উদার ছিলেন তিনি। তাঁকেও দেখেছি আমার রোগশয্যার পাশে। তাঁর

বাৎসল্যের দান পরবর্ত্তী কালে আমাকে এগিয়ে দেবার পথে অনেকখানি সহায়তা করেছে।

আমাকে কেন্দ্র করে বনমালী কবরেজের বাড়ি তখন স্কুলের ছেলেদের এক প্রধান আড্ডা হয়ে উঠল। অতি গোঁড়া ব্রাহ্মণ, কায়স্থ আর বৈদ্যের প্রতিপত্তি সে দেশে। গোঁড়ামি আর ছুৎমার্গের ধ্বজা তখন পূর্ণ মাত্রায় উড়ছে। শ্রীশবাবুর রামকৃষ্ণ আশ্রম কতকটা সে আগল ভাঙলেও আশ্রমের বাইরে সনাতনীদের শাসন খুব কড়াই ছিল। দাশ-মশাইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদার আরো অনেকে সে অঞ্চলে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে দু'একজন স্কুল কিংবা স্কুলের ছাত্রদের বিরুদ্ধে নানারকমের ঘোঁট পাকাতে লাগলেন।

এদিকে কবরেজের কালো পাঁঠার দাবী অতিরিক্ত মাত্রায় বেড়ে চলল। ক্ষেত্রদিদি যেন মহোৎসব লাগিয়ে দিলেন। গোঁড়া হিন্দুর বাড়িতে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসবের মত ভোজ। সমাজের ধ্বজাধারীরা চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখাতে লাগলেন। ক্ষেত্রদিদি আর কবরেজ মশাই কিন্তু অচল ও অটল হয়ে রইলেন। সন্তানহীনা ক্ষেত্রদিদির স্নেহ মমতায় বন্ধুবা মুগ্ধ। হিন্দু মুসলমানের ভেদাভেদ তাঁর ছিল না। এমন কি আমার বাবা অসুখের খবর পেয়ে আমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাইলে বন্ধুরা আমায় কিছুতেই ছেড়ে দিলে না। তখনকার দিনের সমাজে ছুৎমার্গীদের বিরুদ্ধে এরূপ দাঁড়ানো বড় সহজ কথা ছিল না।

আমার শৈশবের সেই অভিশপ্ত ভূতনাম আর আমার ভূতের ভয়ে রোগের বিকার আমাকে এখন আরো বিব্রত ক'রে তুলল। তার উপরে ক্ষেত্রদিদির সঙ্গে আমার সম্পর্ক আমাকে বন্ধু মহলে একটা বিশেষ আসন দান করল। দল বাড়তে লাগল : ওয়াহিদ ও সরোজ রীতিমত ছায়াসঙ্গী হয়ে পড়ল। পনেরো কুড়িদিন আমার বিশেষ কোন হুঁশ ছিল না, তারপর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলাম। সরোজ তখন এখান ছেড়ে বহুদূরে চলে গেছে।

নূতন বন্ধু অনেক জুটেছে। কি জানি কেন—সেই অভিজাত-প্রধান অঞ্চলে উপরের ক্লাসের বা বয়স্ক ছেলেদের সঙ্গে নীচের ক্লাসের ছেলেদের প্রকাশ্যে মেলামেশা নিষেধ ছিল। এমন কি এর জন্য সময় সময় কঠোর শাস্তিও পেতে হ'ত। বড় মজার ব্যাপার এটা! আমরা দল বেঁধে সেটা ভেঙ্গে দিয়েছিলাম। হয়ত আমার ভূতত্বই সেখানে আমাকে রক্ষা করেছে।

ক্ষেত্রদিদির এক সই ছিল—আজিজের মা। মুসলমান হ'লেও বিধবা আজিজের মা ব্রাহ্মণের বিধবার মত থান কাপড় পরতেন। সাদা মার্বেল পাথরের মত তাঁর গায়ের রঙ, মুখখানি যেন কোন ভাস্কর খোদাই ক'রে গড়েছে। আজ দেশবিদেশের মার্বেল মূর্তি দেখে আজিজের মায়ের মুখখানি মনে পড়ে। আজিজের মা প্রায়ই কালো থান কাপড় পরতেন। সেই মার্বেল মূর্তিকে কালো রঙের থান কাপড়ে আরো সুন্দর দেখাত। কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল তাঁর ঘরদুয়ার। আজিজের মাও মন্ত্র-তন্ত্র জানতেন।

আজিজ নাকি কোন দূরদেশে আসামের এক শহরে দর্জির কাজ করে, কালেভদ্রে সে বাড়ি আসে। তাকে কোনদিন দেখিনি। আজিজের মা একাই বাড়ি আগলে থাকতেন। কতদিন তাঁর বাড়িতে গিয়েছি। আজিজের মা নারকেলের লাড়ু ক'রে রাখতেন, আমি গেলেই খেতে দিতেন। আমাকে বলতেন,—"কে দেখে ফেলবে, এখানে দাঁড়িয়ে চুপি চুপি খেয়ে ফেল। জল দিতে পারব না, ওই কুয়ো থেকে তুলে নাও।" আমি কিন্তু তাঁর ঘরে ঢুকে জল গড়িয়ে নিতাম। আজিজের মা হাসতেন, আর বলতেন,—"তোমার জাত গেল।"

সেই আজিজের মার পিছনে লাগলেন রেজাক চৌধুরী। তাঁদের নাকি বারবার বিয়ে হতে পারে। আজিজের মা বিধবাই থাকতে চান, রেজাক চৌধুরীর তা সহ্য হয় না। তিনি ছিলেন আজিজেরই এক সরিক। মামলা-মোকদ্দমা ক'রে আজিজের মাকে উত্যক্ত করে তুলেছিলেন। হিন্দুরাও আজিজের মায়ের হয়ে রেজাক চৌধুরীকে বাধা দিয়েছিল। ঘাত-প্রতিঘাতে আজিজের মায়ের মুখখানিতে বিষাদের ছায়া দেখা দিয়েছিল, কিন্তু তা স্নিগ্ধতা হারায় নি।

আজিজের মাকে আমি ডাকতাম বড়দি। কারণ ক্ষেত্রদিদি তাঁকে দিদি বলে ডাকতেন! আজিজের চিঠি এলে আমি তাঁকে পড়ে শোনাতাম, আবার উত্তরটাও লিখে দিতাম। প্রবাসী ছেলের জন্য মায়ের উন্মনা ব্যাকুলতা দেখে তখন নিজেই ব্যথিত হতাম। আজিজের চিঠির কথা যখন তিনি শুনতেন, তাঁর চোখ দিয়ে দরদর ক'রে জল পড়ত আবার মুখে হাসিও ফুটে উঠত।

রেজাক চৌধুরীর মেয়ে সাকিনাকেও আজিজের মায়ের বাড়িতে দেখেছি, তেরো-চোদ্দ বছর তখন তার বয়স, খিল খিল ক'রে হাসত। বাপের সঙ্গে

আজিজের মায়ের শত্রুতা চললেও মেয়েটি তার ধার ধারত না। কাছেই বাড়ি। প্রায়ই আজিজের মায়ের কাছে তার দিন কাটত। সেলাই, বোনা ও হাতের কাজ শিখত আজিজের মায়ের কাছে। বালিশের ওয়াড়ে আজিজের মা সুতো দিয়ে কত চিত্র বিচিত্র ফুলপাতা তুলতেন। তাঁর কাঁথা সেলাই এক বিচিত্র ব্যাপার; কাঁথার মধ্যে চিত্রে গল্প রচনা হ'ত। আজ আজিজের মায়ের সেই কাঁথার মূল্য বুঝতে পারছি। আমাকে তিনি একলব্যের গুরুদক্ষিণার চিত্র-আঁকা একখানি কাঁথা তৈরী ক'রে দিয়েছিলেন! কিন্তু তখন তার মূল্য বুঝিনি।

কোন কোন দিন তন্ময় হয়ে আজিজের মায়ের কাঁথা সেলাই দেখতাম। সাকিনা এসে পিছন থেকে আমার চোখ টিপে ধরত। খিলখিল ক'রে হেসে বলত, 'বলত কে?' কিশোরী সাকিনা উচ্ছ্বসিত আনন্দে যেন ফেটে পড়ত। আজিজের মা বলতেন,—'জানিস ভাই, বাড়িতে ওর শান্তি নেই। নিজের মা নেই তো, অনেকগুলো সৎমা। তাই আমার কাছে পালিয়ে আসে। বাপটাও তেমনি! কি করবে বল?' শুনেছিলাম সাকিনা আজিজের বাগ্দত্তা। রেজাক চৌধুরী কিন্তু ক্ষেপে আছে; কিছুতেই তা হ'তে দেবে না।

সাকিনার সঙ্গে এরূপ লুকোচুরি খেলায় উৎপলের বোন উমাও যোগ দিত। আমার লজ্জা অত্যন্ত বেশী ছিল। আমি এরকম মেয়েদের খেলা থেকে দূরে থাকতাম, তাদের সঙ্গে মিশতেও পারতাম না। সে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক। একদিন সাকিনা আর উমা খেলা করছে; আমি দাঁড়িয়ে আছি। ঠিক এমনি সময় রেজাক চৌধুরীর আবির্ভাব হ'ল,—'তোবা, তোবা! হারাম, হারাম,' বলে তিনি তেড়ে এলেন। সাকিনা ছুটে আজিজের মায়ের ঘরে ঢুকে পড়ল। রেজাক চৌধুরী বললেন,—"একি আজিজের মা! আমার মেয়েকে কাফের ছেলের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিচ্ছ?" আজিজের মা গম্ভীর স্বরে বললেন,—"এরা বাচ্চা ছেলে-মেয়ে, কাফের-টাফের ভেদাভেদ এদের কাছে নেই; তাদের মনও আমাদের মত পেকে ওঠেনি। ভাই বোন খেলা করে না?" রেজাক চৌধুরী বললেন,—"কি বলছ? ভাই-বোন? আর বাচ্চা ছেলে মেয়ে।" রেজাক চৌধুরীর মুখে বিশ্রী হাসি। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। আজিজের মা বললেন,—"কি দরকার চৌধুরী সাহেব! কোন দরকার আছে?" চৌধুরী বললেন,—"আছে বৈ কি? মিছামিছি আমাদের মধ্যে বিবাদ থাকে কেন? সেটা মিটিয়ে ফেললেই হয়।

শুধু একটা কথা—।" আজিজের মায়ের পাষাণ-খোদাই মুখ যেন আরো কঠোর হয়ে গেল। তিনি বললেন,—"ছিঃ—এক্ষুনি এখান থেকে চলে যান, আমার বাচ্চারা সামনে রয়েছে।" আজিজের মা আমার পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন, হঠাৎ আমার মাথাটা তাঁর বুকে চেপে ধরলেন। রেজাক চৌধুরী "যত আপদ্, যত আপদ!" বলতে বলতে বিদায় নিলেন।

সাকিনা তো কেঁদে আকুল! আজিজের মা তাকে সান্ত্বনা দিলেন। রেজাক চৌধুরীর আচবণ আমাকেও বিস্মিত করেছিল। কয়েকদিন আগে রেজাক চৌধুবীর কি এক শক্ত অসুখ কবেছিল, বনমালী কবরেজের কৃপায় সে ভাল হয়ে ওঠে। চৌধুরীসাহেবের নতুন বিবির তিনি ছিলেন ধর্মবাপ। সেদিন বনমালী কবরেজকে রেজাক চৌধুবীর কাছে যেতে হয়েছিল, আজিজের মায়ের অনুরোধে।

সাকিনাকে আরো দু'একবার দেখেছিলাম। তবে সেদিন থেকে সে খুব সাবধানেই চলত। আজিজের মাযের বাড়িতে আসার অভ্যাস তার একেবারে যায়নি। একদিন তার চোখে জলও দেখেছিলাম, যেদিন ক্ষেত্রদিদির বাড়ি থেকে আমাকে সেখানকার পাঠ শেষ ক'রে চলে আসতে হয়েছিল।

আজিজের মাও মন্ত্রতন্ত্রের কারবাব করতেন, কিন্তু তাঁর এ কারবারে কোন দাবীদাওয়া ছিল না। পীরের মোকামে পাঁচটি কিংবা দশটি চেরাগ বা মোমবাতি জ্বালিয়ে দিতে বলতেন। যে সব মেয়ের ফিটের ব্যারাম হ'ত তারাই তাঁর কাছে বেশী আসত। পর্দানশীন মেয়েদেব মধ্যেই এ রোগটা বেশী দেখেছি। তিনি লতাপাতা বেটে ওষুধ তৈরী ক'রেও এসব রোগে দিতেন। আজিজেব মায়ের মন্ত্রপড়া কিন্তু অন্য ধরণের ছিল। পাশের গাঁয়ের হাতিম মিযার মেয়ে সেলিমার একবার ফিটের ব্যারাম হয। সেলিমাকে নিয়ে তার বাবা হাতিম মিয়া আজিজের মায়ের বাড়ি এলেন। পাল্কী থেকে বোরখা-পরা সেলিমা বের হয়ে বড়দির বারান্দায় এসে একখানি টুলের উপর বসল। বড়দি তার বোরখা খুলে দিলেন। ষোল সতের বছর তার বয়স; বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলেপিলে হয নি। ফিটের অসুখের জন্য শ্বশুববাড়ির লোকেরা বাপের বাড়িতেই রেখে গেছে। শ্যামল তার গায়ের রঙ; টানা টানা চোখ; মুখে চাঞ্চল্যের দীপ্তি ফুটে বের হচ্ছে। কিন্তু বড় ক্লান্তিতে যেন সে অবসন্ন।

একপাশে দাঁড়িয়ে বড়দির কার্যকলাপ দেখছিলাম ; সেখানে অপর কারো থাকার কথা নয়। এমন কি হাতিম মিয়াও বাইরে ছিলেন। সেলিমাকে টুলের উপর বসিয়ে বড়দি মন্ত্র পড়ে তার চোখে মুখে জলের ছিটে দিতে লাগলেন,—এক, দুই, তিনবার। তারপর চোখ বুজে বিড়বিড় ক'রে কি যে বলতে লাগলেন বুঝতেই পারি নে। বড় আস্তে আস্তে তিনি মন্ত্র পড়ছিলেন। মন্ত্রের মধ্যে তিনি দু'একবার কপালে হাত ঠেকিয়ে "দোয়া কর পাঁচ পীর" কথাটি বললেন। তাঁর চোখে ধারা নামল ; কিছুক্ষণ পর সেলিমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ ক'রে বললেন,—"ভাল হয়ে যাবি মা, পাঁচ পীরকে ভুলিস নি।"

সেদিন বড়দির এক অপরূপ মূর্তি দেখলাম। সেলিমার মাথায় যখন তিনি হাত রাখলেন, একটা জ্যোতি যেন ঝরে পড়ছিল তাঁর মুখ দিয়ে। তাঁর পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকালাম , বড়দি বললেন,—এ কি রে পাগলা ?

এদিকে আমার সেখানকার পাঠকালও শেষ হ'তে চলল। শেষের বছর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এমন সুন্দর লীলাভূমি আমাকে যেন আরো আকৃষ্ট করতে লাগল। উঁচু টিলার উপর দাঁড়িয়ে বসন্তের বিচিত্র রূপ দেখে মোহিত হই। মনে হয়, পার্বত্যভূমি—পার্বতী। নতুন পাতা আর নানারঙের ফুলে ভরা পার্বতীর আঁচল আমাকে বিমুগ্ধ করে। মাধবী, চাঁপা আর নাগকেশরের ফুলের বাহারে যেন পার্বতী সেজে রয়েছে। মেয়েরা সাজে ফুলে আর পাতায়। কুমারী মেয়েদের খোঁপায় শোভা পায় নাগকেশর। ছোট ছোট মেয়েরা খেলাঘরে ফুলের বাসর সাজায়।

পার্শ্ববর্তী জলঢুপ আর লাউতার দিকেও পার্বতী তার আঁচল বিছিয়েছে। থরে থরে ঢেউ খেলে চলেছে,—টিলার পর টিলা। বন্ধুদের নিয়ে অভিযান চলে চারদিকে,—সব দেখে নিতে হবে। জলঢুপের আনারস !—নামটা মনে পড়লেই তার সেই মন-মাতানো স্নিগ্ধ গন্ধ যেন এখনও নাকে ভেসে আসে। আনারসের বাগানে ঘুরে বেড়াবারও সঙ্গী জুটল। আনারসের যারা চাষ করে, তাদের দোর্দণ্ড প্রতাপ। হিন্দু-মুসলমান সকলেই তাদের

ভয় ক'রে চলে। অজস্র কমলা আর আনারস হয় সেই অঞ্চলে। বাগানের একটি ফলও কুড়োতে পারবে না; হাত দিলেই বিপদ! কিন্তু খেতে চাও, যত খুশী খেতে দেবে, নিজের হাতে তারা পেড়ে দেবে। এমনি তাদের অতিথি-সৎকার।

তারপর দুটি বড় মাঠ পেরিয়ে নদীর অপর পাড়ে ঢাকাদক্ষিণের জগন্নাথ মন্দির। প্রেমের ঠাকুর চৈতন্যদেবের পিতৃভবন। সে অঞ্চলও এমনি সুন্দর। পার্বত্য টিলার শোভা ও বাড়ি-ঘর মুগ্ধ করে। আমাদের অভিযান নিত্যই চলে। মনে পড়ে চৈতন্যদেবের পিতৃভবনে একদিন নিমাই-সন্ন্যাস যাত্রা দেখেছিলাম। নিমাইয়ের সন্ন্যাস-দৃশ্যে সমস্ত আসরের লোক 'নিমাই' 'নিমাই' রব তুলে আকুল হয়ে কেঁদে উঠেছিল। এমন কি পালার বাকী অংশ এই উচ্ছ্বাসে অভিনয় করাই অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। বাংলাদেশে ক্ষুদিরামের ফাঁসির গানটি যেমন প্রবাদ বাক্যের মত প্রচলিত, "বিদায় দাও মা ঘুরে আসি"—গানে বাঙ্গালীর প্রাণ যেমন সাড়া দিয়ে ওঠে, তেমনি নিমাই-সন্ন্যাসের একটি গান প্রবাদবাক্যেব মতই চলিত আছে। সে গানে নিমাইকে বারো তেরো বছরের কিশোর রূপে কল্পনা করা হয়েছে। "বাছা নিমাই রে যাইও না সন্ন্যাসে—"গানটি বাউলেরা যখন গায়, তখন চোখের জলে মেয়েরা ভাসে। তাতেই আছে "বারো না বচরের নিমাই তেরো না পুরিতে, কেশব ভারতী আসি মন্ত্র দিল কানে।" গানটা এখন পুবোপুরি আমাব মনে নেই। চৈতন্যের পিতৃভূমি হরিব নামে মাতোয়ারা হ'লেও তা শাক্তেরই দেশ; তান্ত্রিকের লীলাভূমি বলা চলে। তবুও প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় কোন না কোন বাড়িতে হরিনাম-গান মৃদঙ্গ-করতাল-যোগে হয়ে থাকে। হরির লুটের প্রচলন সে অঞ্চলে অত্যন্ত বেশী।

হরি-সংকীর্তনে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ নেই। কীর্তনে উন্মত্ত কারো কারো আবার ভাব-সমাধিও হয়ে থাকে। দীনুমুচি ভাল কীর্তন গাইতে পারত। একদিন কীর্তনের আসরে হঠাৎ সে অচেতনের মত পড়ে গেল। ন্যায়চঞ্চুর মত গোঁড়া ব্রাহ্মণও তার পায়ের ধুলো তুলে মাথায় নিলেন। সেই অবস্থায় সকলকেই তার পায়ের ধুলো নিতে দেখেছিলাম। ভাব-সমাধি জিনিসটা কি তখন বুঝতাম না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখতাম। দিদিকে জিজ্ঞেস করায় দিদি বললেন, "ঠাকুরের ভর হয় তাঁর উপর।" অবাক হয়ে থাকতাম তাঁব কথা শুনে।

আত্ম-সমাধির দিকেও আমার ঝোঁক এল। বুঝলাম, এতেও মহত্ত্ব বাড়ে। এদিকে অসুস্থতা দূর হওয়ার পরে ধীরে ধীরে আমার নিজের মধ্যে একটা পরিবর্তন আসছে ব'লে মনে হ'ল। তেমন ভূতের ভয় আমার আর ছিল না। একাকী থাকলে প্রায়ই আচ্ছন্ন বা অভিভূতের মত বসে থাকতাম। এমন কি ক্লাসেও কোন কোন দিন তন্ময় হয়ে থাকতাম। কি যে হ'ত কিছুই বুঝতে পারতাম না। কোন সময় বা পড়েও যেতাম। আমার শিক্ষকদের অনেকে তা লক্ষ্য ক'রে সতর্ক হয়েছিলেন। অন্য ছেলেদের আমার উপর নজর রাখতে বলে দিতেন। অথচ আমাকে পরে প্রশ্ন করলে এ সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারতাম না। তারা বলত, ঐরকম আচ্ছন্ন অবস্থায় আমি যা বলতাম, তা সব ঠিক ঠিক সত্য হ'ত।

একদিন সন্ধ্যার পর বসে আছি, সামনে বই খোলা। স্পষ্ট দেখলাম, ঘরে অনেক অপরিচিত লোক ঢুকেছে, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে অনেক। তারা অদৃশ্য হ'ল। পাহাড় জঙ্গল, গিরি-গুহা কত কি আমার সামনে ভেসে উঠল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পড়া কাপালিকের মত জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসীকেও দেখলাম। আরো দেখলাম, পাহাড়ী অঞ্চলে অর্ধ-উলঙ্গ নরনারীর দল হাঃ হাঃ ক'রে হাসছে। তারপর দেখি, রেলগাড়ীতে চেপে অনেক দূর চলেছি, বন্ধুরা দাঁ'ড়িয়ে দেখছে আর চোখের জল ফেলছে। তাদের চোখের জল দেখে বেশ কষ্ট হ'ল, রেলগাড়ী থেকে নামতে চাই, কিন্তু কে যেন আমায় চেপে ধরল। তারা সব অদৃশ্য হয়ে গেল। নদ-নদী, বন প্রান্তর, কত অজানা অচেনা গ্রাম ও শহরের মধ্য দিয়ে রেলগাড়ী চলেছে। বড় ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। তারপর খুব বড় এক শহরে পৌঁছালাম,—আলোয় আলো'ময় খুব বড় স্টেশন। বড় বড় ঘর রয়েছে, তার একটিতে এসে ট্রেন থামল। লোকে লোকারণ্য। ছেলেবেলায় বারুণীমেলা কিংবা রথের মেলাতেও এত লোক দেখিনি। এগিয়ে দেখি, বড় বড় পাকা বাড়ি। রাস্তাগুলিও পাকা; বিচিত্র বাড়ি-ঘর। কিন্তু মাটি কোথায়? কত আলো আর কত রকমের গাড়ী, বিচিত্র সব মানুষ, বিচিত্র তার কোলাহল। তারপরে দেখি, বহুদূরে এক

পাড়াগাঁয়ের ঘরে বসে আছি। আমার কোলে ফুলের মত সুন্দর একটি ছেলে।

বেশ দেখ্‌ছি, এমন সময় আমার মাথায় কার স্নেহস্পর্শ অনুভব করলাম। মাথা তুলে দেখি, আমার ক্ষেত্রদিদি, মুখে তাঁর প্রসন্ন হাসি।

ক্ষেত্রদিদি বললেন,—কি রে, কি ভাবছিলি? একা একা হাসছিলি কেন?

তাঁর কথার কোন উত্তর দিতে পারি নে। আমি তখনও অভিভূতের মত তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছি। একি! আমি কি স্বপ্ন দেখছিলাম?

ক্ষেত্রদিদি হেসে হেসে বললেন,—ভৃগু, বুঝেছিস তোকে সব শিখিয়ে দিয়ে'ছ, আর ভয় পাবি নে তো? নিশুতি রাতে পথ চললেও কেউ তোর অনিষ্ট করতে পারবে না। কিন্তু ভাই মনে রাখিস, যা করবি লোকের মঙ্গলের জন্য করবি।

স্বপ্নের ঘোর তখনও কাটে নি। মনে হ'ল স্বপ্ন-রাজ্যে রয়েছি, কোলে যেন সেই কচি শিশুটি এখনও রয়েছে। হকচকিতের মত বললাম, —দিদি! তুমি? আমি কোথায় রয়েছি?

দিদি বললে,—কেন রে? কি হয়েছে? স্বপ্ন দেখ্‌ছিস?

আমি বললাম,—হ্যাঁ দিদি। স্বপ্নে এসব কি দেখলাম? অমন হয় কেন? কত কি যে দেখেছি! কোথায় যেন চলে গে'ছি—রেল, স্টীমার, বড় স্টেশন, বড় বড় বাড়ি, শহর আর কত অট্টালিকা। শেষে দেখি এক পাড়াগাঁয়ে এক সুন্দর ছেলেকে কোলে নিয়ে বসে আছি। তখনই তুমি এসে সব ভেঙ্গে দিলে।

দিদি বললেন,—স্বপ্ন নয় রে, এটা ত্রিকাল-দৃষ্টি। আমি বলছি, তোর ভৃগুনাম সার্থক হবে। তুই আমাদের ছেড়ে বহুদূরে চলে যাবি। এই ছোট ছেলের মুখ মনে রাখিস, সে যেদিন তোর কোলে আসবে, তোর দিদির কথা মনে করিস।

দিদির চোখে জল এল। তিনি বললেন,—আমরা তখন থাকব না রে। তুই যে এখানকার মায়া কাটিয়ে চলে যাবি। তোকে ধরে রাখা যাবে না। বহুদূরে, অনেক দূরে তোর বিয়ে হবে, খুব বড় এক শহর ছাড়িয়ে পাড়াগাঁয়ে। ওই ছোট্ট শিশু তোর বড় ছেলে।

দিদির চোখে জল দেখে এবং তাঁর কথা শুনে ব্যথিত হলাম। দিদির

কথা তো মিথ্যা হ'তে পারে না। অবিশ্বাসের সুরে তাঁকে বললাম,—এ কি বলছ দিদি! তুমি আমায় ঠাট্টা করছ? এই ক'রে আমায় ফাঁকি দেবে। কিছুই শিখতে দেবে না।

দিদি হেসে উত্তর দিলেন,—সে আর শিখিয়ে দিতে হয় না রে। যাদের ভেতর শক্তি আছে, তারা আপনি পায়। ওই ভূত-প্রেতের মন্ত্র আর ঝাড় ফুঁক—ওগুলো সবই বাজে। ওসবে অনিষ্ট হয়।

দিদির কথা শুনে ভাবলাম, তিনি এই রকম ক'রে আমাকে ফাঁকি দিয়ে ভুলোচ্ছেন। অভিমান ক'রে বললাম,—আচ্ছা দিদি, আবার যদি আমায় ভূতে ধরে?

তিনি বললেন,—তোকে কোনদিন ভূতে ধরেনি তো। মনের ভয়ই ভূতের ভয়। ভূতটুত কোন কিছু নেই। থাকলেও তারা কারো অনিষ্ট করে না।

আমি ক্ষুব্ধ হলাম। তাঁকে বললাম,—বেশ, তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু আবার যদি মনের ভয়ে আমার অসুখ করে?

তিনি হেসে বললেন,—দেহ যখন আছে, তখন দেহের অসুখ-বিসুখও আছে। ডাক্তার বদ্যি রয়েছে, ভয় কি?

আমি বললাম,—তা হ'লে মনের জোরটা বাড়িয়ে দাও। আর এমন কিছু শিখিয়ে দাও, যাতে লোকের উপকার করতে পারি।

তিনি বললেন,—সে আর শেখাব কি রে? যখনি লোকের বিপদ-আপদ দেখবি, নিজের সব কিছু দিয়ে তার উপকার করতে এগিয়ে যাবি।

দিদির কথা শুনে চুপ ক'রে রইলাম। মনে মনে ভাবলাম, তা হ'লে এসব ভূতের মন্ত্র কি মিথ্যে?

দিদি হেসে হেসে বললেন,—কি ভাবছিস? মন্ত্র-তন্ত্রের কথা? ভয়ের সময় অভয়-বাণীই মন্ত্র। ঐ মা-কালীই তোকে সব শিখিয়ে দেবেন। কালীই ভূত-প্রেতের দেবতা,—মৃত্যুর দেবতা মা-কালী। তাঁকে ডাকিস, ভয় থাকবে না, লোকেরও উপকার করতে পারবি। স্বামীজির কথা শুনিস নি? তিনি তো কালীকে আরাধনা করতে বলেন নি। কালীর ছেলে মানুষের সেবা করতেই বলেছেন।

ক্ষেত্রদিদির মুখে আজ অদ্ভুত কথা শুনলাম। তা হ'লে পাগলা ঠাকুরের মত অমাবস্যার রাত্রে চাঁদ দেখানো হবে না তো? পড়াশোনায় আর মন

বলল না। হঠাৎ বন্ধু অবিনাশ এসে হাজির হল। অবিনাশ ভাল গান করে। সে হারমোনিয়ম নিয়ে গান ধরলে—

মাটি খাঁটি ভবে।
মাটির দেহের পরিপাটী মাটিতে লয় হবে॥

ক্ষেত্রদিদির বাড়ির সামনে ছিল একটা পুকুর। পুকুরের পাড়ে ছিল একটা কনকচাঁপা ফুলের গাছ। পরদিন সেই গাছের গোড়ায় ক্ষেত্রদিদি একটা বেদী তৈরী ক'রে দিলেন। লাল বেলে-মাটির বেদী। তার উপর পুঁতে দিলেন একটি বেলের চারা। সুন্দর একটি লম্বা পাথর বসিয়ে দিলেন সে গাছের গোড়ায়। সিঁদুর গুলে রাঙিয়ে দিলেন সেই পাথর।

দিদি আমাকে বললেন,—'চান ক'রে আয় ভৃগু, এই যে মা কালীর আসন ক'রে দিলাম; রোজ চান ক'রে উঠে জল দিবি। তা হ'লেই সব হবে।'

দিদির আদেশ পালন করতে লাগলাম! রোজ চান্ ক'রে উঠে কনক-চাঁপার বেদীতে জল দিতাম। আর সন্ধ্যায় দিদি সেখানে একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতেন।

বনমালী কবরেজ এসব দেখেশুনে রসিকতা করতেন। তিনি বলতেন,—কাল দেখলাম, এখানে মা-কালী দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তোমরা ভাইবোনে দেখতে পাওনি! লক্‌লক্ করছে তাঁর জিভ, আমি তো ভয়ে ছুটে পালিয়ে এলাম। কোনদিন বা বলতেন,—এবার মা-কালী পাঁঠা খেতে আরম্ভ করবেন, তা হলে বেশ মজা হবে!

আমাব কাজ আমি ক'রে যেতে লাগলাম; কিন্তু সেখানকার দিন যে ফুরিয়ে এল! চান ক'রে উঠে বেদীর দিকে চেয়ে থাকি—চোখ ছলছল করে!

বিদায়ের দিনে ঐ কনকচাঁপার তলায় প্রণাম করতে হয়েছিল। সেখানে ক্ষেত্রদি, আজিজের মা ও সাকিনা এসেও দাঁড়িয়েছিল। আজিজের মা বলেছিলেন,—"পাঁচপীর তোর মঙ্গল করবেন ভাই, পাঁচপীরের হাতে তোকে সঁপে দিচ্ছি।" সাকিনা বলেছিল,—"দাদা আবার এসো!" ক্ষেত্রদিদি কিছুই বলেন নি; তাঁর চোখে তখন জলধারা! বনমালী কবরেজ বলে-ছিলেন,—অন্ধ হ'য়ে যাব রে, তোকে বোধ হয় আর দেখতে পাব না।

তারপর জীবনের যাত্রাপথে পল্লীর সে স্বপ্ননীড় ছেড়ে এলাম। সে সুখস্মৃতি বারবার মনকে পীড়ন করছিল; কিন্তু চলার পথে এগিয়ে গেলে আর কি ফেরা চলে? তবু অনেক বছর পরে একবার ক্ষেত্রদিদিকে দেখতে গেলাম। শুনলাম, তাঁরা সেখানে নেই। কিন্তু কনকচাঁপা-বেদী-মূল সে অঞ্চলের তীর্থে পরিণত হয়েছে। বসন্তকাল,—কনকচাঁপাকে জড়িয়ে মাধবীলতা দুলছে; পাশেই উঠেছে বেল আর বটের গাছ। সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বলে। পল্লীবাসীরা ক্ষেত্রদিদির সে প্রদীপকে নিভতে দেয় নি। মাঝে মাঝে ধুমধাম ক'রে কালীপূজা হয়; কারো কোন শক্ত অসুখ-বিসুখ হ'লে এই কালীর কাছে মানত করলে নাকি তা ভাল হয়ে যায়!

আজ জীবন-সায়াহ্নে দেখতে পাচ্ছি, সেই প্রদীপ এতদিন আমারও সামনে জ্বলে রয়েছে; প্রদীপের স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়েছে। স্বপ্নের সে শিশুর মুখ সত্যই দেখেছি। ক্ষেত্রদিদি ও তাঁর স্বামী কোন্ অজানার কোলে চলে গেছেন—কিন্তু দিদির সে দীপ নিভে যায় নি।

সম্পূর্ণ নূতন জায়গা,—নূতন তার পরিবেশ! অচেনা অজানার মাঝে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারিনে। সামনেই বড় নদী,—সন্ধ্যার একটু আগে নদীর ধারে এসে বসেছি; সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়েছে—ঐ যে একটি মড়া ভেসে যাচ্ছে। ছোট্ট একটি মেয়ে, তার ছোট্ট ভাইটিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। শৈশবের স্মৃতি ভেসে উঠল; চোখের সামনে দাঁড়াল সুব্রতা,—আমার সেই ছোট্ট দিদি! অভিভূতের ন্যায় শৈশবে ফিরে গেলাম,—

"কুর্—কুর্-কুর—কু-কু"—মোরগ ডাকে। না, না, বেহুলা কাঁদে।

দুরন্ত মেয়ে সুব্রতা। ভয়-ডর তার একটুও নেই। সমবয়সী ছেলে কিংবা মেয়েদের সে গ্রাহ্যই করে না। চাঁপাফুলের মত তার গায়ের রঙ, চোখ দুটি টানা-টানা—বেশ বড় বড়! ছোট বেলায়ই সে শাড়ী পরে। শাড়ীর আঁচল কোমরে জড়িয়ে দৌড়-ঝাঁপ দেয়; হাডু-ডু-ডু কিংবা কপাটি খেলায়ও সে ওস্তাদ। সমবয়সী মেয়েদের সে একটু অবজ্ঞার চোখেই দেখে। সুব্রতা ক্ষেপে গেলে আর রক্ষা থাকে না। তার মুখ-চোখে তখন চাঁপার বদলে জবার আভাই ফুটে ওঠে; সাপের মত ফোঁস্ ফোঁস্ ক'রে ওঠে

সে। ঠাস্‌-ঠাস্‌, গুম্‌-গুম্‌ ক'রে চড়-চাপড়, কিল-ঘুষি বসিয়ে দেয় গালে। সবাই রীতিমত তাকে ভয় ক'রে চলে।

সুব্রতা হঠাৎ ছুটে এসে বলে,—চল ভূতু, গাঙের বাঁকে মড়া আটকেছে, দেখবি চল্‌।

আমি সভয়ে বললাম,—না ভাই, আমার ভয় করে, মা শুনলে বকবে।

সুব্রতা বললে,—বকবে কেন? এখন দুপুর বেলা। এত ভয় কিসের? যে-সে মড়া নয় রে,—সাপে-কাটা মড়া; ঐ শোন, মোরগ ডাকছে।

শুনেছি, সাপে-কাটা মড়াকে ভেলা ক'রে ভাসিয়ে দেয়, সঙ্গে থাকে একটা মোরগ। নদীর স্রোতে ভেসে চলে ভেলা। যে ঘাটে কোন গুণীন বা সাপের রোজা থাকে, সেখানেই ভেলা আটকে যায়, আর মোরগ গুণীনকে ডাকে; গুণীন ছুটে আসে মোরগের ডাক শুনে; মড়াকে বাঁচাবার চেষ্টা তাকে করতে হয়। অমনি ক'রেই কোন্‌ যুগে লখিন্দরকে নিয়ে বেহুলা ভেসে চলেছিল ভেলা নিয়ে। শেষ কালে লখিন্দরের হাড়গোড় থেকেই মন্ত্রের জোরে সাপের সবচেয়ে বড় গুণীন বিষহরি মনসা স্বয়ং লখিন্দরকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। সেদিন থেকেই এই রীতি চলে আসছে। মোরগের মধ্যে বেহুলার আত্মা নেমে আসে, তিনিই গুণীনের সন্ধান দেন।

মড়া দেখার মত সাহস কিংবা উৎসাহ আমার ছিল না, যদিও মড়া দেখার একটা অদম্য কৌতূহল আমার মনে তখন জেগে উঠেছিল। ছেলেবেলায় মড়া দেখার কোন সুযোগ হয় নি; অথবা তার সুযোগ আমাদের দেওয়া হয় নি। পাড়ায় কেউ কোন দিন মারা গেলে সমস্ত পাড়াটা যেন কি একটা কালো ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ত! কারো মুখে হাসি-খুশী ভাব দেখতাম না। কয়েক দিনের জন্য যেন পাড়া থেকে হাসি-খুশী অদৃশ্য হ'ত। এক অজানা আশঙ্কায় তখন সকলেরই মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সে সময় বাড়ির বাইরে যেতে দেওয়া হ'ত না। সন্ধ্যার অনেক আগেই তাদের ঘরে আটকে রাখা হ'ত। সে কি ভয়! দু'তিন দিন রাত্রে জোরে কেউ কথা পর্যন্ত বলত না। মা-কাকীমাদের আরো বেশী ভয় ছিল।

শুনতাম, মানুষ মরে গেলে সে অ-মানুষ প্রেত হয়ে ঘুরে বেড়ায়, বাতাসের সঙ্গে মিশে থাকে সে। কেউ তাকে দেখতে পায় না, অথচ সে সকলকে দেখতে পায়। মানুষের অনিষ্ট করাই তখন তার একমাত্র কাজ।

এমন কি নিজের ছেলের ঘাড় মট্‌কাতেও তার বাধে না। সন্ধ্যায় ঘরে সরষে ছড়িয়ে দেওয়া হ'ত আর বিছানার তলায় রাখা হ'ত লোহার কোন জিনিস। তাতে নাকি ভূতপ্রেত কিংবা মৃতের আত্মা কাছে ঘেঁষতে পারে না।

তারা দত্ত মশাইয়ের বাবা মারা গেলে এই রকম একটা কাণ্ড ঘটেছিল। দত্তমশাইয়ের বাবা নাকি নাতি শ্যামসুন্দরকে খুব ভালবাসতেন। বুড়ো দত্ত যেদিন মারা গেলেন, তার দিন-তিনেক পরে একদিন রাত্রে উঠোনে দাঁড়িয়ে যেন তিনি ডাকছেন,—"শ্যামু ভাই।"—ঠিক দত্তমশাইয়ের গলা। শ্যামু তখন ঘুমের ঘোরে অচেতন। দ্বিতীয়বারে শ্যামু সাড়া দিল,—'দাদু'। শ্যামুর পিসীরও ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি শ্যামুকে জড়িয়ে ধরলেন; কিন্তু শ্যামু বেরিয়ে যেতে চায়; সে পাগলের মত চীৎকার করতে লাগল,—"দাদু। দাদু।" দাদুর আর সাড়া নেই। শ্যামু অচৈতন্য হয়ে পড়ল। তার সে চেতনা আর ফিরে আসে নি। শ্যামুর পিসী ইনিয়ে-বিনিয়ে এখনও সে গল্প করেন।

সুব্রতার কথা আলাদা। মনে হয় মানুষ, জন্তু, জানোয়ার, ভূত-প্রেত কাউকে সে গ্রাহ্য করে না। কাকীমার নিষেধ থাকলেও সে অন্ধকারে উঠোনে বের হ'য়ে মৃতের আত্মা সত্যই ঘুরে বেড়ায় কি না পরীক্ষা করত। চুপি চুপি আমাকে বলত,—ভয় কিবে, আমার আঁচলে কালভৈরবের ফুল আছে।

গ্রামের প্রান্তে ভবতারণ আচার্যির বড় পুকুরটার এক কোণে প্রকাণ্ড এক বটগাছ; সেই বটগাছের তলায় কালভৈরবের এক বেদী। গভীর নিশীথে গাঁ পাহারা দিয়ে বেড়ান কালভৈরব। তাঁর খড়মের খটাখট আওয়াজ নাকি মাঝে মাঝে শোনা যায়। ওই মহাদেবের মত তাঁর মূর্তি, মাথায় বিরাট জটা; হাতে ত্রিশূল; গায়ের রঙ কিন্তু লাল। কপালে আগুনের অর্ধচন্দ্র তিলক ধ্বক্ ধ্বক্ ক'রে জ্বলে। আশে-পাশে ওলাউঠা কিংবা বসন্তের মড়ক লাগলে কালভৈরবের পূজা হয় ধুমধাম ক'রে। কত পাঁঠা, হাঁস আর কবুতর পড়ে তাঁর থানে। রক্তের স্রোতে তাঁর বেদী ভেসে যায়। মাঝে মাঝে তান্ত্রিক চন্দ্রনাথকে কালভৈরবের তলায় বসে বলি দেওয়া পাঁঠার তপ্ত রুধির পান করতে দেখেছি। ঘন জঙ্গলের মাঝে সে বেদী, কি ভয়াল আর কি ভয়ঙ্কর!

সুব্রতার মা তাকে রীতিমত ভয় ক'রে চলতেন। সে রেগে গেলে ভাতের হাঁড়িকুড়ি পর্যন্ত আঁস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিত। কোন শাসন,

মারধোর তার স্বভাব বদলাতে পারে নি। ছোট ছোট 'ভুনিয়া' সাপ ঘাসের উপর ঘুরে বেড়ায়; সুব্রতা আচমকা সেই সাপের লেজ ধরে ঘোরায়; তারপর দূরে ছুঁড়ে ফেলে। পাড়ার মুক্তোপিসী তাকে ডাকতেন,—'বেদেনী' বলে।

আমার প্রতি সুব্রতার কি যেন একটা দরদ ছিল; তা ভালবাসা কিংবা অনুগ্রহ আজও বুঝে উঠতে পারিনি। ভয়-ডরের কোন কিছু ঘটলেই সে সন্ধ্যে থেকেই আমাদের ঘরে এসে আসন পাড়ত। আমাকে বলত,—"ভয় কিরে, ভূত-পেরেত ও সব বাজে কথা।" নানা গল্প কেঁদে সে আমাদের ভুলিয়ে রাখত। তাকে পেলে মায়েরও সাহস বাড়ত; সুতরাং সেদিন আর নিজেদের ঘরে ফিরে যেত না। গল্প শুনতে শুনতে তারই পাশে ঘুমিয়ে পড়তাম। সুব্রতাও আমাকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ত।

বাড়ির ধারেই নদী। আমরা বলি 'কাঁকড়াগাঙ।' ছোট হ'লে কি হয়, বর্ষায় তার দারুণ প্রতাপ। অজগর সাপ যেন সোঁ সোঁ শব্দ ক'রে নেমে আসছে, তারপর দুধারে উপছিয়ে পড়ে তার জলস্রোত। মাঠ-ঘাট সমস্ত ভেসে যায় সে নদীর দাপটে। অবাক হয়ে ভাবি, এত জল কোথা থেকে আসে? টিলায় টিলায় বাড়ি; বর্ষাকালে যেন অসংখ্য দ্বীপ। এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যেতে নৌকোর প্রয়োজন। বর্ষার কয়েকমাস বিচিত্র শোভায় সে অঞ্চল ভরে ওঠে। সেখানকার মেয়েরাও সাঁতার জানে, নৌকো চালাতে জানে। মাঠ হয়ে যায় সায়র,—সাগর। কত নৌকো চলে সেই সায়রের উপর দিয়ে। এক, দুই, তিন—অনেক, অনেক অজস্র ছোট-বড় কত নৌকো।

মাঝে মাঝে বাইচ খেলার নৌকো ছুটে যায়! বাইচের বিচিত্র নৌকো—"খেন্না"। খেন্না এক রকম লম্বা ডিঙ্গি; খুব উঁচু, প্রায় খাড়া তার গলুই, নানা কারুকার্যে বিচিত্র তার শোভা! রৌদ্রে তা চিক্‌মিক্ ক'রে উঠে। সারি সারি দাঁড়ি দাঁড় টানে। গলুইয়ের উপরে তালে তালে ওঠানামা করে প্রধান গায়ক। দাঁড়িরা তার দোয়ার ধরে। জানিনে, "শৈলজা বাদশা" না "শাহজা বাদশা"—তিনি কে? তাঁরই দোহাই বা মহিমা কীর্তন থাকে গানের ধুয়ায়।

"ওই শোন্, কুর্-কুর্-কুর্ কু'; শীগগির চল্।"—সুব্রতা আমাকে টেনে নিয়ে নদীর দিকে ছোটে।

ভেলার উপরে ছইয়ের তলায় মড়া রয়েছে। নদীর মাঝে ভেলাখানি আটকে গেছে। কলাগাছের তৈরী ভেলাখানি। ভেলার উপর খড়ের ছই। ভেতরে একটি সুন্দর ছেলে ঘুমিয়ে রয়েছে। সাদা চাদরে তার সর্বাঙ্গ ঢাকা, শুধু মুখখানি দেখা যাচ্ছে! ছইয়ের সঙ্গে একটি মোরগ বাঁধা। বড় বড় চুপড়িতে রয়েছে ধান আর চাল,—মোরগের খাবার। মোরগটা একবার ভেতরে আর একবার বাইরে আসে। শুধু ডাকে,—"কুর্, কুর্-কুর্-কু"। ছট্-ফট্ করে মোরগটা, মাঝে মাঝে আবার পাখার ঝাপটাও মারে। হয়ত পালাতে চায়।

সাপের কামড়ে কারো মৃত্যু হ'লে এই রকমই ভাসিয়ে দেয়। কখনও এ দৃশ্য চাক্ষুষ দেখিনি। মৃত ছেলেটিকে দেখে বড় কষ্ট হয়! মন্ত্রবলে কে এর ঘুম ভাঙ্গাবে? সতী বেহুলা স্বামী ও শ্বশুরের অপর ছয় ছেলের জীবন ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁরই উদ্দেশে মনের আকুতি জানালাম। কানে ভেসে এল চুড়াই ওঝার কণ্ঠে শোনা লখিন্দরজননী সনকার সেই করুণ বিলাপ,—

কান্দে কান্দে সনকায়ে রে।
কান্দে লখাই কোলে লইয়া॥
অভাগী মায়েরে যাও
কি দুঃখে ছাড়িয়া!
ছয়পুত্র নাগে খাইল
সবে ছয় রাঁড়ি।
তুমি যদি যাও বাছা
না চড়াব হাঁড়ি।
কান্দে কান্দে সনকায়ে রে॥

অতি ছেলেবেলা থেকেই বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী শুনে আসছি। শ্রাবণের সংক্রান্তি দিনে ঘরে ঘরে মনসাপূজার ধুম লেগে যায়; গোলক আচার্যির বিধবা বুড়ী তো মনসার ঘট আর সাপের ফণা বেচে সম্বৎসরের ভাত-কাপড়ের খরচা তুলে নেয়। সর্পরথে মা মনসা,—দেবী বিষহরি! জরৎকারুপত্নী মনসা আর চাঁদসদাগরের সেই নিদারুণ বিবাদ-কাহিনী মনে পড়ে। শ্রাবণ আর ভাদ্র মাসে পাড়ায় কারো না কারো বাড়িতে মনসার ভাসান গান হয়; কত দেশের কত ওঝা আসে গান করতে। সাদা ধব্ধবে

ঘাগ্‌রা তাদের পরনে ; গায়ে থাকে চুড়ি-হাতা জামা ; মাথায় সাদা পাগড়ি : আর দুই হাতে থাকে চামর ; পায়ে তারা পরে ঘুঙুর। স্বয়ং মনসা রোজা হয়েছেন। চুড়াই ওঝা মন্ত্র পড়ে, সাদা চামরে জল ছড়ায়—

আরবার মনসা আনন্দমন করি।
বিষঝাড়া ঝাড়ে দেবী অভয়া কুমারী।
কালা, কালা, আরে বিষ কালা তোর জাতি।
অনাদি গরলে বিষ, তোর উৎপত্তি॥
ডাকিতে না শুন বিষ, হইলে না কি কাল।
নামো, নামো, ওরে বিষ, সপ্ত পাতাল॥

শ্বেত চামরের জল বিরাট আসরে ঘুরে ঘুরে চারিদিকে ছড়িয়ে দেয় ওঝা ; বিষহরি মনসার জয়ধ্বনি ওঠে। শত শত লোক মাথা নোয়ায়। এই জলের মধ্যে আছে মৃতসঞ্জীবনী শক্তি। তিন বৎসর এই জল তিনবার মাথায় পড়লে নাকি সাপের বিষে মৃত্যু হয় না! সর্প-সঙ্কুল দেশে এর মত অভয় মন্ত্র আর কি থাকতে পারে? বহু দূর-দূরান্ত থেকে কত লোক আসত—হিন্দু-মুসলমান। অপরূপ সে দৃশ্য!

মনসার ভাসান গায় ওঝারা। চুড়াই ওঝা নাম-করা গায়ক; তার জুড়িদার সে অঞ্চলে আর কেউ ছিল না। তার গলা ও নাচনভঙ্গী সকলকে মোহিত করত। রোগা, শ্যামবর্ণ, পাত্‌লা চেহারার লোকটি। তার কথাও ছিল খুব মিষ্টি। তারপর লালওঝা, চৈতন ওঝা, রসিক ওঝা—আরো কতজন ; তাদের নাম মনে নেই। স্মৃতির পর্দায় তাদের মূর্তি নেচে ওঠে!

লখিন্দরের জীবনদানের করুণ নাচাড়ির আবেদন শুনে কতদিন যে আকাশের ঐ কোণের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতাম, তার হিসেব নেই। ঐ পুব দিক থেকেই তো নদী নেমে এসেছে,—উত্তরের পাহাড়ের গা বেয়ে বেহুলা স্বর্গে গিয়েছিল। নদী কি তা হলে আকাশ থেকে নেমে এসেছে? আকাশই তো স্বর্গ। বেহুলার ভেলা তাঁর সতীত্বের জোরে উজান বয়ে চলেছিল। আশ্চর্য কাহিনী—নদী নিশ্চয়ই তা হ'লে আকাশে গেছে! আকাশ থেকেই জল আসে ; আকাশভরা সব দেবতা! দেখতে পাইনে কেন? মানুষ মরে গেলে ঐ আকাশেই তো যায়? আমার কচি ভাইটিকে যখন খুঁজেছিলাম, তখন আমার মা আকাশের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়েছিলেন,—ঐ,—ঐ—স্বর্গে গেছে সে।

চিন্তাধারার সূত্র ছিন্ন হয়; শুধু কোলাহল শুনি। লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠেছে নদীর ঘাট। আর কিছুই দেখা যায় না। আমরা দূরে সরে গেলাম। শুনলাম বেহুলার ডাকে গুণীন্ এসেছে। মন্ত্রবলে ছেলেটিকে বাঁচাবে সে। বারবার ছেলেটির মুখখানি মনে ভাসতে লাগল। আহা, বেচারীর মা এখন কি করছে? তার কি আর ভাইবোন নেই? বেঁচে উঠে সে কি ক'রে বাড়ি ফিরবে?—না, না, তাকে আমাদের বাড়িই নিয়ে যাব। রোজা কি মন্ত্রবলে ছেলেটির মা-বাবাকে খবর দিতে পারে না?

রোজা জাতিতে মুসলমান। মোরগের ডাক শুনলে নাকি পাতের ভাত ফেলে ছুটে আসতে হয়; মা-মনসার দিব্যি আছে। কয়েকজন মড়াটিকে ডাঙায় তুলে আনলে; রোজা চীৎকার করে ঝাড়তে লাগল। দুটি মাটির সরায় একটিতে জল আর একটিতে কাঁচা দুধ রাখা হয়েছে। হাতে কয়েকটি কড়ি নিয়ে রোজা চার দিকে ছুঁড়ে মারে। হিজিবিজি অবোধ্য কি মন্ত্র সে পড়ে, বুঝতে পারি নে; শুধু মনে পড়ে,

মনসার আজ্ঞে কড়ি দশ দিকে যাও!
কালিয়ার বেটারে বাইন্ধা নাও॥
কেলে সাপ হেলে সাপ কেউটের বাচ্চা!
কোথায় লুকাইল, আন সতী বেহুলার আজ্ঞা॥

রোজা বিচিত্র সুরে মাঠ-ঘাট কাঁপিয়ে চীৎকার করে। তার হাবভাব ও চীৎকার আমাকে ভয় ধরিয়ে দিল। তারপর দেখি, একখানা চেয়ারের উপর ছেলেটিকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার দেহে সাড়া নেই; হাত-পা বিবর্ণ ও কাঠের মত অসাড়। এত লোক জড় হয়েছে যে আর কিছুই বড় দেখা যায় না। একখানি নতুন কাপড় হাতে নিয়ে রোজা মন্ত্র পড়ে আর ছেলেটির মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঝাড়তে থাকে। ছেলেটির সুন্দর মুখখানিতে কে যেন কালি মেখে দিয়েছে। চোখ দুটি তার বুজে আছে। একজন চেয়ারের পেছন দিক থেকে তার মাথাটা ধরে রয়েছে। আর বুকের দিকটা চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছে। রোজা নেচে নেচে গান গায়, আর তার গায়ে মারে কাপড়ের ঝাপটা,—

নামো নামো কাল বিষ, নামো ভাটিয়ালে।
কাল ঘুমে জড়াইলে মনসার ছাওয়ালে,
বিষ নামো রে,—জয় বিষহরি॥

সঙ্গে সঙ্গে জনতা "জয় বিষহরি" বলে চীৎকার ক'রে ওঠে। এদিকে বেলা প্রায় পড়ে আসছে। এখানকার এই রহস্যময় ব্যাপারের দিকে অবশ্য প্রবল আগ্রহ বাড়ছে; কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই বাড়িতে নিগ্রহের ভয় মনে পড়ে গেল। সন্ধ্যার অন্ধকারে মালাকরদের তেঁতুলতলা দিয়ে যেতে হবে। তেঁতুলগাছে নাকি ব্রহ্মদৈত্য বাবাজি বসে থাকেন; ফোঁটা-কাটা পৈতাধারী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ তিনি। দৈত্যরূপে লোকের সর্বনাশ করতে তিনি ওস্তাদ। সুব্রতাকে বললাম,—বেলা পড়ে এল; চল এবার বাড়ি যাই।

সুব্রতা বলে,—সে কি রে? কড়ি চলে গেল। এবার সাপটাকে ধরে নিয়ে আসবে!

আমি বললাম,—দূর! কড়ি আবার কখনও সাপ ধরে নিয়ে আসতে পারে?

সুব্রতা উত্তর দেয়,—নিশ্চয়ই! তুই কিছুই জানিস নে। দাঁড়া না, দেখে যাবি।

আমি বললাম,—কি ক'রে কড়ি সাপ ধরে নিয়ে আসবে। কড়ির তো হাত-পা নেই!

সুব্রতা বললে,—জানিস নে, সাপের খোঁজে কড়ি ছুটেছে দশদিকে। যে সাপটা ছেলেটাকে কামড়েছে, তাকে যেখানে পাবে ধরে নিয়ে আসবে। তার ঘাড়ের দু'পাশে দু'টি কড়ি ধরবে; বাতাসের সঙ্গে হাওয়ায় উড়ে আসবে তারা।

আমি বলি,—তাই নাকি? কত দূরে আছে, কে জানে? কখনই বা আসবে?

সুব্রতা হেসে বলে,—দেরী হবে না; বললাম না হওয়ায় উড়ে আসবে। তুই একটু দাঁড়া। আমি দেখে আসি; লক্ষ্মী ভাইটি আমার!

আমার চিবুক ধরে আদর ক'রে সুব্রতা ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশ-পাতাল কত কি ভাবতে লাগলাম। দূরে ওই পাহাড়ের কালো রেখা দেখা যাচ্ছে; এখানেই কি পৃথিবী শেষ হয়েছে? না, এরপর আর কিছু আছে? ভূগোলে লিখেছে পৃথিবী গোল,—ঠিক কমলালেবুর মত! যত সব মিছে কথা! আমি দেখছি বেশ চ্যাপ্টা। তবে বৃত্তের মত গোল একটা চাকা বটে! আকাশটা তার ওপর চেপে রয়েছে;—একটা উল্টানো বড় সরা! সূর্য ওই কালো রেখার কাছে নেমে যাচ্ছে;

আকাশের কোলটা লাল হয়ে উঠেছে। আমার গায়ে বিচিত্র রঙের মিঠেমিঠে রোদের রেখা এসে পড়েছে। সাদা, কালো, হলুদে নানা রঙ ফুটেছে মেঘের গায়ে। সূর্য এত রঙ কোথায় পায়? সমস্ত দিনের পর সে বিশ্রাম করবে। আহা, বেচারীর একদিনও বিরাম নেই! তাকে একা একা সমস্ত দিন এত বড় আকাশে পূর্ব থেকে পশ্চিমে যেতে হয়। রাত্রি হ'লে তবু অনেকগুলি সঙ্গী সাথী মিলত; অগণিত তারকা ঝক্‌মক্‌ করে আকাশে।—কই, সূর্যের ঘোড়াগুলি তো দেখা যায় না! কোথায় তার সাতটি ঘোড়া? সাতরঙের সাতটি ঘোড়া রোদের মধ্যে মিশে থাকে; তাদেরই গায়ের রঙ ছিটকে পড়ছে মেঘের ওপর।

তন্ময় হয়ে ভাবছি তো ভাবছি, ওদিকের সোরগোল কানে যাচ্ছে না; মনে হচ্ছে সূর্যের ঘোড়ার গলায় ঘুঙুর বাজছে। ভাবলাম,—পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছুতে পারলে নিশ্চয়ই সূর্যকে ধরা যাবে। হয়ত ঘোড়াগুলিকেও দেখতে পাব। দূর, দূর,—ওটা তো লাল একটা চাকা,—ঠিক থালার মত। ওই তো স্পষ্ট দেখছি, ওর আবার হাত পা কোথায়? তবু এই থালার মত চাকাটা আকাশের এদিক থেকে ওদিকে এমন ক'রে রোজ যায় কেন? কে এই চাকাটা চালায়? হ্যাঁ, ওখান দিয়েই স্বর্গে যাওয়া যায়; স্বর্গের দেবতাদের কথা মনে পড়ে গেল, কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী আরো কত। আহা, বেচারী গণেশ হাতীর মত শুঁড় দিয়ে কি করে খায়? ব্রহ্মার আবার চারটে মাথা; গণেশের বাবা শিবের আবার পাঁচটি। এঁরা কি ক'রে ঘুমোয়? পেছনের দিকে মাথা থাকলে তো নাকেমুখে চাপ পড়বে। মা দুর্গার দশ হাত দেখতে মন্দ নয়, কিন্তু তিনি কি করে জামা পরেন? আর ইন্দ্র—দেবতাদের রাজা। তাঁর আবার হাজারটা চোখ; সমস্ত মুখ জুড়ে কি চোখ? কি বিশ্রী লাগবে দেখতে! আর তাঁর সর্বাঙ্গে যদি চোখ হয় তাহ'লে জামাকাপড় পরেন কি করে? তাঁর গায়ে কি ধুলোবালি পড়ে না? দুটো চোখ নিয়েই আমরা অস্থির; এক কণা ধুলো পড়লে কেমন কন্‌ কন্‌ করে; জ্বালায় অস্থির ক'রে তোলে। দেবরাজ ইন্দ্র এতগুলো চোখ কি ক'রে সামলান?—আপন মনে হেসে উঠি। নদীর ঘাটে, সাপেকাটা মড়া আর রোজার চীৎকার কিছুই তখন আমার মনে নেই।

হঠাৎ সুব্রতা এসে পিছন থেকে ধাক্কা মারল,—কি রে, পাগলের মত হাসছিস যে? চল্‌, বাড়ি চল।

আমার হাসি আর থামে না। গণেশের শুঁড় আর ইন্দ্রের চোখ তখন আমার মনে তোলপাড় তুলছে। গণেশ নিশ্চয়ই মাংসের হাড় চিবুতে পারে না। সুব্রতাকে দেখে মনে হ'ল গণেশের বোন লক্ষ্মী আকাশ থেকে নেমে এসেছে, তার চোখে মুখে স্বর্গের সেই রঙ-বেরঙের আলোর ছটা তুলি বুলিয়ে দিয়েছে। তাহ'লে কি আমি স্বর্গে পৌঁছে গেছি?—চমকে উঠলাম। সুব্রতা আবার ধাক্কা মারলে,—তুই কি পাগল হয়ে গেলি, হাসছিস কেন? চল বাড়ি চল। বাড়ি পৌঁছুতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

সন্ধ্যার কথা শুনে ঘাবড়ে গেলাম। সত্যিই তো সূর্য ডুবে গেল। তাকে বললাম;—তাহ'লে চল। আচ্ছা, ছেলেটার কি হ'ল?

সুব্রতা বললে,—হবে আর কি! ক'দিন লাগে তাই দেখ্। তাকে মশারির ভেতর পুরে দিয়েছে, কিছুই দেখা গেল না। আচ্ছা তুই কি ভাবছিলি বলতো?

আমি বললাম,—কিছুই না, ঐ আকাশের কথা। হাতীর শুঁড় আর গণেশের মাথা; ইন্দ্রের চোখ আর ব্রহ্মার মুখ,—বড় হাসি পায়।

সুব্রতা বললে,—ওঁরা দেবতা, ওঁদের নিয়ে হাসাহাসি করতে নেই। খবরদার, মনে রাখিস ওঁরা সবই দেখতে শুনতে পান!

তার কথায় শিউরে উঠলাম। বাব্বা! দেবতাদের কি ভয়ানক রাগ। তারা লোকের উপকার করতে যেমন, অনিষ্ট করতেও তেমনি ওস্তাদ। মনসা তো চাঁদ সদাগরকে সাতঘাটের জল খাওয়ালেন; আর ইন্দ্র—নিজের ইন্দ্রত্ব বজায় রাখবার জন্য চুরি জোচ্চুরি কিছুই বাকী রাখেননি।

সুব্রতা বললে—অত ভাবিস কেন? সব সময় কেমন আনমনা হয়ে থাকিস। রাত্রেও ঘুমের ঘোরে যা তা বকিস। চল এবার।

দুজনে বাড়ির দিকে এগিয়ে চললাম। সন্ধ্যা নেমে আসছে; দূরে নদীর বুকে নৌকোয় আলো দেখা যাচ্ছে; গ্রাম থেকে আসছে শাঁখ আর উলুর শব্দ। সুব্রতাকে জিজ্ঞেস করলাম—কই কড়ি তো সাপ নিয়ে এল না?

সুব্রতা বললে—ভিড়ের মাঝে কিছুই দেখতে পেলাম না। লোচন কাকা বললে কড়ি সাপ নিয়ে এসেছে; কিন্তু সাপটা বারবার ফিরে যাচ্ছে। কড়ি তাকে ছাড়েনি, আবার টেনে নিয়ে আসছে বাছাধনকে।

আমি বললাম—কোনখানটায় ছোবল মেরেছে দেখেছিস?

সে বলল—গোড়ালীর ঠিক ওপরে। সাপ আসবে, কাটা জায়গায় মুখ

দিয়ে বিষ তুলে নিয়ে দুধে ছেড়ে দেবে, জলের সরায় মুখ দিয়ে আবার ছোবল দিয়ে বিষ তুলবে, এমনি ভাবে ছেলেটাকে নির্বিষ করে তুলবে।

বিস্মিত হয়ে বললাম—তারপর কি হবে ?

সুব্রতা বললে—যতই বিষ নাবাবে ততই মুখখানি পরিষ্কার হয়ে উঠবে ; জল খেতে চাইবে, তারপর ছেলেটা উঠে বসবে।

আমি বললাম—ছেলেটা নিশ্চয়ই কেঁদে ফেলবে এত সব কাণ্ডকারখানা দেখে। তার মা-বাবাকেও দেখতে পাবে না।

সুব্রতা উত্তর দেয়—তা অবশ্যই করবে, তবু তার অযত্ন হবে না। হাটে বাজারে ঢাক পিটিয়ে তার মা-বাবাকে খবর দেওয়া হবে।

সুব্রতার কথা শুনেও ছেলেটির জন্য মন কেমন করতে লাগল। আঁধারের কালো ছায়া গাঢ় হ'তে লাগল। মনেও পড়েছে তার ছাপ। বাড়ি থেকে দুপুরে বেরিয়েছি, নিশ্চয়ই আজ আর রক্ষা থাকবে না। সুব্রতা সঙ্গে আছে এই শুধু ভরসা।

পিতৃব্য-কন্যা সুব্রতা—দুর্দান্ত তার সাহস। আমার বাবা নাকি তার বাবার ছোট বেলার বন্ধু, দুজনে তাঁরা মায়ের পেটের ভাইয়ের মত। দু'জনে একই জায়গায় পাশাপাশি বাড়ি করেছেন, সুতরাং আমাদের যোগসূত্র নাড়ীর টানেরই মত। বাপ-মায়ের আদুরে মেয়ে সুব্রতা ; ভয়ডর তার কিছুই নেই বরং বুড়োদেরও ভয় সে ভাঙ্গাতে পারতো। তবুও তেঁতুলতলায় পৌঁছলে আমার গা যেন ছম্‌ছম্ ক'রে উঠল, তাকে জড়িয়ে ধরলাম। সেও ডান হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে এগিয়ে চলল। তারপর বলল—ভয় নেই, ও সব ব্রহ্মদত্যি-টত্যি সব মিছে।

আমার মুখে কোন কথা সরে না ; সুব্রতাও চুপচাপ। আমাকে প্রায় টেনে নিয়ে চলল। সাপে-কাটা ছেলেটির মুখখানি তখনও আমার মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারছে। আবার মায়ের ক্রুদ্ধ মূর্তিও চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, তবু জানি সুব্রতাকে সঙ্গে দেখলে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

সুব্রতা নিজে ভয় পেয়েছিল কিনা জানি না ; কিন্তু তেঁতুলতলা পার না হওয়া পর্যন্ত সে কোন কথা বলেনি। তারপর সে হঠাৎ বলে উঠল—বলতে পারিস ভৃগু, আমরা পূর্ব জন্মে কি ছিলাম ?

অদ্ভুত তার প্রশ্ন ! তার কথা ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। তাকে বললাম—সে আবার কি ক'রে জানব ?

সুব্রতা বললে—জানিস তো বেহুলা আর লখিন্দর স্বর্গ থেকে এসেছে। তারা দেবতার শাপে মানুষ হয়ে জন্মেছিল। আমার মনে হয় আমরাও ওই রকম একটা কিছু ছিলাম।

সুব্রতার কথা আজ নতুন ঠেকল। এরকম চিন্তা আমি কখনো করিনি। যাত্রাগানে আর পালাগানে এরকম শাপভ্রষ্টদের কথা অনেক শুনেছি। শাপভ্রষ্ট দেবতা হবার লোভ অবশ্য আছে, কিন্তু মর্ত্যলোকে তাদের দুর্গতি দেখে কষ্টই হয়। আহা! অভিমন্যু বেচারী! বড় অল্প বয়সে সপ্তরথীর হাতে মারা গেল। তবুও পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছিল ব'লেই তো তারা অমর হয়ে গেছে। তা না হ'লে ঐ দেবতাগুলোর কথা কে অত ভাবতো? রাম আর সীতা না জন্মালে তো রামায়ণ রচনা হ'ত না।

সুব্রতা বললে—তুই বড় ভাবিস ভৃগু! এত উন্মনা হওয়া ভাল নয়। নিশ্চয়ই আমরা শাপভ্রষ্ট হয়ে এসেছি।

সুব্রতাকে বললাম—দূর, তা কি ক'রে হয়, আমরা তো দেবতা নই!

সুব্রতা আবেগ-মাখা সুরে বললে—দেবতা না হ'তে পারি, এজন্মে এক-সঙ্গে আমরা যখন রয়েছি, তখন নিশ্চয়ই পূর্বজন্মে আমাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক ছিল।

সারদা পণ্ডিতের ভৃগু-সংহিতার কথা মনে পড়ে গেল। ভৃগুতে যে পূর্ব জন্মের ও পরজন্মের কথা লেখা রয়েছে। তাঁর নকল ক'রেই তো আমার এই ভৃগু-খেলা। সুব্রতার কথায় সায় দিয়ে বললাম—আমারও মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় রে। সে বললে—অনেকদিন থেকে তাই ভাবি তোকে আমার এত ভাল লাগে কেন?

সুব্রতার কথা মনে পুলক জাগায়। আমার বাবা-মা-ভাই-বোন পূর্বজন্মে আমার কেউ ছিলেন না কিংবা পরজন্মে তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকবে না, তা ভাবতে কষ্ট হয়। এমন কি আমাদের ওই মেনী বেড়ালটা আর ভুলু কুকুরটাও হয়ত পূর্বজন্মে আমাদের বাড়িতেই ছিল। তা না হ'লে ভুলুটাকে লাথি মারলেও আমাকে কামড়ায় না কেন? আর মেনীটা চুপ-চাপ ক'রে খোকার কোলে বসে থাকে কেন? তবু সুব্রতার কথা শুনে অভিমানের সুরে বললাম—হ্যাঁ,আমাকেতোরভাল লাগে বৈকি। সেদিন আমায় তুই মারলি না!

সুব্রতাই আপসোস ক'রে বললে—বড্ড রাগ ধরে গেল তোর কথা শুনে। অমন ক'রে কি অভিশাপ দিতে হয় রে?

আমি বললাম—কিসের অভিশাপ। আমি তো তোকে ক্ষেপাতে চেয়েছিলাম।

সুব্রতা বললে—ওই তোর ক্ষেপানো? ভৃগুর কথা শুনলে আমার মাথায় খুন চেপে যায়, কি জানি যদি সত্যি হয়?

আমি হেসে বললাম—আমি কি দুর্বাসা মুনি?

সুব্রতা বললে—না রে না, আমার বড্ড ভয় করে। সারদা মামা তো সেদিন বলছিল, তোর কথা নাকি সত্যি হ'তে পারে।

আমি বললাম—দূর, তোকে সারদা মামা ক্ষেপাতে চেয়েছে, ওসব মিছে কথা।

সুব্রতা বললে—তাই হোক। কিন্তু জানিস, আমি কখ্খনো বিয়ে করব না।

বিস্মিত হয়ে বললাম—সে কি রে? সবারই তো বিয়ে হয়, তোরও হবে।

সুব্রতা অধীর হয়ে বললে—না, না, না। জানিস ভৃগু, ওসব কথা ভাবলে আমার গা কেমন শিউরে ওঠে; ভয়াল একটা ছায়া মূর্তি এসে আমার সামনে দাঁড়ায়। তাই তো বলেছিলাম, পূর্বজন্মের কোন ছায়া আমার পিছু পিছু ছুটে আসছে।

সুব্রতার কথায় বিস্মিত হই। এই অন্ধকার পথে এসব কথা শুনে আরো মুষড়ে পড়ি।

তাকে বললাম—থাক্ ভাই, এসব কথা বলে এখন লাভ কি। না হয় বিয়ে করবি না। আর আমি তো শুনেছি এবার তোর বর আসবে।

সুব্রতা উত্তেজিত হয়ে বললে—না, আমি মাকে স্পষ্টই বলে দিয়েছি। অজানা অচেনা কে একজন কোথা থেকে এসে আমায় কোথায় নিয়ে যাবে, ওসব হবে না। কথাগুলি বলতে বলতে সুব্রতা কেঁপে উঠল।

আমি তো ভয়ে মরি। সে আমার গলা আরো আঁকড়ে ধরলে। আমাব কাঁধে মাথা বেখে বলে উঠল,—জানি রে আমার কি হবে, সব আমি জানি।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম—কি জানিস বল্ না?

সুব্রতা উত্তর দেয়,—না, সে আর একদিন বলব।

সুব্রতার কথায় একটু চিন্তিত হয়ে পড়লাম। সেও গম্ভীর হয়ে উঠল। মনে মনে ভাবলাম,—সুব্রতার এমন মতি হ'ল কেন? ওই তো সেদিন সুরবালার বিয়ে হয়ে গেল। খেলাধুলা ছেড়ে হঠাৎ রাঙা শাড়ী পরে কনে-

বউ সাজল সুরবালা। ঢাক-ঢোল বাদ্যি বাজনার মধ্যে কোথাকার কোন দেশ থেকে পাল্কী চেপে এল টেকোমাথা এক বর। টোপর মাথায় অবশ্য তাকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল, কিন্তু তার নাকী-সুরের কথা শুনে হাসি পাচ্ছিল। পরের দিন ওই টেকোমাথা বরকে মারতে ইচ্ছে হয়েছিল আমার। শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় সুরবালার কি বুক-ফাটা চীৎকার। সে তো লাফ দিয়ে পাল্কী থেকে মাটিতে নেমে পড়েছিল। তা দেখে বরের পাল্কীতে আমি একটা কাঠ ছুড়ে মেরেছিলাম, তারপর ছুটে পালিয়েছিলাম ; বেশ লুকিয়ে ছিলাম সুব্রতার কোশলে। এখনও বুঝি সুরবালার করুণ আর্তনাদ আকাশে বাতাসে ভাসছে। কত ছোট্ট সে। কোন অজানা গাঁয়ে সে চলে গেল। বড় কষ্ট হয় আমার। মেয়েদের অদৃষ্টে এ কি কষ্ট। পাড়ায় কি তাদের বিয়ে দিলে হয় না? এ-বাড়িতে ও-বাড়িতে বিয়ে দিলেই হয়। মনে হচ্ছিল এইজন্যই বোধ হয় সুব্রতার অনিচ্ছা।

অন্ধকার নেমেছে। সুব্রতার মুখখানি বড বিমর্ষ। তার সেই দুরন্ত মনোভাব কোথা যেন অদৃশ্য হয়েছে। তার কথাবার্তায় আজ এ কি নতুন সুর! সে বিয়ে করবে না। তাকি সম্ভব? দেখছি তো, সকলেরই বিয়ে হয়। পালেদের লীলা, ক্ষীরি,—তাদেরও বিয়ে হয়ে গেছে। মনে হ'ল এই দুরন্তপনা ছেড়ে সুব্রতা কনে-বৌ সাজতে পারবে না। বড় বদরাগী মেয়ে। হয়ত বরের গালেই ঠাস্ ঠাস্ ক'রে চড় মেরে বসবে।

সুব্রতা হঠাৎ বলে ওঠে—জানিস ভৃগু, কাল ভোরে বড্ড খারাপ একটা স্বপ্ন দেখেছি।

আমি বললাম—কি দেখলি রে?

সে বল্লে—দেখেছি অনেক কিছু ; আমাদের পূর্বজন্মের কথা।

তাকে বললাম—দুর, তুই কেবল এসব কথা ভাবিস তাই। যা দেখেছিস্, তা কেবল স্বপ্ন।

সুব্রতা আবেগের সুরে বললে,—সবই তো স্বপ্ন রে। এই তুই আমি মা-বাবা সবই স্বপ্ন। মরে গেলে কে কোথায় চলে যাব। বেঁচে থাকলেও ছাড়াছাড়ি হয়ে যেতে পারে।

আমি বললাম—আচ্ছা, তোর স্বপ্নের কথাই বল।

সুব্রতা বললে—স্বপ্ন নয়, সত্যি ; আমাদের পূর্বজন্মের কথা।

আমি বললাম—বল না, কি দেখেছিল।

সে বললে—কত কি দেখেছি, এখনও চোখের সামনে জল জল করছে। দেখলাম, মস্ত বড় এক আশ্রম ; কত মুনি-ঋষি সেখানে। ছাগল, হরিণ আর পাখী। হরিণ আর ছাগলের বাচ্চা চারদিকে ছুটোছুটি করছে। ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে লুকোচুরি খেলছে তারা। চোখ জুড়িয়ে যায়। কত সুন্দর সুন্দর ফুলের গাছ রয়েছে—চাঁপা, নাগেশ্বর, করবী আর দেবকাঞ্চন। নীল, লাল, হলদে—কতরঙের জবা ফুটে রয়েছে। বকুলগাছকে জড়িয়ে উঠেছে সোনালী লতা, থোকা থোকা তার ফুল।

কৌতূহল বেড়ে যায়। তাকে জিজ্ঞেস করি—শুধু এই দেখলি ?

সুব্রতা উত্তর দেয়—না রে না। আরো দেখেছি, তুই আর আমি দুজনে খেলা করছি দেবকাঞ্চন গাছের তলায় ; কত ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দৌড়ঝাঁপ করছে। মুঠো মুঠো বনগোলাপ তুলে একজন আর একজনের মুখে ছুঁড়ে মারছে। পাপড়িগুলো উড়ে যাচ্ছে হাওয়ায়। আশ্রমের একপাশ দিয়ে একটা ছোট নদী বইছে, কাঁচের মত তার জল। লাল, নীল, শাদা—কত রঙের মাছ খেলা করছে সেই নদীর জলে। ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি করছে ; কেউ বা জলে নেমে তোলপাড় করছে ; কেউ কেউ জল-কাদা ছিটোচ্ছে আর হাততালি দিচ্ছে। কাঁচের মত সেই জলে মাছগুলো দেখা যাচ্ছে, চম্‌কে চম্‌কে পালাচ্ছে তারা !

সুব্রতার গল্প শুনে ভারি মজা লাগে ; ভয়-ডর তখন পালিয়ে গেছে। তাকে বাধা দিয়ে বলি,—ওরকম মাছ তো দরগার পুকুরেই রয়েছে। আর কি কি দেখলি বল ?

সে উৎসাহিত হয়ে উত্তর দেয়,—আরো কত কি দেখেছি ; সব আমার মনে নেই। আমাদের ঘরের সামনে মস্ত বড় একটা আমলকীর গাছ। কি সুন্দর সে ঘরখানি ! তার দেয়ালে আল্‌পনার মত কত কি আঁকা রয়েছে ; কত কি লেখা রয়েছে সোনালী অক্ষরে। বাঁশ, বেত আর পাতার সে ঘর। মাটির দেওয়াল ; আমলকীতলায় মস্ত বড় এক বেদী ; তার ওপর হরিণের চামড়া বিছানো। আমার বাবা বসেছেন তার ওপর। তার কত শিষ্য,—সকলেই তাঁরা ঋষি। তাঁদের লম্বা লম্বা চুল আর দাড়ি।

হেসে উঠি সুব্রতার কথায়। লম্বা-লম্বা চুল দাড়ি কি জানি কেন আমার ভাল লাগে না। মুনি ঋষি হ'তে পারি, যদি না চুল দাড়ি রাখতে

হয়। তাকে বললাম,—তোর বাবাকে চিনতে পারলি ? তাঁরও চুল দাড়ি রয়েছে ?

কথায় আরো জোর দিয়ে সে উত্তর দেয়—কেন চিনতে পারব না ? চুল দাড়ি থাকলেই বা কি ? আমার বাবাকে আমি চিনি না ?

শিবতোষ কাকার চুল দাড়িওয়ালা জটাধর ঋষি-মূর্তি কল্পনা ক'রে হেসে উঠলাম। সুব্রতাকে বললাম,—নিশ্চয়ই আমার চুল দাড়ি দেখিস নি ?

সুব্রতা হেসে বললে,—দূর বোকা। ছোট ছেলের আবার দাড়ি কি রে ? তোর বয়স তখন মাত্র বারো কি তেরো।

—বাঃ, তুই তো বয়সও ঠিক জেনে এসেছিস্ দেখছি ; বেশ ছিলি বল, ফিরে এলি কেন ? কার শাপে ?—কৌতুক ক'রে একথা বলি সুব্রতাকে।

সুব্রতা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে ; তারপর বললে,—সেকথাই বলছি ; বেশ আনন্দেই দিন কাটছিল। আমিও বড় হয়ে উঠলাম ; তোদের ঘর ছিল কাছেই এক আশ্রমে। তুই এসে আমার সঙ্গে ছোট বেলা থেকেই খেলাধুলো করতিস্। একদিন কোথা থেকে এক বুড়ো ঋষি এসে গোল বাধালে। সে আমার বাবাকে বললে, আমাকে বিয়ে করবে। তখন তো এ রেওয়াজ ছিল। তার কথা শুনেই আমার মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। ঘুষি বাগিয়ে তার মুখের উপর মারতে যাচ্ছি, তুই আমার হাতটা ধরে ফেললি। আমি ক্ষেপে গিয়ে বুড়োটাকে বললাম,—বুড়ো হয়ে মরতে বসেছিস, এখনও বিয়ে করবার সাধ ! মুখটা ভেঙ্গে দেবো একেবারে।

হতভম্বের মত সুব্রতার কথা শুনছিলাম। হঠাৎ বলে উঠলাম,—ভাগ্যিস, আমি তোর হাতটা ধরে ফেলেছিলাম ; না হ'লে কি হ'ত বল্ত ?

সুব্রতা হেসে উঠল,—তবুও ছেড়ে কথা কয়নি বুড়ো।

অম্বরীষের ব্রহ্মশাপের সময়ে দুর্বাসার মূর্তি চোখের সামনে ভেসে উঠল ; বললাম,—তোকে বুঝি জটা ঘুরিয়ে ব্রহ্মশাপ দিলে !

সুব্রতা বললে,—হাঁ রে, কি জানি কেন, তোর দিকে তাকিয়ে রাগে গরগর করতে করতে অভিশাপ দিলে।

আমি বললাম,—বাঁচিয়ে দিলাম কি না ? আবার অভিশাপ দিলে ?

সুব্রতা বললে,—না রে, তোকে নয় ; আমাকেই অভিশাপ দিলে। তার ফল তোকেও ভোগ করতে হচ্ছে।

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করি,—সে কি রকম ?

সুব্রতা আপসোসের সুরে বললে,—বুড়োটা বললে, বুঝেছি, ওর দিকে তুই আসক্ত। কিন্তু আমি বলছি, ওকে তুই পাবি নে। তিনজন্ম ঘুরতে হবে। পরজন্মে আমারই মত এক বুড়োর সঙ্গে তোর বিয়ে হবে।—ঘুমের ঘোরে কেঁদে উঠলাম, আর কোন কিছুই মনে নেই।

স্বপ্নের কথা বলতে বলতে সুব্রতার চোখে জল গড়াতে লাগল। সে কাঁপতে কাঁপতে বললে,—ভৃগু, কি হবে ভাই ?

এমন সময় হুতোম প্যাঁচা না কি একটা পাখী বীভৎস চীৎকার ক'রে উঠল, —হুঁম্ উ! হুম্ উ!

আমি ভয়ে ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগলাম। সুব্রতার এই অভাবনীয় দুর্বলতা আমাকে বিস্মিত করল। ভাবলাম, খেলাঘরের সেই অভিশাপের ছাপ তার মনের ওপর এখনও রয়ে গেছে।

এতক্ষণে বাড়ির মধ্যে এসে পড়েছি। সুব্রতাকে বললাম,—ওসব বাজে স্বপ্ন। স্বপ্ন কি কখনও সত্যি হয় রে ?

দু'জনে একসঙ্গে ঘরে ঢুকলাম। খানিকটা হৈ চৈ অবশ্য হয়েছিল। গোবিন্দকাকা আমাদের খোঁজে বেরিয়েছেন। তাঁকে অবশ্য আমরাও সেখানে নদীর ঘাটে দেখেছি। তিনি সাপে-কাটার ঝাড়-ফুঁক দেখতে উন্মত্ত হয়ে গেছেন। আমাদের শুধু একবার বলেছিলেন, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যা।

সুব্রতাকে সঙ্গে দেখে মা আর কিছুই বললেন না ; বরং খুশীই হলেন। সাপে-কাটা ছেলেটির বিষয়েই তখন আলোচনা চলছে। সুব্রতার মা, কনক-কাকীমা, আর মুক্তোপিসী সেই আসরে রয়েছেন। সুব্রতার মা বলে উঠলেন, —নিশ্চয়ই গাঙের ঘাটে মজা দেখতে গিয়েছিলি ? কি দেখলিরে সুবি ?

সুবি অর্থাৎ সুব্রতা তখন তাঁদের পাশে বসে সবিস্তারে গল্প জুড়ে দিল ; আমার মনে কিন্তু তার স্বপ্নের কথা তখন তোলপাড় করছে। কতক্ষণ তাঁদের আসর চলেছিল বলতে পারিনে। বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ঘুমের ঘোরে খাওয়া-দাওয়ার কথাও ভুলে গিয়েছিলাম। মা জোর করে কি খাইয়েছিলেন মনে নেই। রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম, জটাধারী এক বুড়ো সুব্রতার হাত ধরে টানাটানি করছে ; আর সুব্রতা এক হাতে তার দাড়ি ধরে টানছে। বুড়ো 'উঃ, আঃ' করছে ;—বড় হাসি পেয়ে গেল। ভোর-বেলার স্বপ্ন !

পরের দিন নদীর ঘাট কাঁপিয়ে মনসার জয়ধ্বনি উঠল,—জয়, জয় বিষহরি! শুনলাম, সাপেকাটা ছেলেটিকে বাঁচানো যায় নি। রোজারা হার মেনেছে; তাকে আবার ভেলায় তুলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। রোজাদের উপর বড় রাগ হ'ল। হায়, আমি যদি রোজা হতাম। নাঃ, বড় হয়ে রোজাই হ'তে হবে। কিন্তু কার কাছে মন্ত্র শিখব? ওই কাহু রোজার কাছে? না, না, মতির মার কাছে। মতির মার গলার স্বর বড় সুন্দর! কিন্তু ডাইনির মত চেহারা! না, না, ওদের কাছে নয়; ওরা তো ছেলেটাকে বাঁচাতে পারলে না। ঐ—ঐদিকে নদীর উজান ধরে স্বর্গে যেতে হবে মা-মনসার কাছে—যেখানে পদ্ম সরোবরে শত শত পদ্ম ফুটে রয়েছে, তার মাঝখানে পদ্মাসনে মা মনসা বসে আছেন। কত কি ভাবি!

কয়েকদিন ধরে ঘরে ঘরে সাপে-কাটার কত গল্প আর মনসার মাহাত্ম্যের কাহিনী শুনলাম। ভাটেরার কাছে বরমচাল; পণ্ডিতেরা বলেন,—ব্রহ্মাচল। সেই ব্রহ্মাচলের রমণী চক্রবর্তী। অদ্ভুত তাঁর কীর্তি; আধপাগলা ভবঘুরে ছিলেন তিনি। মনসার মন্ত্রে কিন্তু তিনি ছিলেন সিদ্ধপুরুষ। কনক-কাকীমার বাপের দেশের লোক তিনি। কনক-কাকীমা গল্প করেন,—জানিস খোকা, সাহেবসুবো পর্যন্ত তাঁকে সেলাম করত। আশে-পাশে ছিল চায়ের বাগান। কুলি-কামিনরাও ছিল রমণীঠাকুরের ভক্ত। অসুখ-বিসুখ হলে ওষুধ না খেয়ে তারা তাঁর পা-ধোওয়া জল খেতো। যেমনি লম্বা, তাঁর দেহখানি ছিল তেমনি ভারী। খুব ফর্সা ছিলেন তিনি;—গলায় রুদ্রাক্ষের মালা; কপালে রক্ত চন্দনের তিলক। খটাখট্ খড়মের শব্দ শুনলেই মনে হ'ত, ঐ রমণীঠাকুর আসছেন। শিবের মত লাগত দেখতে। রমণীঠাকুর সাপের সঙ্গে খেলা করতেন। "আয় আয়, আয়,"—বলে ডাকলে ঝোপঝাড় গর্ত থেকে বেরিয়ে আসত কত রকমের সাপ। দুপুরে একবাটি দুধ আর কলা নিয়ে উঠোনে দাঁড়িয়ে ডাকতেন,—'আয় রে কেলো, আয় রে ভুলো, দুধ খেয়ে যা।' মস্ত বড় একটা কেউটে আর তার সঙ্গে একটা ধবধবে সাদা দুধরাজ সাপ কোথা থেকে তরতর করে বেরিয়ে আসত। তারপর দুধকলা খেয়ে নাচতে নাচতে চলে যেতো।

রমণী চক্রবর্তীর কাহিনী কতদিন শুনেছি। বাবাও বলতেন, তিনি ছিলেন সিদ্ধপুরুষ। রমণী চক্রবর্তী নৌকোপুজো করেছিলেন; নৌকোপুজো

একটা রাজসূয় যজ্ঞ। পৌষ মাঘ মাসে এই পূজো হয়। খড় বাঁশ ও মাটি দিয়ে প্রকাণ্ড নৌকোর আকারে একটি কাঠামো তৈরী করা হয়। তার উপর থাকে তাকে তাকে নানা দেবদেবীর মূর্তি—দশবারোটি তাকে। সে কি অপরূপ শোভা! মৃৎশিল্পীর সুনিপুণ হাতে মাটি, রঙ আর তুলিতে ফুটে ওঠে এক দেবনগরী। নীচের তাকে নাগরথে হংসারূঢ়া দেবী মনসা। রঙ-বেরঙের শত শত সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে দেবীর আসন তৈরী করেছে। প্রসন্নবদনা লক্ষ্মীপ্রতিমা দেবী বিষহরি,—অষ্টনাগে ভূষিতা। তাঁর একপাশে প্রিয়সখী নেতা; অপর পাশে মুনি জরৎকারু। নৌকোর পাটাতনে চাঁদ সদাগরের পরিবারবর্গ—পত্নী সনকা, ছয় পুত্র এবং বধূগণ। সেই নৌকোর হাল ধরেছে বিশাল-বপু ভুলাই কাণ্ডারী, দাঁড়ি হয়েছে তার ভাই কুলাই। নৌকোর সামনে মস্ত বড় এক হাতীর উপর চাঁদ সদাগর; হাতে তাঁর হিন্তালের গদা। অপর দিকে ঘোড়ার উপর লখিন্দর। আর মনসার একদিকে নৃত্যরতা সতী বেহুলা। উপরের তাকগুলিতে সারি সারি কত দেবতা,—দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, শচী, বারুণী, ইন্দ্র, যম, বরুণ, পবন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব। তারপর সনকাদি ঋষি, বশিষ্ঠ, অগস্ত্যাদি সপ্তর্ষি, মৎস্য-কূর্মাদি দশ অবতার, দশ-মহাবিদ্যা, উর্বশী, মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরীগণ—অগণিত দেবদেবী।—চোখ ঝলসে যায়। চারদিন পূজো চলে। অহোরাত্র মনসার মাহাত্ম্য কীর্তন করে ওঝারা। লোকে লোকারণ্য হয় সেই অঞ্চল। দোকান পসার বসে অনেক।

দেবী মনসার মাহাত্ম্য প্রচারের জন্যই এই পূজো। সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে এ এক দুঃসাধ্য ব্যাপার; বড় বড় জমিদারও নৌকো পূজোর উদ্যোগ করতে সাহসী হন না। ব্রাহ্মণ, অতিথি, রবাহুত, কাঙালীর কিংবা দর্শকের জন্য চারদিন থাকে পূজাকর্তার অবারিত দ্বার। সকলকেই ভূরি-ভোজনে তৃপ্ত করা হয়। তার উপর ষোড়শ উপচারে পূজোর খরচ আছে; বৃহৎ কাঠামো ও ঘর-দুয়ার তৈরী করার খরচও আছে। দেবতা ও পুরোহিতদের কাপড়-চোপড় বাসন-পত্র ও অন্যান্য দানসামগ্রী আছে; দক্ষিণাও দিতে হয় প্রচুর। আজকের দিনে সেই বিরাট রাজসূয় যজ্ঞের কথা ভাবলে স্তম্ভিত হতে হয়। জমিদার কৃষ্ণপ্রসাদ মজুমদারের নৌকোপূজোয় নাকি সে যুগে পাঁচহাজার টাকা খরচ হয়েছিল।

কনক-কাকীমা বলেন,—গরীব বামুনের ছেলে রমণীঠাকুর। লোকে

মান্যি করলে কি হবে? সেই সস্তাগণ্ডার দিনেও কষ্টে চলত তাঁদের সংসার। ছোট ভাই রজনীঠাকুর শিষ্য-যজমান চালিয়ে যা রোজগার করতেন, তাতেই কোনোরকমে তাঁদের চলত। পাগলা রমণী সংসারের দিকে ফিরেও তাকাতেন না! হঠাৎ একদিন দেখা গেল, রমণীঠাকুরের বাড়ীর সামনের পুকুর পাড়ে যে মাঠ রয়েছে তাতে অনেক কুলি-কামিন কাজে লেগে গেছে। বাঁশ, বেত আর খড়ের বোঝা এসে জমা হ'ল শঙ্করপুর চা-বাগান থেকে। রমণীঠাকুর নাকি নৌকো পুজো করবেন। সারি সারি ঘর তৈরী হবে; রবার্টসন সাহেব নিজে আর তার মেম এসেছে তদারক করতে। গাঁয়ের মাতব্বরেরা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। এ কি কাণ্ড! এ রাজসূয়ের টাকা আসবে কোথা থেকে। মনসার কোপের ভয়ে কেউ নিষেধও করতে পারে না। আর রবার্ট-সনের সঙ্গে কে-ই বা কথা বলবে? জমিদার জয়কৃষ্ণ চৌধুরী এসে ভয়ে ভয়ে রমণীঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলেন,—"বাবাঠাকুর, ব্যাপার কি? নৌকোপুজো তো চাট্টিখানি কথা নয়।" নির্বিকার রমণী হেসে উত্তর দেন,—"আপনি ভাববেন না চৌধুরীখুড়ো, বেটী আপনার যোগাড় আপনি করবে। দেখে নেবেন আপনি।" জয়কৃষ্ণবাবু বললেন,—"সৎকাজে বাধা দিতে পারিনে বাবা, দেবী মনসার কোপে পড়ে যাব। আমাদের শক্তি তো তোমার অজানা নয়; মা তো সে ক্ষমতা দেন নি। তাই বলি কি ক'রে কি হবে? রমণীঠাকুর হেসে উত্তর দেন,—"দেখবেন খুড়ো, সবই হবে। আপনি শুধু তদারকটা করবেন।" জয়কৃষ্ণবাবু বললেন,—"তাহ'লে রবার্টসনই সব দেবে বুঝি?"

পাগল এবার গম্ভীর হয়ে বললেন,—"না খুড়ো, ম্লেচ্ছের টাকা মা নেবেন কেন?"

কাকীমার গল্প শুনে কৌতূহল বেড়ে যায়। তাঁকে জিজ্ঞেস করি,—তার পর কি হ'ল কাকীমা? সত্যিই কি ক'রে পুজোটা হ'ল?

কাকীমা হেসে উত্তর দেন,—হবে না? সিদ্ধপুরুষ যে তিনি। সবাই ভাবে পাগল। তাঁর ইচ্ছে কি অপূরণ থাকে? জয়কৃষ্ণবাবু দেশের বাছা বাছা কারিগরকে ডেকে পাঠালেন। রমণীঠাকুরের ইচ্ছে, বামুন কারিগর ছাড়া আর কাউকে দিয়ে মূর্তি গড়ানো হবে না। বরদা আচার্যি নিলে ঠাকুর গড়ার ভার। তারা কাজে লেগে গেল।

সুব্রতার ছোট ভাই শঙ্কর বলে উঠল,—আচ্ছা কাকীমা, এত ঠাকুর তারা কদ্দিনে গড়লে?

কাকীমা বলেন,—তা প্রায় মাস দুয়েক লেগেছিল। আমরা রোজ সেখানে গিয়ে হাজির হতাম ; বরদা আচার্যি কত পুতুল গড়ে দিত।

শঙ্কর বলে,—তোমায় পাখা গড়ে দেয় নি কাকীমা ?

কাকীমা বলেন,—হ্যাঁ, কত পাখা গড়ে দিয়েছিল।

শঙ্করকে ধমক দিয়ে বলি,—চুপ কর তো শঙ্কর। তারপর কি হ'ল কাকীমা ?

কাকীমা বলেন,—ঠাকুর গড়া তো শেষ হ'ল। এদিকে নিমন্ত্রণপাতি চলে গেছে ; পুজোর আর দিন চারেক বাকি। ব্রাহ্মণপণ্ডিত আর পুরুতেরা সব এসে গেছেন। বাজারহাট কিছুই হয় নি। পুজোর সামগ্রীর দেখা নেই। এঁদের খাওয়া-দাওয়ারই বা কি ব্যবস্থা হবে ? জয়কৃষ্ণবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসলেন ; ছোট ভাই রজনী তো কেঁদেই অস্থির। রমণীঠাকুরের মা কেবল ছেলেকে গাল পাড়ছেন। গাঁয়ের সকলে মিলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু এখন পুজোর কি ব্যবস্থা হবে ? আর দু'দিন বাকি। গাঁয়ের মাতব্বরদের নিয়ে পুজামণ্ডপে জয়কৃষ্ণবাবু এ অবস্থায় কি করা যায়, তার সলা-পরামর্শ করছেন, রমণীঠাকুরের পাগলামি যেন আরও বেড়ে গেছে। তিনি গান ধরেছেন—

সকলি তোমার ইচ্ছা,
ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম তুমি কর মা,
লোকে বলে করি আমি।

সন্ধ্যে হয় হয়, এমন সময় এক আশ্চর্য কাণ্ড,—গোরুর গাড়ী বোঝাই পুজোর সামগ্রী—চাল, ডাল, ময়দা, চিড়ে, সন্দেশ, গুড়, ফলমূল, কাপড়-চোপড়, বাসন-পত্র কত কি আসতে লাগল পুজোমণ্ডপের দিকে। সকলে অবাক ! কোথা থেকে এ সব আসছে ? সকলে এগিয়ে গেলেন। তাঁদের দেখতে পেয়ে গাড়ীর পিছন থেকে এগিয়ে এলেন ফেঁচুগঞ্জের বড় মহাজন সূর্য ভুঁইয়া। মা মনসা নাকি তাঁকে স্বপ্ন দিয়েছেন,—রমণীঠাকুরের নৌকো পুজোর সব ব্যবস্থা তাঁকে করতে হবে। মায়ের আদেশ কি অমান্যি করা যায় ? সমস্ত দেশে একথা তখনি রাষ্ট্র হয়ে গেল ; সেই সন্ধ্যায় ঘরে ঘরে মনসার জয়ধ্বনি উঠল, আর শাঁখ, ঘন্টা, কাঁসর বাজতে লাগল।

কাকীমার কথায় আশ্চর্য হয়ে যাই। মনসাদেবীর এত দয়া ? লোকে

বলে, আমাদের রামদীঘির তলায় মনসার ধন আছে। মনে মনে ভাবি মনসার দয়ায় যদি তা পেয়ে যাই, আমিই নৌকো পুজো করব। বেশ মজা হবে তা হ'লে! গভীর রাত্রে নাকি রামদীঘির জলে ভেসে ওঠে মনসার ধন সাতটি সোনার ঘড়া। সাতটি সাপ ফণা তুলে ঘড়ার মাথায় বসে থাকে; জল জল ক'রে তাদের মাথায় সাতটি মণি জ্বলে ওঠে। মনে হয়, দীঘির জলে পিরদীম ভাসছে; কতজন বলছে এসব কথা। সাহস হয় না, তা না হ'লে আমিও দেখতে যেতাম। বাব্বা! যা অন্ধকার, বনবাদাড়ে ভর্তি রামদীঘির চারধার। দাম আর শেওলার পাহাড় জমেছে দীঘির বুকে; ঠিক মাঝখানটায় একটুখানি জল দেখা যায়। ওখানে রাত্রে কে যাবে?

কাকীমার গল্প চলে,—সূর্য ভুঁইয়া আর জয়কৃষ্ণ চৌধুরী পুজোর তদারক করেন। ধুমধামে পূজা আরম্ভ হয়। দেশ বিদেশ থেকে ভাল ভাল সব ওঝা আসে। দিনরাত মনসার ভাসান গান হ'চ্ছে থাকে। অঢেল আয়োজন করেছিলেন সূর্য ভুঁইয়া।

কাকীমাকে জিজ্ঞাসা করি,—রমণীঠাকুর তখন কি করছেন কাকীমা? নিশ্চয়ই খুব খুশী হয়েছেন।

তিনি বললেন,—সূর্য ভুঁইয়া আসার খবর পেয়েই রমণীঠাকুর ঘরে গিয়ে দরজায় খিল দিলেন। সাধাসাধি ডাকাডাকি ক'রেও তাঁকে কেউ বের ক'রে আনতে পারলে না। এদিকে আর এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল; মন্ত্র পড়ে পুরুতেরা যেই মনসার আবাহন করছেন, অমনি কোথা থেকে এক কাল সাপ এসে নৌকোর কাঠামোয় উঠতে লাগল। সাপটা ঠিক মা-মনসার পায়ের তলায় কুণ্ডলী পাকিয়ে সামনে ফণা মেলে বসে থাকল। তিনদিনের পর চতুর্থ দিনে বিসর্জন। ঐদিন রমণীঠাকুর দরজা খুললেন। দেখা গেল, তাঁর ভীষণ জ্বর। তিনি আবোল-তাবোল বকছেন। তিনি বললেন,—মা মনসার সামনে আমায় বিছানা ক'রে শুইয়ে দাও, বেটী আমায় নিতে এসেছে। তাই করা হ'ল। পুজোও শেষ হ'ল। সেই কাল সাপ ধীরে ধীরে নেমে এসে রমণীঠাকুরের মাথার উপর ফণার ছাতা মেলে ধরল। সিদ্ধপুরুষের মুখে হাসি ফুটে উঠল—তারপর সব শেষ হয়ে গেল। তাঁর নিঃশ্বাসে দেবীর সামনের প্রদীপ নিভে গেল। হাজার হাজার লোক দেখতে এসেছিল রমণীঠাকুরকে। কিছুক্ষণ পরে সাপটা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। লোকেও হায় হায় করতে লাগল।

কৌতূহলে মন ভরে যায়। জিজ্ঞেস করি,—তুমি নিজে দেখেছ কাকীমা ?

তিনি যুক্তকরে কার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন, বোঝা গেল না। তারপর বললেন,—হ্যাঁ রে হ্যাঁ, আমিও দেখে'ছি। সেই পূজোর ভিটে দেখতে এখনও দূর-দূরান্ত থেকে লোক আসে। তার মাটি নিয়ে যায়। বিয়ের সময় সেই মাটির তিলক পরিয়ে দেয় বর-কনের কপালে। আমার তোরঙ্গে সে মাটি এখনও আছে। বড় হ'লে দেখতে যাস রমণীঠাকুরের নৌকো-পূজোর ভিটে।

হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। তার অনেক বৎসর পর, এই তো মাস কয়েক আগে ছুটির দিনে সে ভিটে দেখতে গিয়েছিলাম। এরই মধ্যে আবার সেই ছেলেবেলার বন্ধু সরোজ এসে জুটেছে। দিদির বাড়িতে আমার অসুখের সময় সে কোথায় অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। তাকে পেয়ে খুশী হলাম। এখানে পুরোনোদের আর কেউ নেই। শহর থেকে আরো দু'তিনটে স্টেশনের পর সেই ব্রহ্মাচল; সরোজের মাসীর বাড়ি সে দেশে।

ছোট ছোট পাহাড় ঢেউ খেলে চলেছে। বন্য পাদপ আর লতা-পাতার বিচিত্র শোভা। তার মাঝে লালমাটি আর কাঁকরের উপর দিয়ে আঁকাবাঁকা পায়ে-চলার পথ চলে গেছে। দেবকাঞ্চন আর মহুয়া গাছে সোনালতা আর মাধবীলতা হাওয়ায় দুলছে। তেজপাতা আর নাগেশ্বর ফুলের গন্ধে ব্রহ্মাচলের পথঘাট ভরপুর। চা-বাগানের চত্বরগুলো চোখের সামনে সাজানো রয়েছে। অনেকখানি এগিয়ে গিয়ে দেখি প্রকাণ্ড পুকুর, তার পূবদিকে পূজোর ভিটে। পশ্চিমে রমণী চক্রবর্তীর বাড়ি। লোকে বলে এখনও মাঝে মাঝে এ ভিটের প্রদীপ জ্বলতে দেখা যায়। শ্রাবণের সংক্রান্তি দিনে সেই ভিটের উপর লোকে অষ্টনাগের জন্যে মাটির সরায় দুধকলা দিয়ে যায়।

রজনী চক্রবর্তী এখনও বেঁচে আছেন। তিনি আবার কালীভক্ত। মস্ত বড় এক প্রতিমা,—করালবদনা, মুক্তকেশী, নৃমুণ্ডমালিনী, চতুর্ভূজা কালী —শবরূপী মহাদেব তাঁর পদতলে। সেই ভীষণ মূর্তি দেখলে ভয় হয়।

শুনলাম রজনী চক্রবর্তী যখন পূজো করেন, তখন কালী জাগ্রত হয়ে ওঠেন! তাঁর আরতির তালে তালে মৃন্ময়ী প্রতিমার ওষ্ঠাধর কেঁপে ওঠে। দুলতে থাকে সে মাটির মূর্তি। অদৃশ্যলোক থেকে পুষ্প-বৃষ্টি হয় সে সময়ে।

রজনী চক্রবর্তীর কালী পূজোও দেখেছি। দেবীর প্রাণসঞ্চার হয় কিনা জানিনে। কিন্তু আরতির তালে তালে মাটির মূর্তি যেন দিব্যজ্যোতিতে দীপ্যমান হয়ে ওঠে। মনে হয় দেবী দুলছেন। সে সময় দেবীর আভরণ থেকে একটি দু'টি ফুলও ঝরে পড়ে।

ভাববিহ্বল রজনীঠাকুর কেঁদে কেঁদে ডাকেন,—মা, মা, মা! অতি সহজ সরল মানুষ তিনি। গৃহস্থের সংসার, স্বামী স্ত্রী আর দুটী কন্যা। সাধারণ ভাবেই থাকেন। থেলো হুকোয় তামাকের ধূমপান করতে ভালবাসেন। আমার ধারণা ছিল সব কালীসাধকই গাঁজা সিদ্ধি ও সুরা পান করেন। কিন্তু রজনী চক্রবর্তীর সে বালাই নেই।

রজনীঠাকুরকে প্রশ্ন করি,—আচ্ছা, লোকে বলে আপনার পূজোর সময় কালী জাগ্রত হয়ে ওঠেন; তা কি ঠিক?

তিনি হেসে উত্তর দেন,—তোমরা তো পূজো দেখলে। তোমাদের কি মনে হয়?

আমি উত্তর দিই,—আমরা কি ক'রে তা বুঝব? তবু মনে হ'ল প্রতিমার গা থেকে আলো বের হচ্ছে।

মুচকি হেসে রজনী চক্রবর্তী উত্তর দেন,—আলো তো সর্বত্রই আছে বাবা! তুমি, আমি, মাটি, পাথর—সবার মধ্যেই সেই আলো রয়েছে। আমরা যে আলোর মাঝেই ডুবে আছি—সব এক একটা আলোর গোলা। এ আবার নতুন কি?

আমি বললুম,—আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি নে। আমাদের বুঝিয়ে বলুন।

তিনি বললেন,—কি আর বুঝোব বাবা! বেশী কিছু তো জানি নে, ছোটবেলা থেকে পূজোই শিখেছি। মন্ত্র-তন্ত্র যা বলি, তাও আওড়াতে আওড়াতে মুখস্থ হয়ে গেছে, অনেক জায়গার মানেও বুঝি নে—তবু পূজো করি! আর মায়ের জাগ্রত হওয়ার কথা জিজ্ঞেস করছ বাবা! মা তো সব সময়ই জাগ্রত আছেন; তিনি ঘুমোলে কি আর জগৎ চলে?

চক্রবর্তীর তত্ত্বকথার মধ্যে একটা সহজ সরল ভাব ফুটে ওঠে। নিরহঙ্কারী ভদ্রলোক। সোজাসুজি বললেন,—হ্যাঁ, পূজোর সময় মনে হয় এক মহা জ্যোতির্ময় আলোর মধ্যে ডুবে আছি। আমার সামনের দেবমূর্তি আর আমি একই আলোতে মিশে যাই; আর কিছুই বুঝি নে বাবা।

চক্রবর্তীর মুখে একটা অপূর্ব আনন্দ ফুটে ওঠে, তার সঙ্গে দেখি এক আপনভোলা ভাব। তিনি হুঁকোয় টান দিতে থাকেন। আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করি,—বেশ তো, শুনেছি মা কালী সন্তুষ্ট হ'লে সবই পাওয়া যায়। এই তো কি রকম কষ্ট ক'রে আপনি রয়েছেন। মা কালীর কাছে নিজের জন্য কিছু চান না কেন?

এবার হো হো ক'রে হেসে ওঠেন রজনীঠাকুর,—বেশ বলেছ বাবা, কি চাইব? পাকা-বাড়ি, টাকাপয়সা, সোনাদানা, গাড়ী-বাড়ি? আর কি চাইব? রাজত্বটা?

লজ্জিত হয়ে পড়ি তাঁর কথায় আর তাঁর হাসিতে! তিনি বললেন,—বাবা, চাওয়ার কি আর সীমা আছে? আমার কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ মা-ই সবচেয়ে ভাল জানে। তাঁর কাছে আর চাইব কি? আমার যেটা হজম হবে, সেইটেই বুঝেসুঝে বেটী খাওয়াচ্ছে; নিজের হাতে ভার নিলে তো একদিনও বাঁচব না।

তাঁর কথা শুনে মুগ্ধ হলাম; ক্ষেত্রদিদির কথারই প্রতিধ্বনি। রজনী-ঠাকুর বললেন,—বাবা, লেখাপড়া করছ। কাজ করছ; কাজই ক'রে যাও। কাজ করাই পুজো বাবা। দেখছ না, মহাকালী মহাকালের বুকের উপর দাঁড়িয়ে কাজই ক'রে যাচ্ছে; অসুর নাশ ক'রে সুরদের পথ পরিষ্কার ক'রে দিচ্ছে। তোমারই সুর, তোমারই দেবতা; কাজ ক'রে যাও। আমি আশীর্বাদ করছি।

মাথায় হাত রেখে বৃদ্ধ রজনী চক্রবর্তী আশীর্বাদ করলেন। কালী-সাধনার মোহ আমাকে আবার একটা ধাক্কা দিলে। এক নতুন আনন্দের অনুভূতি মনে জেগে উঠল! ব্রহ্মাচলকে সত্যই ব্রহ্মাচল বলে অনুভব করলাম।

নদীর তীরেই বসে আজি, মনে যত পুরনো কথা জাগছে। সূর্য ডুবছে লাল হয়ে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা জলে ওঠানামা করছে; কেউ বা কারো গায়ে জল ছিটিয়ে দিচ্ছে। কল্পনার জগতে স্মৃতির পর্দা খুলে গেল আবার।—জ্যৈষ্ঠ মাসে ছোট ছোট মেয়েদের কন্যা-ভাসানো উৎসব। নদীতে নতুন জল এসেছে; কলার খোলা কিংবা সুপারি গাছের মাথার খোলা দিয়ে ছোট ছোট ছইওয়ালা নৌকো তৈরী করে ছেলেমেয়েরা। নৌকোগুলি

ফুল আর পাতায় সুন্দর ক'রে সাজানো। তার মধ্যে নেকড়ার তৈরী ছোট ছোট কাঁথা আর বালিশের বিছানা। সেই বিছানায় নেকড়ার পুতুল বসিয়ে দেওয়া হয়। মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে, সঙ্গে একপাল ছেলেমেয়ে। জামাইবাবাজীও অবশ্য আছেন। মেয়েরা মালপত্রে নৌকো বোঝাই ক'রে দেয়,—মণ্ডা, মিঠাই, বাতাসা আর কত মিষ্টি নাড়ু! খাবারগুলি কিন্তু নেকড়ার কিংবা ধুলো-কাদার নয়; ঘরে ঘরে মা-পিসীমারা যত্ন ক'রে তা প্রস্তুত ক'রে দেন। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে কিশোরী মেয়েরা গান করে। ব্যথাতুর তাদের সুরলহরী, সত্যিকারের কন্যাবিদায়ের খেদোক্তি—তার ধুয়া "আম কাঁঠাল খাওনি, কন্যা যাইগো" এখনো আমার কানে ভাসে,—

ভোলার ঘরে যাও গো গৌরী
নতুন জলে ভেসে।
শরৎ এলে আনব ঘরে
আসবে হেসে হেসে॥
(গৌরী, যাও গো)
আম-কাঁঠাল পচবে ঘরে
কাঁদবে তোমার মা।
আবার এলে রাখব বুকে
(আর) যাইতে দিব না॥

নৌকো ভাসায় ছোট ছোট কুমারী মেয়ে। হেলে-দুলে এগিয়ে চলে সে খেলনার নৌকোগুলি। ঝপাঝপ ছেলেরা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা নৌকো ধরে, মণ্ডা, মিঠাই লুটে খায়। ডাঙ্গায় মেয়েরা বকাবকি করে, চোখ রাঙায়। ললিতা আর শোভনা জোর গলায় চীৎকার ক'রে কেঁদে ওঠে। চৌধুরীদের জগাই, আর ভট্টাচার্যিদের দেবু তাদের নৌকো ডুবিয়ে দিয়েছে। আমিও তখন অথই জলে। সুব্রতার নৌকোর দিকে জগাই তখন এগিয়ে চলেছে; আমিও প্রাণপণ ছুটছি। সুব্রতা ডাঙ্গা থেকে চীৎকার করে,—"হেই জগা, খবরদার বলছি।" আমাকে জগা পিছনে ঠেলে দেয়; সে সুব্রতার নৌকো ধরে ধরে। জলে তোলপাড় শব্দ হ'তে লাগল। সুব্রতা সাঁতার কেটে তীরের মত ছুটে এসেছে। সে এসেই জগার নাকে মারল এক ঘুষি, রক্তারক্তি কাণ্ড! আমারও তখন প্রাণান্ত অবস্থা। সুব্রতা তখন আমাকে পিঠে ফেলে সাঁতার কেটে উপরে উঠে এল।

এমনি ক'রেই দিন কাটছিল। হঠাৎ মায়ের অসুখ করল। আমরা কিছুই বুঝতে পারি নি। দু'তিন দিন সুব্রতাদের ঘরেই আমাদের রাত কাটল। একদিন ঘুম ভেঙে গেল কান্না আর চীৎকারে—মা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। বড়দা উঠোনে পড়ে আর্তনাদ করছেন; মাকে তিনি কিছুতেই নিয়ে যেতে দেবেন না। তাঁর দেখাদেখি আমিও মায়ের আঁচলটা টেনে ধরলাম। কিন্তু আমাদের বাধা কেউ মানল না।

তারপর যেন ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে কয়েকটা দিন কেটে গেল। নতুন জায়গায় চললাম—খেলাঘর ভেঙে; তিনদিনের পথ বাবার কর্মস্থলে।

নৌকোয় যেতে হবে, শুনে তো ভারি মজা হ'ল! এখানকার পাট একেবারে ঘুচে যাবে। বন্ধু-বান্ধব, খেলার সঙ্গীসাথীরা নিঃশব্দে শুধু আমার মুখের দিকে তাকায়, সুব্রতার মুখখানি ভার ভার ঠেকে। একদিন সন্ধ্যের পর সুব্রতা আমাকে নিরিবিলিতে ডেকে বললে,—ভৃগু, তোরা তো চলে যাচ্ছিস! আমার স্বপ্নের কথা মনে আছে তো? দেখবি, সবই মিলে যাবে।

সুব্রতার কথা শুনে আবার সেই বুড়ো ঋষির কথা মনে পড়ল। সুব্রতাকে বললাম,—ভয় কি? এখন তো আর ঋষি-টিষি কেউ নেই! সবই মানুষ। স্বপ্নের অভিশাপ সত্যি হয় না রে।

সুব্রতা সজল চোখে উত্তর দেয়,—সত্যি মিথ্যে জানিনে ভৃগু! তুই, আমি, এই বাড়িঘর সবই তো সত্যি! তোর সঙ্গে তো আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল!

হেসে বললাম,—ছাড়াছাড়ি হবে না? বিয়ে হলেও তো শ্বশুরবাড়ি চলে যাবি। তখন তো ছাড়াছাড়ি হবেই।

দর দর ক'রে জল নামল তার দু'চোখ বেয়ে। আমাকে জড়িয়ে ধরে সুব্রতা কাঁদতে লাগল,—তুই বুঝবিনে ভৃগু। তুই কি ক'রে জানবি বল! দেখিস আর কোনদিন আমাকে দেখতে পাবিনে।

তার কথা শুনে কষ্ট হয়। এতদিনের ভাব, খেলাধুলো এসব কি ভোলা যায়? পাড়ার সব ছেলেব সঙ্গেই সুব্রতার আড়ি। কার সঙ্গে সে খেলাধুলো করবে? সবাই ওকে ভয় করে বা এড়িয়ে চলে। সুব্রতার অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করি।

দু'দিন পর আমাদের নৌকো ছেড়ে দিল। হাসিমুখে নৌকোয় গিয়ে

উঠলাম। ঘাটে অনেকেই ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে ; সুব্রতাও ছিল। এক সময় নৌকোয় উঠে চুপিচুপি আমার হাতে নেকড়ায় জড়ানো একটা ছোট্ট জিনিস দিয়ে বললে,—'এখন খুলিস নি, এটা রেখে দিবি।'

পরে খুলে দেখেছিলাম—রথের মেলায় কেনা তার বড় সাধের একটা পেতলের আংটি।

পাহাড়ে ঘেরা সম্পূর্ণ নতুন জায়গা। সামনে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে ভাবি,—কোন্ পথে এ অদ্ভুত দেশে এসে পৌঁছলাম! উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম চারিদিকেই পাহাড়। তার মাঝখানে সমতল ভূমির চত্বর—গাছ-পালা, বাড়ি-ঘর, নদী-নালা আর রাস্তা-ঘাট। উত্তরে সারি সারি পাহাড়ের পর পাহাড়, যেন ঢেউ খেলছে। সেই ঢেউগুলো ক্রমশ উঁচু হয়ে পাহাড় স্পর্শ করেছে।

বেশ বোঝা যায়, সাদা-কালো মেঘ পাহাড়ের গায়ে নেমেছে। মাঝে মাঝে তারা আবার ছুটোছুটি করে। না, না, এর সবগুলি তো মেঘ নয়। ওই সাদা রঙের ডেলাগুলি নিশ্চয় ভাসমান অভ্র। বুড়ো পিসীমা বলেন,—আকাশের আভ গাছের পাতা খেতে পাহাড়ে নেমে আসে। আর পাহাড়ীরা তখন গাছের ওপর উঠে লুকিয়ে থাকে। যেমনি ওরা পাতা খেতে আরম্ভ করে, অমনি তারা লাঠি মেরে আভগুলিকে ফেলে দেয়। সেই আভই আমরা হাটে বাজারে পাই ; পাহাড়ীরা নেমে এসে বিক্রী করে।

পিসীমার অভ্র-তথ্য কৌতূহল বাড়ায়, অভ্রেরা তাহ'লে পাখীর মতই জ্যান্ত! কিন্তু রহস্যময় এই পাহাড়! মাঝে মাঝে মেঘমালা ধোঁয়ার মত পাহাড়গুলিকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে। তখনই বোঝা যায়, বৃষ্টি নামবে। রাত্রে পাহাড়ের গায়ে মাঝে মাঝে আগুন জ্বলে ওঠে। পাহাড়ে আবার মানুষের বাস! কিন্তু কই কাউকে তো দেখা যায় না! শুনেছি পাহাড়ে আর ঐ ভীষণ বনজঙ্গলে বাঘ, ভালুক, সিংহ প্রভৃতি জানোয়ার আছে ; কিন্তু কিছুই বোঝবার উপায় নেই। কালো কালো ঝোপের মত দাগ ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। এই উঁচুনীচু খাড়া জায়গায় মানুষ কি ক'রে থাকবে? পাহাড়ের ঢেউ আকাশের গায়ে গিয়ে ঠেকেছে। এখানেই কি পৃথিবীর শেষ? মনে মনে কত প্রশ্ন জাগে।

এখানেও বাড়ির কাছে দক্ষিণ দিকে বিরাট নদী,—যেন পাহাড়ী

অজগর। বর্ষাকাল, কূলকিনারা ঠাওরাবার উপায় নেই। ওই যে কিছু দূরে দক্ষিণ আর পশ্চিম থেকে সারি সারি পাহাড়, এসে নদীতে নেমেছে, যেন ছোটবড় হাজার হাতী। তার মাঝে দিয়ে নদী চলেছে; আর দু'পাশ থেকে হাতীর পাল যেন সত্যিই জলে নেমেছে। এমনই সুন্দর এ দৃশ্য! পড়ন্ত রৌদ্রে পশ্চিম দিকে তাকালে নদী আর পাহাড়ের এই মিলন দৃশ্য অপরূপ লাগে! ঐখানটায় আবার নদীর ভেতর ঠেলে এসেছে মস্ত বড় একটা হাতী, তার মাথার উপর ঝকমক করছে একটা মন্দির,—মন্দিরে সিদ্ধিনাথ সিদ্ধেশ্বর শিব! অগণিত নরনারী মিলিত হয় বারুণীমেলার উৎসবে। শিববাহী হাতীর পিছনে আর একটি মেরুপৃষ্ঠে স্বর্ণপ্রতিমা দুর্গা।

পাহাড়ের বিচিত্র শোভা আমাকে মুগ্ধ ক'রে তুলল। যতই দিন যায়, নতুনের আকর্ষণ তত বাড়ে; ভুলে যাই সুব্রতার কথা। সিদ্ধিনাথ শিবের আসন স্থাপন করেছিলেন কোন এক কপিল মুনি, হাজার হাজার বছর আগে। সারি সারি পাহাড়ের শ্রেণী তাঁরই আদেশে নাকি হর-গৌরীকে মাথায় তুলে নিতে নদীর এই বাঁকের মোড়ে এসে মিলিত হয়েছে।

বাড়ির সামনে বড় সড়ক রাস্তা; চলে গেছে পশ্চিম দিকে ওই সিদ্ধিনাথের কাছ দিয়ে। হাতীর সারি আর সিদ্ধিনাথের আকর্ষণ আমাকে চঞ্চল ক'রে তুলল। এই নতুন জায়গায় সঙ্গী-সাথীরা কত গল্প করে বারুণী মেলার। মণিপুরী মেয়েরা নৃত্য করে। গান গেয়ে অপরূপ সাজে সেজে নেচে নেচে যায় মণিপুরী কিশোর-কিশোরী! সিদ্ধিনাথকে তারা দিতে যায় অর্ঘ্য। যদি সুব্রতা সঙ্গে থাকত! কিন্তু ভাবনা কেন? এই সোজা সড়কটা দিয়েই তো ফিরতে পারব।

পথে পড়ে ছোট ছোট গ্রাম, বাজার, মাঠ, জলা আর বন। গ্রামের ভেতর ঢুকলে আর পাহাড় দেখতে পাইনে, কেবল দু'ধারে বাড়ি। বাড়ির চারধারে মূর্তাবনে ফুটেছে সাদা সাদা ফুল; কোথাও বা রাস্তার উপর কুলগাছ ঝুলে রয়েছে। দু'চারটে কুলও পড়ে থাকে রাস্তায়। লোভ হ'লেও কুড়োতে ভয় হয়। কই রাস্তা তো শেষ হ'ল না, মনটা বিচলিত হয়ে ওঠে। এদিকে রৌদ্রের রঙও পাল্টাচ্ছে; মিঠে মিঠে হলুদ রঙের রৌদ্রে গাছের পাতা চিকচিক করে ওঠে। ক্লান্তির আমেজ দেখা দিল। কত লোক যাতায়াত করছে! কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতেও ভয় হয়। রাখালেরা গরু তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। আমারই মত কত ছেলে পাশ দিয়ে

চলে যায়, আমাকে কেউ কোন কিছু জিজ্ঞেসও করে না। পথ চলে কত লোক। মনে হয়, পথের পাশে যাদের বাড়ি-ঘর, এসব দেখে দেখে তাদের অভ্যেস হয়ে গেছে; কোন কৌতূহলও তাদের জাগে না। কোমরে গামছা জড়ানো দশ-এগারো বছরের একটা কালো মেয়ে প্রকাণ্ড একটা কালো মোষকে তাড়া ক'রে ছুটছে, অদ্ভুত লাগে এ দৃশ্য!

একটা বড় গ্রাম পার হয়ে যখনই বাইরে এসে পৌঁছলাম, তখন বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। এই যে দুধার থেকে হাতীরা জলে নামছে। উঁচু হয়ে উঠেছে নদীর বুক। হাতীর মত নদীর বুকের ভেতর অনেকখানি বেরিয়ে এসেছে একটা পাহাড়, তার মাথার উপর ধবধব করছে একটা মন্দির। মন্দিরের মাথায় ত্রিশূল। তার পায়ে ফোঁস ফোঁস ক'রে আছড়ে পড়ছে নদীর ঢেউগুলো। বড় কাছে, কিন্তু নদীর ওপারে। বিস্মিত হয়ে সেই দৃশ্য দেখতে লাগলাম। সামনের দিকে আর এগিয়ে যাবার প্রয়োজন নেই; —কালো-কালো পাথর, মাঝে মাঝে ধূসর রেখা—কি ভীষণ আর কি ভয়াবহ! ফাঁকে ফাঁকে ঝোপ-ঝাড় আর দু'একটি গাছ।

"তুমি কে ভাই?"

প্রায় আমারই বয়সী একটি ছেলে। ফুটফুটে দুধে-আলতার মত তার রঙ; হাসিমাখা মুখখানি। আমার হাত ধরে জিজ্ঞেস করে,—তুমি কে ভাই?

তার মুখের দিকে চেয়ে থাকি; উত্তর দিতে দেরি হয়। হঠাৎ মনে পড়ে আমি কোথায় এসে পড়েছি।

সে আবার বলে ওঠে,—তুমি বুঝি এখানে নতুন এসেছ?

এবার আমার চমক ভাঙ্গে। কোথায় এসে পড়েছি, বেলা যে শেষ হতে চলল! সূর্য যে পশ্চিমের কালো রেখার কাছে পৌঁছে গেছে! না, না—ঐ বিস্তীর্ণ নদীর কোলে কি ডুব মারবে? জল আর জল—কোথায় গেছে এ নদী! পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে অনন্তের কোলে কালো রেখায় আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে। নদী আবার কি আকাশে ফিরে গেছে?— আমি আনমনা হয়ে ভাবছি। ছেলেটি আমার ডান হাতখানি ধরে রয়েছে! আবার সে জিজ্ঞেস করে,—"পথ হারিয়েছ বুঝি?" উত্তর দিলাম—"না"।

ছেলেটিকে বড় আপনার জন বলে মনে হ'ল, আমিও তার হাত জড়িয়ে ধরলাম। আমার দৃষ্টি তখন মন্দির আর সূর্য থেকে ফিরে এসেছে। মুগ্ধ হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সে এবার জিজ্ঞেস করে,—কোথায় এসেছ? এখানে কাদের বাড়িতে?

আমি উত্তর দিই,—কারো বাড়িতে নয়, আমি পাহাড় দেখতে এসেছি।

সে আমার কথা শুনে হেসে উঠল,—পাহাড় দেখতে?

—হ্যাঁ, পাহাড় দেখতে। বড় সুন্দর লাগে। ওই—ওই দিকে নদীর ধারে আমাদের বাড়ি। সেখান থেকে রোজ দেখি যেন হাতীর পাল নেমেছে নদীতে। তাই আজ এদিকে চলে এসেছি।

—বেশ করেছ, আমারও খুব ভাল লাগে। কত দূর তোমার বাড়ি? রোজ আসবে।

আমি বললাম,—কত দূর কি ক'রে বলব? ওই, ওই পূবদিকে বাজার ছাড়িয়ে ইস্কুলের ধারে।

সে আমার হাত ধরে বললে,—চল, এই যে আমাদের বাড়ি। রোজ আসবে, আমার সঙ্গে খেলা করবে। একা-একা আমার ভাল লাগে না।

পাশেই তাদের বাড়ি। মনে হ'ল, এটা কি কারও বাড়ি? না, পুলিসের থানা? লাল পাগড়ি মাথায় ষণ্ডা ষণ্ডা লোকগুলো চলাফেরা করছে। একটা বাংলো-গোছের ঘরের সামনে আবার বন্দুক হাতে সিপাই ঘুরছে। আমার তো ভয় হ'ল। নতুন সঙ্গীকে বললাম,—এটা তো পুলিসের থানা।

সে হেসে উত্তর দিল ,—না, পুলিসের থানা নয়; নদীর ঘাটিয়ালের থানা। এখান থেকেই নদী পাহারা দেয়; আমরা অনেক দিন এখানে এসেছি। চল আমাদের বাসায়।

সে প্রায় টানতে টানতে পাঁচিল-ঘেরা এক বাংলো-ঘরের মধ্যে আমাকে নিয়ে ঢুকে পড়ল। তারপর ডেকে বলতে লাগল,—মা, মা, দেখ, কাকে নিয়ে এসেছি।

একজন মহিলা অন্য ঘর থেকে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন; তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,—কিরে সুবীর, কাকে নিয়ে এসেছিস?

সুবীর বললে,—আমার খেলার সাথী—বন্ধু! জান মা, কত দূর থেকে পাহাড় দেখতে এসেছে! রাস্তায় দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে ওই মন্দিরের চুড়োর দিকে তাকিয়ে ছিল।

মহিলাটি সকল কথা শুনে চিন্তিত হয়ে পড়লেন বলে মনে হ'ল। সুবীর আমাকে নিয়ে তখন উন্মত্ত। বুঝলাম, সে সত্যই বড় একা। বল, ব্যাট,

ডাণ্ডাগুলি সকল উপকরণই আছে ; কিন্তু তার খেলার সাথী কেউ নেই। ভাইবোনগুলি ছোট ছোট। তারা তার সমকক্ষও নয়। উঠোনে আমরা অনেকক্ষণ খেলা করলাম। সুবীরের মা খই, মুড়কী ও নাড়ু—কত কি খেতে দিলেন। সন্ধ্যে হয়, বাড়ি ফেরবার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। তাকে বললাম,—এবার আমি বাড়ি যাব।

সুবীর বললে,—কাল একটু শিগ্‌গির এসো কিন্তু।

সুবীরের মাও বললেন,—বেশ বেশ, আসবে।

ইতিমধ্যে সুবীরের বাবা এসে আমাকে দু'এক কথা জিজ্ঞেস করলেন। বুঝলাম তিনি আমার বাবাকে চেনেন। আমিও তাঁকে দু'একদিন আমাদের পাশের জমিদার-বাড়িতে দেখেছি বলে মনে হ'ল ; কিন্তু সাহেবী পোশাকে।

সন্ধ্যার একটু আগে সুবীরের মা বললেন,—খোকা, তোমাকে নৌকো ক'রে আমাদের লোক পৌঁছে দেবে। সাত দাঁড়ের ছিপে আধঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাবে। একা চলে এসেছো, বাড়িতে সবাই কত ভাবছেন ! সাইকেলে ক'রে একটা পেয়াদা চলে গেছে তোমাদের বাড়িতে খবর দিতে।

সুবীরের মায়ের কথায় আমার চমক ভাঙল ; বাড়িতে না জানি কি হচ্ছে ? নিশ্চয়ই খোঁজাখুঁজি করছে। আমি কত দূরে কোথায় এসে পড়েছি ! আবার সুবীরের আকর্ষণও আমায় পেয়ে বসল। এই আধঘণ্টার মধ্যেই সে যেন আমার কত আপন জন হয়ে পড়েছে। সুব্রতার কথা মনে পড়ল, 'নিশ্চয়ই পূর্বজন্মের সম্পর্ক'। হাসি পায় সে কথা চিন্তা করলে।

আমাকে ছিপে তুলে দিতে সুবীরের বাবা নিজে এলেন ; সুবীরও এসে দাঁড়িয়েছিল ! সে বার বার বলতে লাগল,—আসবে কিন্তু কাল আবার।

সাত দাঁড়ের ছিপ নদীর উজান বেয়ে চলল। বাড়িতে এসে দেখি তুমুল কাণ্ড ! লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়েছে। পুকুরে জাল ফেলা হয়েছে ; চারদিকে লোক ছুটেছে ; ঘাটিয়ালের পেয়াদা কিছুক্ষণ আগে খবর দিয়ে না গেলে আরো তুমুল ব্যাপার কিছু নিশ্চয়ই ঘটত !

সেদিন থেকে বাড়ির বাইরে একাকী যাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। একে তো ঘরে মা নেই ; দূর সম্পর্কের এক কাকীমা এসে আমাদের ভার নিয়েছেন। অন্যদের মাকে দেখে আর তাদের মা ডাক শুনে আনমনা হয়ে

পড়ি। দিবা রাত্রি সিদ্ধিনাথের চূড়া আর নতুন বন্ধুর মুখ মনের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি মারে। সেই হঠাৎ-পাওয়া বন্ধুকে পাঁচ ছ' বছর পরে আবার হঠাৎই পেয়েছিলাম ; সুবীর তখনও আমাকে ভোলেনি।

পাশেই বড়লোক দত্তদের বাড়ি ; তাঁদের অনেক কীর্তিকলাপ। মাঝে মাঝে সেখানে কত সাধু সন্ন্যাসী আসেন ! তাঁদের কাছে আমরা গিয়ে ভিড় ক'রে দাঁড়াই। এক সন্ন্যাসী দিনরাত ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকতেন একটা বটগাছের তলায়। তিনি ছোটদের খুব ভালবাসতেন। মুঠোয় ধুলো তুলে তিনি চিনি বানিয়ে দিতেন। আমরা সে চিনি মুঠো মুঠো খেয়েছি। তাঁর কেরামতি আমাদের শিখিয়ে দেবার জন্য কত যে সাধ্যসাধনা তাঁকে করেছি, আজ তা মনে পড়লে হাসি পায়। তিনি আবার নিরাহারী ছিলেন। সবাই বলত, জল ছাড়া তিনি কোন কিছুই খান না। রোগা, পাতলা চেহারা ; মাথায় জটা, মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি। বম্ বম্ ক'রে ঘণ্টায় ঘণ্টায় গাঁজার কল্কেতে দম দিতেন।

পাড়ার দু'চারজন সাধুবাবার কাছে পড়ে থাকত ; অর্থাৎ সাধুবাবার পেসাদী কল্কেতে দম দিয়ে বুঁদ হয়ে বসে থাকত। তারাই বলত, সাধুবাবা নাকি গভীর রাত্রে বিলের ধারে মহাশ্মশানে গিয়ে শিবের অনুচরদের সঙ্গে মিলিত হন। সেখান থেকেই এ সব গাঁজা আসে ; এ গাঁজায় দম দিলে ক্ষুধা-তৃষ্ণা না কি দূর হয়ে যায় ; কিন্তু প্রথম টান দিতে হবে। সেই জন্যেই তারা বসে থাকে। বাবার যদি কৃপা হয়। কিন্তু লুকিয়ে চুরিয়ে যে এক টান দেবে, তার উপায় নেই ; সাধুবাবা নাকি সহস্রলোচন ! তারাই কল্কে সাজিয়ে দেয়, কিন্তু একরতিও লুকিয়ে রাখতে পারে না। দিনের পর দিন সাধুবাবার ভক্তের সংখ্যা বেড়ে যায়। এমন যে পরম বৈষ্ণব আমাদের বৃন্দাবন পাল, একদিন দেখি, তিনিও সাধুবাবার পেসাদী-কল্কেতে দম দিচ্ছেন।

নটবর দাসের বিধবা বোন আহ্লাদী। বেঁটে আঁটসাঁট চেহারা, চ্যাপ্টা গোলাকার মুখের মাঝখানে ততোধিক চ্যাপ্টা ছিল তার নাক ; গোল গোল দুটি চোখ যেন গোলার মত বেরিয়ে আসছে। সবাই তাকে রীতিমত ভয় করত। অন্যদের দেখাদেখি আমিও তাকে ডাকতাম আহ্লাদীপিসী। আহ্লাদীপিসী সাধুবাবার নাম শুনলে জ্বলে উঠত। সে বলত, গেঁজেল সাধু ! না খেয়ে থাকেন, না আরও কিছু ! রাতের অন্ধকারে শ্মশানে ঘোরে, আর

মরা কচি ছেলেদের কবর থেকে তুলে তাদের বুকের মাংস খায়! ছিঃ, ছিঃ!

বিধবা আহ্লাদীপিসীর বাচ-বিচারের অন্ত ছিল না। দিনে দশ বার সে কাপড় কাচত। শুচিবাই ছিল তার। হবিষ্যান্ন খেয়ে থাকত আহ্লাদী-পিসী। আমাদের দেখলেই বলত,—সরে যা, সরে যা, ছুঁয়ে দিবি! গু-গোবর মাড়িয়ে এসেছিস! নোংরা কাপড়-চোপড় তোদের। সাতজন্মে কাপড়-কাচার বালাই নেই।

আমরাও তাকে এড়িয়ে চলতাম। আহ্লাদীপিসীর আর একটা মস্ত বড় দোষ ছিল, এ-বাড়ির কথা ও-বাড়িতে আর ও-বাড়ির কথা এ-বাড়িতে লাগিয়ে ঝগড়া বাধাতে ছিল ওস্তাদ। নটবর-গিন্নীর সঙ্গে তো কুরুক্ষেত্র লেগেই থাকত।

আহ্লাদীকে দেখতে পেলে সাধুবাবা হেসে বলতেন,—বেটি শাপভ্রষ্টা হয়ে জন্মেছে। নন্দী মহারাজের অনুচরী ছিল সে! কৈলাসধামেও বাচবিচার করত। বাবা মহাদেবের ঝুলিটাকে গঙ্গাজলে চুবিয়ে শুদ্ধ ক'রে নিত। একদিন অতিষ্ঠ হয়ে বাবা মহাদেবই তাকে শাপ দিয়েছিলেন। সহজে কি আর বাবা অভিশাপ দেন? সেদিন বাবার ঝুলি ভর্তি গাঁজা নষ্ট ক'রে দিয়েছিল। তাই এ সাজা!

সাধুবাবার ভক্ত একজন বলে ওঠে,—বাবা, এঁর কি গতি হবে?

সাধুবাবা গম্ভীর হয়ে বলেন,—গতি হবে বৈকি? সেদিন নন্দীভায়া এঁর কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমিও আহ্লাদীর হয়ে অনেক বলেছি।

পরম বৈষ্ণব বৃন্দাবন দাস গাঁজায় শেষ টান মেরে ধোঁয়া ছেড়েছেন। তিনি সাধুবাবার কথা শুনে যেন চম্‌কে ওঠেন,—হরে কৃষ্ণ! হরে কৃষ্ণ! বম্ বম্ মহাদেব! আহ্লাদীর এত ভাগ্য! তারপর কি হ'ল সাধুবাবা? কি গতি হবে তাঁর?

সাধুবাবা মৃদু হাস্যে উত্তর দেন,—নন্দীভায়া শীগ্‌গির একটা ব্যবস্থা করবেন। মা উমারাণীকে বলে ক'য়ে আহ্লাদীর শাপমোচন করবেন। সবই বাবা মহাদেবের ইচ্ছে!

আহ্লাদী দূরে দাঁড়িয়ে এসব কথা শোনে। তারপর সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে,—ভণ্ড সাধুর কথা শোন! নন্দী মহারাজ যেন ওঁর ইয়ার! মরণ আর কি? মুখ খিঁচিয়ে বিড়বিড় ক'রে বকতে বকতে আহ্লাদী চলে যায়।

সেদিন থেকে আহ্লাদীর পক্ষে রাস্তায় বের হওয়া কঠিন হয়ে উঠল। ছেলেরা দূর থেকে চীৎকার ক'রে বলে,—ওই নন্দীর ভৃঙ্গী আসছে; পালা পালা! আহ্লাদী রাগে গর্‌গর্‌ করে আর গালাগাল দেয়। আহ্লাদী ক্ষেপে গেল!

একদিন তো বৃন্দাবন পাল মশাই আহ্লাদাকে একাকী রাস্তায় পেয়ে একেবারে আঁত্‌কে উঠলেন; তিনি সেইমাত্র সাধুবাবার পেসাদী-গাঁজায় দম দিয়ে ফিরছেন। আহ্লাদীকে দেখেই তিনি ভাবে গদ্গদ হয়ে বলতে লাগলেন,—"মা তুই শাপভ্রষ্টা! তুই নন্দীর অনুচরা! আমায় কৃপা কর মা।"—বলেই তিনি ভূ-লুণ্ঠিত হয়ে আহ্লাদীর পায়ে পড়লেন।

আহ্লাদী বৃন্দাবন পালের কাণ্ড দেখে, "আ মর মিন্‌সে! হতচ্ছাড়া!" বলে সটান দৌড় মারলে। পিছন থেকে জমিদারের গুরুপুত্র অনাদিকুমার বলে ওঠেন,—"বিন্দাবনদা! দেবী অন্তর্ধান করেছেন!" অনাদিও এখন সাধুবাবার ভক্ত।

পাড়ায় গুজব রটে গেল, আহ্লাদী সত্যি সত্যি শিবের অনুচর নন্দী মহারাজের অনুচরী, তার নাকি এখন ঘন ঘন ভাবাবেশ হয়। সে কারো সঙ্গে বড় কথা বলে না; গভীর রাত্রে নাকি নন্দী মহারাজ এসে তাকে কোথা নিয়ে চলে যান। তার শাপমোচনের নাকি ব্যবস্থা হয়েছে; মা গৌরী নাকি মহাদেবকে রাজী করেছেন, শীগ্‌গির আহ্লাদীর শাপমোচন হবে। আমাদের পাঠশালার কালীপণ্ডিতের পোষ্যপুত্র জগাই। বেশ ষণ্ডামার্ক সে। জগাই বলে,—হ্যাঁ, আমিও দেখেছি রাত্রের অন্ধকারে সাধুবাবার সঙ্গে আহ্লাদী বিলের ধার দিয়ে কোথায় চলে যায়। কিন্তু ওদের সঙ্গে এগিয়ে যেতে আমার সাহস হয় না।

নটবর দাস ভগিনীর গৌরবে বুক ফুলিয়ে চলে। কিন্তু নটবর-পত্নী এসব কথা শুনলে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বলে,—ওই সাধুটা যেদিন পোড়ামুখে আরও কালি লাগিয়ে দেবে, সেদিন বুঝতে পারবে তোমার বোনের কীর্তি।

কানাঘুষোয় কত জন কত কি বলে, কিছুই বুঝতে পারিনে। বাঘের ছালের উপর বসে থাকেন সাধুবাবা! চাঁটি মেরে না কি তিনি বাঘটাকে মেরেছিলেন। নাগা পাহাড়ের জঙ্গলের গুহায় নাকি তাঁর আশ্রম। সিংহ আর বাঘ নাকি সে আশ্রমে পাহারা দেয়! মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে তিনি সে আশ্রমও দেখে আসেন।

সাধুবাবার মাহাত্ম্য শুনে দলে দলে লোক আসত তাঁকে দেখতে। বাঘছালের উপর তিনি নির্বিকার ভাবে বসে থাকতেন। নিরাহারী সাধুবাবা আমাদের বিস্ময়ের বস্তু হ'লেও মনে মনে ভাবতাম নিরাহারে থাকা কি ভাল? সন্দেশ, রসগোল্লার স্বাদও তিনি বুঝতে পারেন না; বর্ষার ইলিশও খেতে পান না! এ রকম কিছু না খেয়ে সাধুগিরি করা আমার দ্বারা পোষাবে না; গাঁজার ধোঁয়ায় কি পেট ভরে? ধোঁয়ার আবার স্বাদ আছে নাকি? গন্ধে তো আমার মাথা ধরে যায়!

সবাই চায় সাধুবাবার কৃপা! ভগবানের কথা কেউ শুনতে চায় না। তিনিও কাউকে ভগবানের কথা কোন কিছুই বলেন না। গাঁজার কল্কেতে দম দিলে কি ভগবানকে পাওয়া যায়? মনের মধ্যে তোলপাড় হয়। যে কোন পুজোর সময়ও দেখি, সবাই প্রার্থনা করে আমার দুঃখ দূর করো। টাকা, চাকুরী, ছেলেমেয়ের মঙ্গল,—এই তো সবাই চায়!

সাধুবাবা একদিন বললেন,—তাঁর এখানকার কাজ ফুরিয়ে গেছে। বদরিকাশ্রম হয়ে তিনি এবার কৈলাস যাবেন। তাঁর কথা শুনে ভক্তদের অনেকেই কেঁদে ওঠে,—বাবা, আমাদের কি হবে? তিনি হেসে উত্তর দেন,—ভয় কি বাবা! জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি।

আহ্লাদী আর সাধুবাবার কাছে আসে না; রাস্তাঘাটেও তাকে আর দেখা যায় না। তার শুচিবাইও নাকি অনেকটা কমে গেছে; সে দিনের বেলায় প্রায়ই ঘুমিয়ে কাটায়। সাধুর কাছে আমরা সকাল বিকেল দু'বেলাই যেতাম। একদিন সকালবেলা সাধুবাবার কাছে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছি, এমন সময় জগাই এসে বললে,—কোথায় যাবি? সাধুবাবা অন্তর্ধান করেছেন। বোধ হয়, বদরি হ'য়ে তিনি এতক্ষণে কৈলাসে পৌছে গেছেন!

আমি বিস্মিত হয়ে বলে উঠি,—সে তো অনেক দূর। ইস্কুলে ম্যাপে দেখিস নি?

জগাই বলে,—সাধুরা হাওযায় ওড়ে রে! হাওয়ায় ওড়ে!

জগাইয়ের কথায় উত্তর দিই,—দূর! উড়বে কি ক'রে, ওঁর কি ডানা আছে?

জগাই বিজ্ঞের মত উত্তর দেয়,—তপোবল জানিস নে? বিশ্বামিত্র তপোবলে স্বর্গ তৈরী করেছিলেন দেখিস নি?

পুজোর সময় যাত্রাভিনয়ে "ত্রিশঙ্কুর স্বর্গলাভ" দেখেছিলাম। বিশ্বামিত্রের

কথা মনে পড়ে গেল! তথাপি আমাদের সাধুবাবা যে বিশ্বামিত্রের মত কিছু করতে পারেন, বিশ্বাস হচ্ছিল না। জগাইকে বললাম,—সাধুবাবা তো বিশ্বামিত্রের মত ঋষি নন।

জগাই উত্তেজিত হয়ে বলে,—তুই জানিস কি? এ ব্রাহ্মণ ঋষি। ওঁদের ক্ষমতা তুই বুঝবি কি? ক'দিন আগেই তো বলেছিলেন, তিনি চলে যাবেন।

সাধুবাবা চলে গেছেন শুনে আপসোস হ'ল। মনে মনে সাধুবাবার আস্তানা সেই বটতলার কথা ভাবতে লাগলাম। বটতলা আজ শূন্য; ধুনি হয়ত নিভে গেছে। কুণ্ডলী পাকিয়ে গাঁজার ধোঁয়া আর আকাশে উড়বে না; আমাদেরও মুঠো মুঠো চিনি খেতে কেউ দেবে না। তবুও জগাইয়ের সঙ্গে সাধুর আস্তানার দিকে গেলাম; গিয়ে দেখি সব শূন্য! ধুনিতে তখনও আগুন জ্বলছে। বৃন্দাবন পাল, নকুড় সাহা আর গোবিন্দ নাপিত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হা-হুতাশ করছে। বৃন্দাবন পাল বললেন,—বাবার কৃপা হ'ল না! গত জন্মে কত পাপ করেছি; বাবা মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন!

হঠাৎ নটবর দাস এসে উপস্থিত হ'ল। সে বললে,—বিন্দাবন খুড়ো, আহ্লাদীকে যে খুঁজে পাচ্ছিনে!

গোবিন্দ বললে,—কি বললে? আহ্লাদীকে খুঁজে পাচ্ছ না?

নটবর বললে,—না, কোথাও খুঁজে পাচ্ছিনে।

নকুড় সাহা বললে,—আমার আহ্লাদীমায়ের যে ভাবাবেশ হ'ত! সে তো ইদানীং কোথাও বের হ'ত না।

নটবর বললে,—হ্যাঁ, সকালবেলা চান ক'রে ঘরে খিল দিয়ে জপ-তপ করত।

বৃন্দাবন পাল যুক্তকর মাথায় ঠেকিয়ে বললে,—বাবা, কোন চিন্তা করো না। বাবার কৃপা হয়েছে; আহ্লাদীমায়ের শাপমোচন হয়ে গেছে। তিনি এখন কৈলাসে। তাঁকে পৌঁছে দিতেই সাধুবাবারও অন্তর্ধান ঘটেছে, বুঝতে পারছ না?

পেছন থেকে গোঁয়ার-গোবিন্দ চৈতন্য দাস বলে উঠল,—ঠিক কথা, বেটি সাধুটার সঙ্গে পালিয়েছে।

বৃন্দাবন পাল দাঁতে জিভ কেটে বলে উঠলেন,—হরে কৃষ্ণ! হরে কৃষ্ণ! এসব কথা মুখে আনতে নেই বাবা! জিভ খসে যাবে! হরেকৃষ্ণ!

জগাই আপসোস করে,—বড় সুযোগ চলে গেল ভাই, কপালে নেই কি হবে? সাধুবাবা বলেছিল ধুলো থেকে চিনি করাটা শিখিয়ে দেবে।

আমি বললাম,—দূর ওসব শিখে কি হবে? অত চিনি দিয়ে কি করবি?

জগাই বলে,—বাবা বড্ড চা ভালবাসে; চিনি কম পড়ে যায়। একপো চিনিতে চারদিন তিনবার ক'রে চা খাওয়া—সে কি পোষায়?

আমি বললাম,—আরো কিনলেই পারিস।

জগাই বিমর্ষ হয়ে উত্তর দেয়,—তুই তো বলেই খালাস। বাবা পয়সা খরচ করতে চায় না। আর পাবেই বা কোথায়? মায়েরই হয়েছে যত জ্বালা!

জগাই পোষ্যপুত্র হ'লেও পালক পিতামাতার ওপর তার বড় টান। নিজের বাপ-মা'র কথা সে কিছুই জানে না। এক দূর-দেশীয়া মহিলা বছর দেড়েকের শিশু জগাইকে তীর্থ-যাত্রার পথে ফেলে রেখে তীর্থ-যাত্রার বদলে স্বর্গে চলে গেছেন,—রাস্তায় হঠাৎ ওলাউঠায়। কালী পণ্ডিতই সেই ছেলেকে কুড়িয়ে এনে মানুষ করেছেন। জগাইয়ের আর কোন পরিচয় কেউ জানে না।

মাঝে মাঝে কালীপণ্ডিত ছেলের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। ছোটবেলা থেকেই জগাই বড অদম্য, খেলাধুলো, মারধোর, গাছে-ওঠা কিংবা লোকের বাগান থেকে পেয়ারা, কমলালেবু চুরি করে আনতে সে ওস্তাদ। প্রথম প্রথম পণ্ডিত মশাইয়ের ছেলে ব'লে কেউ কিছুই বলত না; বিশেষ ক'রে তার শিশুকালের অনাথ হওয়ার কাহিনী সবাইকে আরো আর্দ্র ক'রে তুলত।

বৃদ্ধ কালীপণ্ডিতের বয়স অনুমান করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল। পাকা-চুল বৃন্দাবন পালের মত বুড়োও নাকি কালীপণ্ডিতের পাঠশালায় পাঠ নিয়েছেন। কালীপণ্ডিতের খড়মের দাগ সে অঞ্চলের অনেকেই দেহে বহন করছেন। এহেন কালাপণ্ডিত আমার বিশেষ আতঙ্ক স্বরূপ ছিলেন। জগাইয়ের মা নাকি কালীপণ্ডিতের চতুর্থপক্ষ। কিছুতেই পণ্ডিতের আর বংশ রক্ষা হয় না! দৈবই জগাইকে পাঠিযে দিলেন। কিন্তু সে জগাইয়ের মতিগতি ঠিক পণ্ডিতপুত্রের মত হ'ল না।

কতদিন যে পণ্ডিতের খড়ম জগাইয়ের মাথা ও পিঠ জখম করেছে, তার ঠিক নেই। পণ্ডিত-গিন্নী কিন্তু তাঁর বিপরীত ছিলেন। অদম্য জগাই মার কাছেই ছিল ঠাণ্ডা সুবোধ বালক। পণ্ডিত ছিলেন বেশ কৃপণ স্বভাবের। লোককে খাওয়ানো-দাওয়ানো ভালবাসতেন না। পণ্ডিত গিন্নী লুকিয়ে নাড়ু করতেন। জগাই আবার লুকিয়ে তা আমাদের বিতরণ করত।

কালীপণ্ডিতের বিদ্যাবত্তার খ্যাতি ছিল অনেক। সেকালের গুরুট্রেনিং পাশ করা পণ্ডিত তিনি। ব্যাকরণ আর অঙ্কে নাকি তিনি মহাপণ্ডিত ছিলেন। শুভঙ্করী ও জটিল ভগ্নাংশের সমাধান তাঁর নখদর্পণে। জমিদারদের ছোটবাবু বলতেন—"বামুন পণ্ডিত মানুষ, তাই পাড়াগাঁয়ে পাঠশালায় পড়ে রয়েছেন। নিতান্ত দেশ ছেড়ে যেতে চান না, তা না হ'লে কলকাতা গেলে হিন্দু কলেজের পণ্ডিত হতে পারতেন।" জমিদারের সদ্য বি-এ পাশ এক আত্মীয় এখানে বেড়াতে আসেন, কিন্তু কালীপণ্ডিতের বিদ্যাবত্তা তাঁকেও জব্দ করেছিল।

কালীপণ্ডিত তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন,—আচ্ছা বাবা, বি-এ পাশ তো করেছ। দু'পাতা ইংরেজী ছাড়া আর কি শিখেছ? শুভঙ্করের আর্যা জান না, এ বড় দুঃখের কথা। পদে পদে ঠকবে। একমণের দাম জানা থাকলে আধপোর দাম জানতে পারবে।

বি-এ পাশ ভদ্রলোকের মুখখানি অবশ্য পণ্ডিত মশাইয়ের কথা শুনে লাল হয়ে উঠেছিল। তবুও তিনি হেসে উত্তর দিয়েছিলেন,—আধপো, কিংবা এক ছটাক জিনিস কিনতে আমাকে যেতে হবে না।

পণ্ডিত বিস্মিত হয়ে উত্তর দেন,—কি বলছ? সংসারধর্ম করতে হবে না? বাজার-হাট করবে না? চা নিশ্চয়ই খাও, চিনির তো হামেশাই দরকার। চিনি কিনতে গিয়ে আগেই দোকানীকে প্রশ্ন করবে এক মণের দাম কত? সে যদি বলে দশ টাকা অমনি শুভঙ্করকে স্মরণ করবে,—"মণের দামের বামে ইলেক্ মাত্র নিলে, আধপোয়ার দাম ভাই নিমেষেতে মিলে।" বাস্, বেটা আর তোমায় ঠকিয়ে দু'পয়সার জায়গায় তিনপয়সা নিতে পরবে না।

ছোটবাবু বলেন,—তা অবশ্য ঠিকই বলেছেন পণ্ডিত মশাই! তবে কিনা, এরা সব বি-এ, এম-এ পাশ করা বাবু, বড় বড় চাকুরী করবেন। হাট-বাজার ছেড়ে দেবেন চাকরের ওপর। দেড় টাকার চাকর বছর অন্তে দেড়শো টাকা দেশে পাঠাবে। এই তো হ'ল এদের অবস্থা। আমাদের

সোনারামকে জানেন না? শিলচরে ডিপুটী বাবুর বাড়িতে চাকুরী করে। বছরে দু'চারদিনও বাড়িতে আসতে পায় না। কিন্তু এদিকে জমিজেরাত বেড়েই চলেছে।

কালীপণ্ডিত হেসে হেসে বলেন,—কলির ধর্ম বাবা! কলির ধর্ম। তাই তো বলি, অমন যে রমণ-পাটোয়ারী সেও জমিকালি জানে না; অথচ জমির মাপজোক করে।

ছোটবাবু বলেন,—বুঝলেন কি না পণ্ডিতমশাই! যার যা কাজ। এঁরা হাকিম হবেন, বিচার করবেন; তার সঙ্গে জমি মাপজোকের কোন সম্পর্ক নেই। আধপো এক ছটাক চিনি কিনতেও এঁরা ছিদামমুদির দোকানে ঢুকবেন না।

পণ্ডিত বলেন,—ঠিক কথা! সে আমি সহস্র বার মানি। কিন্তু বাবা! ওই মণকষা, জমিকালি,—শুভঙ্করী শিখে রাখা ভাল; কোনদিন ঠকতে হয় না!

যুবকটি হেসে উত্তর দেন,—হ্যাঁ, পণ্ডিতমশাই ঠিক কথাই বলেছেন পাঠশালায় সবই শিখেছিলাম, এখন ভুলে গেছি।

—হেঃ—হেঃ! ভুলে গেছ কি রকম বাবাজী? সেই সাত বছর বয়সে শুভঙ্করীর আর্যা মুখস্থ করেছিলাম, এখনও তা ভুলি নি।—পণ্ডিতমশাই হোঃ হোঃ ক'রে হাসতে লাগলেন।

ছোটবাবু বলেন,—এঁদের কত কি পড়তে হয় পণ্ডিতমশাই! এত পড়লে কি আর ছোটবেলার লেখাপড়ার কথা মনে থাকে? কত বড় বড় বই! ওই ধরুন,—লজিক, হিস্টরী, ডাণ্ডামিক আরো কত কি?

যুবকটি বললে,—ডাণ্ডামিক নয় মামাবাবু, ডিনামিকস্।

ছোটবাবু হেসে উত্তর দেন,—তা একটা কিছু হ'লেই হ'ল বাবা! না হয়—ডিনামিকস্ই হবে। আমরা তা জানব কি ক'রে।

পণ্ডিতমশাই হুঁকোয় দম ক'ষে যেন আঁত্‌কে উঠলেন। তিনি বললেন, —লজিক, হিস্টরী, ডাণ্ডামিকস্? আমার চোদ্দপুরুষেও কোনদিন এসব শাস্ত্রের কথা শোনে নি। আচ্ছা, ব্যাকরণ পড়ায় না? ব্যাকরণ? বিদ্যাসাগর মশাইয়ের উপক্রমণিকা পড়ায় না?

যুবকটি কৌতুকের সঙ্গে উত্তর দেয়,—না, এসব পড়ায় না।

—কি বলছ? পড়ায় না? তা হলে কি শেখাচ্ছে? শুধু সাহেবীয়ানা! যত সব ম্লেচ্ছের কারবার। এসব ইংরেজী বিদ্যেয় সাহেব তৈরী হবে

বাবা! আর কিছু হবে না।—পণ্ডিতমশাই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন!

বি-এ পাশকরা ভদ্রলোকটিকে দেখবার জন্য একধারে চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছিলাম। অবাক হয়ে তাঁদের কথাবার্তা শুনছি। পণ্ডিতমশাই দেখতে পেয়ে বলেন,—দে তো বাবা, কল্কেটা পাল্‌টে।

আমাদের পণ্ডিতমশাই যে কত বড় বিদ্বান, সেদিন কিছুটা বুঝতে পারি! বি-এ পাশ ভদ্রলোক জমি-কালি, সের-কষা, মণ-কষা জানে না! ছিঃ! আবার মনে হ'ল, বাঃ, তা'হলে বি-এ পাশ করাই ভাল, মিছিমিছি এসব রেক্‌., দস্তি, কড়া, গণ্ডা মুখস্থ ক'রে লাভ কি? ছটাক আর পণে তো আমার গোলমাল লেগে যায়, বিঘা-কাঠার অঙ্ক দেখলে মণ-সের ভাবি। কি জ্বালা! এবার এসব ছেড়ে দিয়ে বি-এ পড়া যাবে।

হঠাৎ পণ্ডিতমশাইয়ের নজর পড়ল অশ্বিনী চন্দের উপর। অশ্বিনী এবার উচ্চ প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষা দেবে। চার-পাঁচ বছরে গড়ে-পিটে অর্থাৎ প্রায় খড়ম-পেটা ক'রে কালীপণ্ডিত অশ্বিনীকে তৈরী করেছেন। এখন অবশ্য খড়ম-পেটা করতে হয় না; কিন্তু চটপট উত্তর দিতে না পারলে চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করে দেন। হুঁকোয় দম দিয়ে পণ্ডিতমশাই অশ্বিনীকে হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসলেন,—বল্‌ দেখি, আর্য শব্দের ব্যুৎপত্তি কি ক'রে হ'ল?

অশ্বিনী সভয়ে উত্তর দেয়,—আজ্ঞে, ঋ ধাতু ণ্যৎ আর্য।

—ঠিক হয়েছে। কিন্তু "আজ্ঞে, আজ্ঞে" করছিস কেন? জোর করে বলবি—ঋ ধাতু ণ্যৎ আর্য! বাবা, ইতিহাস ভাল করে বুঝতে হ'লে শব্দের ব্যুৎপত্তি জানতে হবে।

ছোটবাবু বললেন, —সে আবার কি রকম পণ্ডিতমশাই?

পণ্ডিতমশাই আবার হুঁকোয় টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন! তারপর বললেন,—বাবা! ঋ-ধাতুর অর্থ চাষ করা। আর্য শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হ'ল,—যাঁরা চাষ করতেন; শুধু ধানজমি চাষ নয়, মন্ত্রেরও চাষ। অনার্য থেকে আর্যের পার্থক্য বুঝতে হ'লে এটুকু মনে রাখতে হবে। না হ'লে ইতিহাস বুঝতে পারবে না।

ছোটবাবু মাথা নেড়ে বললেন,—বুঝেছি পণ্ডিতমশায়! প্রাচীন কালের রীতি-নীতিই ছিল আলাদা। এখন সব পুঁথি-পড়া বিদ্যে! এই তো আমার কথা ধরুন,—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বোধোদয় না কথামালা কি বলে—বই পড়েছি; এখনও ভুলতে পারিনি। কি সুন্দর গল্প সব। আর এখন যত

সব গল্প বেরোয়, পড়তেই গা ঘিন্ ঘিন্ করে। ছেলেপিলের হাতে দেওয়া যায় না। ছিঃ, ছিঃ।

পণ্ডিত মশাই বললেন,—তা আর বলতে। লিখুক দেখি সীতার বনবাস, লিখুক দেখি শকুন্তলা! এখন আবার কে একজন হয়েছেন,—তিনি লিখেছেন 'দেবদাস' আবার 'চরিত্রহীন'! দু'তিন-পাতা উল্টে তো আমার চক্ষু চড়কগাছ। দেশটা উচ্ছন্নে গেল।

নব্য যুবক বললেন,—দেশ উচ্ছন্নে যায়নি পণ্ডিতমশাই। শিক্ষায়-দীক্ষায় বরং এগিয়ে চলেছে। এ যুগের লোকেরা মানুষের অবচেতন মনে চেতনা সঞ্চার করে দিচ্ছেন। অবহেলিত নিপীড়িত ও তথাকথিত নীচুদের মধ্যেও যে সত্যিকারের মানুষ রয়েছে, তা ধরে তুলছেন আমাদের সামনে।

পণ্ডিতমশাই হেসে উঠলেন,—বাবাজী, বেঁচে থাকলে আরো কত কি দেখব, আরো কত কি শুনব। আর দেখাশোনার ইচ্ছে নেই। ভাল হচ্ছে কি মন্দ হচ্ছে তা তো দেখতেই পাচ্ছ; ম্লেচ্ছামিতে দেশ ভরে উঠছে।

যুবকটি হেসে উত্তর দেয়,—আপনি রবিবাবুর লেখা পড়েন নি?

—পড়েছি বৈকি বাবাজী! ছিঃ, ছিঃ—"সে যে পাশে এসে বসেছিল, তবু জাগিনি"—ছ্যা! ছেলেদের মাথা খাচ্ছেন। তার চাইতে আমাদের সদ্ভাবশতকই ভাল!—

"এই যে বিটপী বৃক্ষ হেরি সারি সারি।
কি আশ্চর্য শোভাময় যাই বলিহারি॥"

পণ্ডিত মশাই ভাবে গদগদ হয়ে উঠলেন। জগাই এসে ডাকলে,—বাবা, শ্রীগৌরীর তারিণী মামা এসেছেন; দিদিমার নাকি শক্ত অসুখ।

কালীপণ্ডিত বিরক্তির সঙ্গে বললেন,—এবার সেরেছে! চলে যাবে মায়ের অসুখ শুনে। তা'হলে আমার রান্নাবান্না করবে কে?

কালীপণ্ডিতের পাঠশালা—মধ্য-বঙ্গ বিদ্যালয়। কলাপাতায় শরকাঠির কলমে লেখার স্তর পার হয়ে অনেকখানি এগিয়েছি। কালীপণ্ডিত বাবাকে বলেন,—ছাত্রবৃত্তিটা পাশ করুক; তারপর নর্মাল স্কুলে পাঠিয়ে দিন। আমার এখানেই চাকরী পাবে, দূরে যেতে হবে না। কিন্তু ব্যাকরণের জ্ঞান বড় কম, যাক্—সে আমি শুধ্রে নিতে পারব।

বাবা বলেন,—আপনি যা ভাল বোঝেন, তাই-ই করব। দূরে পাঠাতে আমারও ইচ্ছে নেই।

পণ্ডিতমশাইয়ের কথায় শঙ্কিত হয়ে পড়ি। এ রকম পণ্ডিতির দিকে আমার মোটেই কোন আকর্ষণ নেই। বি-এ পাশ করা সেই নব্য যুবকই তখন আমাকে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। ইংরেজী শিখতে হবে; কিন্তু কোথায় পড়ব? বাড়ির ধারে-কাছেও কোন ইংরেজী স্কুল নেই। দু'ক্রোশ দূরে সিদ্ধিনাথের কাছে কাঞ্চনগড়ে একটি মাত্র মধ্য ইংরেজী স্কুল আছে। আমার মত ছোট ছেলের পক্ষে বাড়ি থেকে সেখানে যাতায়াত করা কঠিন। সিদ্ধিনাথ আর সুবীরের মোহ অবশ্য আমার ছিল; কিন্তু কোন উপায় নেই। মা নেই, বাড়িতে আর মন বসে না। জমিদারের ছেলে শৈবাল আর পণ্ডিতের ছেলে জগাইয়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়াই। পাহাড়ের পাশে আদিবাসীদের পাড়ায় তারা দুজনে হয় নিত্য সঙ্গী; বন-বাদাড়ে পাহাড়ী ছড়ার আশে পাশে ঘুরে বেড়াই। আদিবাসীদের ছেলেমেয়েরাও আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। পাহাড়ীদের ছেলে মোহন তীর ছুঁড়ে পাখী মারে—ডাহুক, শালিক, ঘুঘু আরো কত কি। গাছ থেকে নীচে পড়ে তারা ছটফট্ করে। পাহাড়ীদের মেয়ে ভাটি ছুটে গিয়ে ডাহুকটাকে ধরে। তাদের বলি—ছিঃ, রক্ত পড়ছে, পাখীটার কষ্ট হচ্ছে; এ রকম ক'রে মেরো না। ভাটি আর মোহন খিল খিল ক'রে হাসে।

এদিকে আমার ইংরেজী পড়ার ঝোঁক বেড়ে চলল। গাঁয়ের পোষ্ট মাষ্টার আমাদের বাড়িতেই থাকতেন। তাঁর একখানি রাজভাষা বই ছিল; সে বইখানি প্রায় মুখস্থ ক'রে ফেললাম। তিনি আমাকে ইংরেজী লেখাও শেখাতে লাগলেন। পোষ্ট-মাষ্টার বাবাকে বললেন,—ইংরেজী না শিখলে বড় হতে পারবে না। আর বিদেশে নাই বা গেল, এখানে থেকে পোষ্ট-মাষ্টারিটা তো করতে পারে।

অগত্যা আমার ইংরেজী পড়ার ব্যবস্থা হ'ল। বহুদূরে কোন এক আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে ইংরেজী পড়তে হবে। বাড়ি থেকে প্রায় দু'ক্রোশ দূরে স্টেশন। এই প্রথম আমার রেলগাড়ীতে চাপা। এঁকে বেঁকে ধোঁয়া ছেড়ে গাড়ীখানি স্টেশনে এসে থামল। দূরে থেকে গাড়িখানি এগিয়ে আসছে দেখে বেশ মজা লাগলেও হুস্-হুস্, ঝাঁ-ঝাঁ শব্দ ক'রে যখন আমাদের সামনে এল আমি তো ভয়ে অস্থির। কত লোক ওঠা-নামা করল; তা দেখে

অনেকটা সাহস বাড়ল। স্টেশনের পর স্টেশন, কত মাঠ আর কত গাঁয়ের মধ্যে দিয়ে রেলের পথ চলে গেছে। যখন কোন নদীর পোলের উপর গাড়ী এসে পৌঁছয় তখন ভয় হ'লেও উঁকি-ঝুঁকি মেরে দু'পাশে তাকাই। নীচে নদীর বুকে নৌকোগুলি দেখে বেশ মজা লাগে।

নতুন জায়গায়, নতুন পরিবেশে আমার ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ হ'ল। প্রথম প্রথম ভাল লাগলেও বাড়ি থেকে এত দূরে থাকতে কিছুতেই মন চায়নি; যাঁদের বাড়িতে ছিলাম তাঁরা নিজেদের ছেলেমেয়েদের মতই ব্যবহার করতেন। তবুও সেখানে মন বসেনি! এক এক ক'রে দু'জায়গায়,—কিন্তু কোন সুবিধাই হ'ল না। তার উপর আমার শরীরও খারাপ হতে লাগল! আবার ফিরে এলাম সেই পাহাড়ের দেশে। সিদ্ধিনাথ ও সুবীরই যেন আবার আমাকে টেনে নিয়ে এল। নদীর তীরেই কাঞ্চনগড়। স্কুলের মনোরম শোভা দেখে মুগ্ধ হলাম, এ যেন সুব্রতার স্বপ্ন-ঘেরা সেই ঋষির আশ্রম। দেবদারু, বকুল আর বাহারে-গাছে ঘেরা এক উপবনের মধ্যে সুন্দর সে ইংরেজী পাঠশালা। তার উত্তর ধারে বিশাল এক দীঘি। সেখানকার ছাত্রাবাসে আমারই বয়সী অনেক কিশোর বালকের কণ্ঠস্বরে আমার আনন্দ-ধ্বনি মিশে গেল।

সেই উপবন আর নদীর তীর,—ওপারে সারি সারি পাহাড়; অদূরে সিদ্ধিনাথের চূড়া দেখা যায়। বেশ আনন্দেই দিন কাটে, কিন্তু পড়াশোনার দিকে তেমন কোন উৎসাহ পাইনে। গতানুগতিক ভাবে সবই চলে। ইংরেজী স্কুলের শিক্ষকেরাও কালীপণ্ডিতের এপিঠ-ওপিঠ। এমন সময় এক নতুন শিক্ষক এলেন; আমার জীবনে তিনি এক অদ্ভুত প্রেরণা জাগিয়ে তুললেন। সম্পূর্ণ নতুন ঠেকে তাঁর পড়ানোর ধারা; ব্যাকরণের কচ্‌কচির বাইরে,—বানান, সমাস, সন্ধি ও ব্যাখ্যার ঊর্ধ্বে আর একটা রস-জগতের সন্ধান দিলেন যুবক পণ্ডিত দিব্যনাথ। মুগ্ধ হয়ে তাঁর কথা শুনতাম, মন ছুটে চলে যেত অন্য এক অজানালোকে। তিনি যখন রবীন্দ্রনাথের "আজ আমাদের ছুটি" কবিতা পড়াতেন তখন সত্যিই আমার মন খেলা করত রৌদ্র-ছায়ার সঙ্গে।

অদ্ভুত ছিল দিব্যনাথের বাচন-ভঙ্গী; কথা বলতে বলতে তিনি আমার সামনে এক কল্পনার জগৎ সৃষ্টি ক'রে তুলতেন; আমরা তন্ময় হয়ে যেতাম। তখন বুঝতে পারিনি, কিন্তু এখন বুঝেছি দিব্যনাথ আমাদের কি উপকার

করেছেন। তিনি বলতেন,—এসব যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা অমর। বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতির নাম জান? তাঁদের কেউ কেউ হাজার বছর আগে জন্মেছিলেন—কিন্তু তাঁদের লেখার মধ্যে আজও তাঁরা অমর হয়ে আছেন। "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রের লেখক বঙ্কিমচন্দ্র; তিনি নতুন ধারা এনেছেন সাহিত্যের ক্ষেত্রে। তাঁর লেখা পড়েছ? "বন্দেমাতরম্" উচ্চারণ করতে করতে ক্ষুদিরাম ফাঁসী-কাঠে ঝুলেছেন জান কি? পড়বে, পড়বে, বড় হয়ে পড়বে—বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা আনন্দমঠ, সীতারাম, কপালকুণ্ডলা। রবীন্দ্রনাথ গানে, সুরে ভাবের তরঙ্গে দেশ-বিদেশ ভাসিয়ে দিচ্ছেন, তিনি এখনও জীবিত; তোমরা তাঁকে দেখতে পাবে।

বই খুলে রবীন্দ্রনাথের দাড়িওলা ছবির দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে ভাবি,—কি সুন্দর দুটি চোখ! চশমার কাঁচের ভেতর দিয়ে তিনি যেন আমার অন্তর পর্যন্ত দেখে নিচ্ছেন। পাতা উল্টে পাগড়ি-বাঁধা বঙ্কিমচন্দ্রের ছবির দিকে তাকাই, কি চওড়া কপাল! হ্যাঁ এঁরাই ঋষি! "বন্দেমাতরম্" ধ্বনিতে দেশ ক্ষেপে উঠেছিল তাও শুনেছি। সেই ধ্বনি শুনে আমারও মন নেচে ওঠে। একদল ডাকাত নাকি "বন্দেমাতরম্" বলে চীৎকার ক'রে ডাকাতি করে। জমিদারদের ছোটবাবু বলেছিলেন তারা আবার ইংরেজ তাড়াতে চায়। সাহেবদের উপর তারা বোমা মারে, ছোট ছেলে ক্ষুদিরাম ওই ডাকাতদের পাল্লায় পড়েই বিগড়ে গিয়েছিল। তাঁর তো ফাঁসি হয়ে গেছে। মনে পড়ে গেল, হ্যাঁ আমিও এ রকম ডাকাতদের দেখেছি। "বন্দোমাতরম্' বলে চীৎকার ক'রে তারা দিনের বেলায় আমাদের গ্রামে ঢুকেছিল। বিলেতী জিনিস ছাড়তে বলেছিল তারা। জমিদারের বাড়ির সামনে বিলেতী জিনিস তারা অনেক পুড়িয়েও দিয়েছিল। লাল-পাগড়ী পুলিস এসে তাদের তাড়িয়ে দেয়। পুলিস লাঠির ঘায়ে ষোল-সতের বছর বয়সের একটা ছেলের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল। শুনেছিলাম এক হাকিমের ছেলে ছিল সে। বড়দের কেউ কেউ আক্ষেপ করেছিলেন: কি দুর্মতি!—হাকিমের ছেলে হয়ে ডাকাতের দলে মিশেছে।

আমার মন কিন্তু তাতে সায় দিত না। না, না, এরা ডাকাত নয়। মনে হ'ত ওদের দলে ভিড়ে যাই। বাবা বলতেন,—"এরা ডাকাত নয়, দেশকে স্বাধীন করতে চায় এরা। ইংরেজরা বলে স্বদেশী ডাকাত।" স্বদেশী ডাকাত? বুকটা ফুলে ওঠে তাদের কথা মনে ক'রে। ক্ষুদিরাম আর কানাইয়ের ছবি

মানসপটে এঁকে নিই। কিন্তু ডাকাতি কেন? কটা ইংরেজ আছে এদেশে? এদের একদিনেই সাবাড় করা যায়। আহা-হা, মেরে ফেলে কি হবে? তাদেরও তো ছেলেমেয়ে আছে! সেদিন ডসন সাহেবের দু'টি ফুটফুটে ছেলেমেয়েকে দেখেছি; কি সুন্দর তারা! ওদের মেরে ফেলতে হবে? না, না, মেরে ফেলে কি হবে? ওদের দেশে ওরা চলে যাক। পুলিসগুলো তো এদেশী লোক; তারাই তো স্বদেশীদের ধরে। কেন ধরে? সাহেবদের কাজ ছেড়ে দিলেই পারে! তা'হলেই সাহেবরা এদেশ ছেড়ে চলে যাবে। মনে মনে কত কি ভাবি।

ইতিহাস আর ভূগোল পড়ান গনিরাজা। বনেদী মুসলমান ঘরের ছেলে তিনি; রোগা শ্যামবর্ণ চেহারা। দিলখোলা মন আর হাসিতে তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন। ছাত্রাবাসের ছেলেদের জড় ক'রে তিনি মাঝে মাঝে গল্পের আসর জমাতেন। তিনি বলতেন,—জানো, ইংরেজ রাজত্বে সূর্য অস্ত যায় না। বিস্মিত হযে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। তিনি বুঝিয়ে দিতেন,—সূর্যের উদয় আর অস্তের ব্যাপার। গোলাকার পৃথিবী লাটিমের মত ঘুরে ঘুরে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে; এক পিঠে যখন দিন, অপর পিঠে তখন রাত্রি। গ্লোব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তিনি লালরঙে চিত্রিত দেশগুলি দেখাতেন, আর ইংরেজের মাহাত্ম্য কীর্তন করতেন। গ্লোবের সৃষ্টিটাই আমাকে অধিক বিস্মিত করত। ভাবতাম,—ইংরাজের কত বড় মাথা! এত বড় পৃথিবীর এত বড় বড় দেশগুলোকে একটা ছোট্ট গ্লোবের মধ্যে কি করে ঢুকিয়েছে? সত্যি তাঁদের মাহাত্ম্য আছে!

ইতিহাসের গল্প জুড়ে দিয়ে গনিরাজা বলতেন,—দেশটা হিন্দুদের দোষেই বিদেশীর হাতে চলে গেল। গোড়ায় ওই জয়চাঁদই সর্বনাশ করেছে। আর রাজা যুদ্ধে গিয়ে মরে গেল, সৈন্যসামন্ত পালিয়ে গেল; ছিঃ ছিঃ, আর কি লোক নেই? ইতিহাস পড়তে পড়তে লজ্জায় মরে যাই। এ দেশের লোকের বীরত্ব আছে, কিন্তু যুদ্ধ জানে না!

সুবীর বলে ওঠে,—কেন মাষ্টার সাহেব? রাজপুতেরা কি যুদ্ধ জানত না?

মাষ্টার সাহেব উত্তর দিতেন,—হ্যাঁ, তারা যুদ্ধ জানত, তবে সকলে নয়। চিতোরের রাণারা যুদ্ধ জানত, যুদ্ধে হারলে তারা হার স্বীকার করত না। প্রতাপসিংহ তাই অমর হয়ে গেল। তারপর উমিচাঁদ আর মীরজাফর

দেশটাকে জাহান্নামে দিয়েছে ; তারাই ইংরেজকে ডেকে এনেছে। তারাই এ দেশটাকে লাল হ'তে দিয়েছে।

ইম্তাজউদ্দীন জিজ্ঞেস করে,—মাষ্টারসাহেব! এ দেশ কি কখনও স্বাধীন হবে না? ইংরেজদের কি তাড়ানো যাবে না?

হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠেন গণিরাজা। হঠাৎ বলে ওঠেন,—লালকে লাল দিয়েই মুছে দিতে হবে। লৌ চাই বাপু, লৌ চাই—তপ্ত রুধির, বুঝেছ!

ইম্তাজউদ্দিন মাষ্টারসাহেবের উত্তর বুঝতে পারলো কি না জানিনে। মাষ্টারসাহেব বলতে লাগলেন,—ইংরেজ তাড়ানো কি সোজা কাজ রে বাবা? দু'চারটে বোমা ছুঁড়ে কি ইংরেজ তাড়ানো যায়? আর কেনই বা তাদের তাড়াবে? ইংরেজদের দয়ায় আমরা সুখেই আছি। রেলগাড়ী, স্টীমার, টেলিগ্রাম—কত কি দিয়েছে ইংরেজ! আরও কত কি দেবে! চোর-ডাকাত শায়েস্তা হয়েছে ; কাজীর বিচার আর নেই। ছোট বড় সব সমান ইংরেজের আইনে।

আমি বললাম,—কেন মাষ্টারসাহেব? এসব কি আমাদের দেশের লোক পারে না?

তিনি বললেন,—পারে না রে বাবা, পারে না। দেশের কত উন্নতি হয়েছে ; আরো উন্নতি হবে। আর কি দিয়ে ইংরেজ তাড়াবে? ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার।

সুবীর বলে,—তা'হলে কোন আশাই নেই?

গণিরাজা বলেন,—দেরি আছে। আগে শিক্ষা, তারপর কাজ। লেখা-পড়া ক'রে আগে মানুষ হ' তারপর তো কাজ করবি। নিজে বুঝতে শিখবি। ছিঃ ছিঃ, ক-টা ছেলে মিছিমিছি ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিলে ; কেউ কেউ আবার জেলে পচে মরছে। পড়াশোনা সব নষ্ট হ'ল। সেই কালাপানিতে পাঠিয়েছে! কথায় বলে,—'পাঠান-মোগল তলিয়ে গেল ; রামা হবে কাজি।'

আমি বললাম,—তা'হলে কি হবে, মাষ্টারসাহেব?

গণিরাজা উত্তর দেন,—সবুর কর, রক্ত দিতে হবে ; তার সময় এখনও আসে নি। হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে লড়াই করতে হবে। সে অনেক দেরি ; মুসলমান কারো অধীন হয়ে থাকে না ; তারা খোদার বান্দা, মানুষের বান্দা নয়। সবুর কর, আগে মানুষ হ'।

দিব্যনাথ আর গণিরাজা,—দু'জন দু'দিকে টানতে লাগলেন। ইতিহাসের পাতা উল্টে রাণাপ্রতাপের ছবি দেখি। পৃথ্বীরাজের কথা মনে ক'রে আপসোস হয়। ছিঃ! ছিঃ! জয়চাঁদটা কি করলে! নিজের মেয়ে সংযুক্তার কথাও ভাবলে না। আর আমাদের হিন্দু রাজাদের কথা ভাবলে বড় কষ্ট হয়। লাখ লাখ সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ হচ্ছে, মেয়েরা ধনুকের ছিলার জন্য নিজেদের চুল কেটে দিয়েছে, হাতির ওপর থেকে রাজা পড়ে গেলেন, অমনি লাখ লাখ সৈন্য পালিয়ে গেল বন-বাদাড়ে প্রাণের ভয়ে। এদের মধ্যে কি কেউ মানুষ ছিল না?—বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌল্লা! কি নাজেহাল করলে তাকে! অসহায় নবাবের মাথা কেটে দিলে মহম্মদী বেগ। 'পলাশীর যুদ্ধ' পড়ি, আর ছন্দের তালে তালে নেচে উঠি—'ভারত গৌরব রবি গেল অস্তাচলে।'

দিব্যনাথের কথাগুলো মনে মনে আওড়াই। নতুন প্রেরণা পাই মনে, কল্পনার জগতে উড়ে যায় মন, ভুলে যাই এই পাহাড় ও বন, ভুলে যাই আমি পৃথিবীর মানুষ। হ্যাঁ, অমর হ'তে হবে! আমারও ছবি ছাপা হবে এমনি ক'রে বইয়ের পাতায়। কালিদাস, ভবভূতি, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল আর নবীনচন্দ্র মিছিল ক'রে দাঁড়ান চোখের সামনে। কত লোক বই পড়ে; এমনি ক'রে তারা আমারও ছবি দেখবে!—হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল। আমার ছবি স্কুলের ছেলেরা দেখবে; এই স্কুলেরই ছেলেরা আমার লেখা পড়বে; দিব্যনাথ পড়াবেন আমার লেখা? আমার লেখা!—আবার ভাবি দূর্, দূর্, তা কি হয়? দিব্যনাথ তখন কোথায় থাকবেন? আমিও হয়ত তখন থাকব না।

দিব্যনাথ বলেন,—তুমি এত আনমনা হয়ে কি ভাব!

তাঁর কথার উত্তর দিতে পারি না।

দিব্যনাথ বলেন,—তোমরা চলে যাবে, আরো—আরো অনেক কিছু শিখবে ও জানবে! বড় স্কুলে পড়বে, তারপর কলেজে যাবে, তারপর কলকাতায়। তোমরাও একদিন বই লিখবে।

নির্বাক বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। খানিক পরে বলি,—আমাদের লেখা কে ছাপবে? এ রকম কি আমরা লিখতে পারব?

দিব্যনাথ বলেন,—নিশ্চয়ই পারবে, কেন পারবে না? তোমরাও মানুষ। ভয় পেও না, এগিয়ে যাও। আমি বলছি তুমি পারবে। আমার কথা মনে রেখো, সেদিন হয়ত আমি বেঁচে থাকব না।

দিব্যনাথের কথা দৈববাণীর মত বারবার কানে প্রতিধ্বনিত হয়। তাঁকে বলি,—কি ক'রে লিখতে হয় পণ্ডিতমশাই? আমাদের তা শিখিয়ে দিন।

দিব্যনাথের চোখে-মুখে যেন দীপ্তি ঝরে পড়ে। তিনি বলেন,—লেখা শিখিয়ে দিতে হয় না বাবা। মনের জিনিস, হৃদয়ের আবেগ এটা। তাকে প্রকাশ করতে হয়। ফুলের কুঁড়ি আপনা থেকেই ফোটে; তাকে ফুটিয়ে দিতে হয় না। তোমার মনকে আমি প্রকাশ করব কি করে! তুমি নিজেই তা পারবে। আগে শক্তি অর্জন কর। তার জন্য চাই সাধনা, চাই লেখাপড়া।

তাঁকে সংশয়ের সুরে প্রশ্ন করি,—তাহ'লে খুব বেশী লেখাপড়া যাঁরা করেছেন, তাঁরা সকলেই এ রকম লিখতে পারেন?

আমার কথা শুনে হেসে উঠেন দিব্যনাথ। স্নেহমাখা সুরে তিনি উত্তর দেন,—না রে বোকা! হৃদয় খুলে দিতে হবে, তা'হলে দিব্যদৃষ্টি আপনা-আপনি খুলে যাবে! মানুষকে ভালবাসতে হবে; ভালবাসতে হবে আকাশ, মাটি, গাছপালা, পশুপাখীকে। ভালবাসাতেই হৃদয় খুলে যায়। যাঁদের মধ্যে ভালবাসা আছে, অপরকে যাঁরা ভালবাসতে পারেন, তাঁরাই হন অমর। জীবধর্মে যা সত্য সাহিত্যেও তা সত্য। এটাই হ'ল সাহিত্য-সৃষ্টির মূল কথা।

বাল্য ও শৈশবের সঙ্গমে দাঁড়িয়ে হেঁয়ালীর মত দিব্যনাথের কথাগুলো ভাবি। সব কথা বুঝতে পারি নে। শুধু একটু বুঝতে পারি সবাইকে ভালবাসতে হবে।

ছুটির দিনে বাড়ি গেলেও স্কুল ও ছাত্রাবাসের পরিবেশ মনকে যেন দোলা দেয়। এদিকে জগাইএর উৎসাহের অন্ত নেই; পাহাড়ীদের পাড়ায় সে আমাদের টেনে নিয়ে যায়। সুবীর অবশ্য এখন আরও নিকটেই রয়েছে; কিন্তু সে খেলাধুলো নিয়েই ব্যস্ত। সাধারণ লোকের ছেলেদের সঙ্গে সুবারের মেলামেশা তার বাবা পছন্দ করেন না। বড়রা বলেন,—পাহাড়ীদের পাড়ায় গেলে ছেলেরা নষ্ট হয়ে যায়। জগাই, শৈবাল, আর গোপেন সকাল বিকেল পাহাড়ীদের পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়। তারা লেখাপড়াও ছেড়ে দিয়েছে। সবাই বলে পাহাড়ী মেয়েরা মায়া জানে। তাই তাদের সঙ্গে ছেলেদের মিশতে তাঁরা নিষেধ করেন। কিন্তু দত্তদের ছোটবাবু তো শুনি পাহাড়ীদের পাড়ায় রাতও কাটান।

বড়দের কথা কিছুই বুঝিনে।. আমার তো ওদের খুবই ভাল লাগে। মাঝেমাঝে পাহাড়ে যাই; মোহন এসে গোছা গোছা বুনো ফুল দিয়ে যায়, ভাটি গেঁথে রাখে ফুলের মালা। আমাকে দেখলে খিলখিল ক'রে হেসে ওঠে, ভয়-ডর তাদের কিছুই নেই। শুনেছি ভাটির বাবা রাম-দা দিয়ে একটা বাঘকে জখম করেছিল। একদিন ভাটি একটি ময়নার ছানা দিয়ে বলেছিল,—নিয়ে যা, কেমন কথা বলবে।

দিব্যনাথ বলেন,—ওদের ঘৃণা করো না বাবা! ওদের মধ্যে প্রাণ আছে। ওরা এখনো সরল; মানুষকে ভালবাসতে জানে ওরা। ওরা প্রকৃতির শিশু! ওদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলে বড় জাতের ছেলেরা। চোখ খুলে ওদের দেখো। চাষাভূষা, নিরক্ষর ও নিচু জাতের ওপর দিব্যনাথের অসম্ভব শ্রদ্ধা দেখেছি। তাদের প্রতি তাঁর দরদ যেন উপছে পড়ত। সে আবেগে আমরাও ভেসে যেতাম। আদিবাসীদের ছেলে সুজন আমাদের সঙ্গে পড়ত। দিব্যনাথ তাকে দেখিয়ে বলতেন, ওরা যেদিন সকলে তোমাদের পাশে এসে বসতে পারবে, সেদিনই ভারতে জন-গণ-মন অধিনায়কের আসন প্রতিষ্ঠিত হবে। তারপর উচ্ছ্বাস ভরে আবৃত্তি করতেন—

"—ওই যে দাঁড়ায়ে নত শির
মূক সবে, ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী; স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি' চলে মন্দ গতি, যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার—
তারপরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি,
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি' কোনো মতে কষ্ট-ক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে।"

দিব্যনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে আমরা অদ্ভুত এক দীপ্তি দেখতে পাই। তাঁর চোখমুখ লাল হয়ে ওঠে, কখনো দরদর ধারা বয় চোখে

তিনি বলতে থাকেন,—জানো তারা কারা ? ওই চাবাভূষো, সরল প্রাণ আদিবাসীরা, ওই তোমাদের আশে-পাশের নিচু জাতেরা। বড় হও, তোমরা বুঝতে পারবে কারা তাদের সর্বনাশ করেছে। এদের ছোট ক'রে রেখে আমরাও ছোট হয়ে গেছি ; দিন দিন আমাদের বলও ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। কুকুর বেড়ালের মতন তাদের প্রতি আমরা ব্যবহার করেছি। আরো,—আরো লজ্জার কথা আছে, তোমাদের সে কথা এখন বলতে পারব না। তোমরাই এদের মুখে ভাষা দেবে। এরাই দেশের সর্বপ্রধান শক্তি। এদের দূরে ঠেলে দিও না ; এদের নিয়ে খেয়াল খুশী-মত খেলা করো না, এরাও মানুষ।

দিব্যনাথের প্রেরণা আমাদের কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারিনে। তিনি আমাদের নতুন দৃষ্টি দিয়েছেন,—অভিনব স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকি। হ্যাঁ, সত্যিই তো, এদের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে। জমিদার যখন খুশী তাদের ডেকে এনে কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। পূজোর সময় দেখি, বুড়ো-বুড়ী, জোয়ান-মদ্দ সবাই এসে কাজে লেগে যায়। পাইক পেয়াদা কত গালমন্দ করে ; সামান্য দোষে মারধোর করতেও দেখেছি। সোনামাঝির ছেলের জ্বর হয়েছে বলে আসতে পারেনি। তাকে ধরে নিয়ে এসেছিল জমিদারের পেয়াদা। ছোটবাবুর হুকুমে তাকে কান ধরে ওঠবোস করতে হয়েছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হেসেছিলাম আমরা। ছিঃ, ছিঃ, কি লজ্জার কথা !

দিব্যনাথের উপরও বড়দের কোপ পড়ল। দীনু চৌধুরী তাঁর নামে কুৎসা রটালেন ; তিনি নাকি ছেলেদের নষ্ট ক'রে দিচ্ছেন ; স্বদেশীতে মাতিযে দিচ্ছেন তিনি। ছোটলোকের ছেলেদের আস্কারা দিচ্ছেন দিব্যনাথ। দিব্যনাথ কিন্তু নির্বিকার।

আর একটি ছুটির দিনে বাড়ি এসেছি। জগাই এসে বল্‌লে—চল্ ভৃগু কালাদীঘির সেই পাগলা ফকিরকে দেখে আসি।

—দূর্, এসব সাধু ফকির দেখে কি হবে ?

—কি আবার হবে ? জানিস ফকির অনেক কিছু জানে।

—না ভাই, দেখছিস তো সাধুবাবাই শেষে পালিয়ে গেল।

—এ পালাবে না রে। এখানেই থাকে ; কালাদীঘির কাছেই তাঁর বাড়ি, বৌ ছেলেও আছে।

—কি বলিস, বৌ ছেলেও আছে? তা'হলে আবার কিসের ফকির?

—সংসারের মায়া কাটিয়েছে রে। জানিস না, বুদ্ধদেবেরও বৌ ছেলে ছিল!

জগাই-এর আগ্রহ দেখে বলি,—কি করবি তার কাছে গিয়ে? জগাই উত্তর দেয়—জানিস, পাগলা ফকির লাথি চড় মারলেও লোকের ভাল হয়। ফকিরের হাতে মার খেয়ে কত লোকের কঠিন কঠিন ব্যারাম ভাল হয়ে গেল। যাবি তার কাছে?

জগাইকে বলি,—আমার তো কোন রোগ হয়নি ভাই, কেন যাব?

জগাই আমার কথায় আশ্চর্য হয়ে বলে,—দূর বোকা, রোগ না হলে কি যেতে নেই? ওদের কাছে গেলে কত পুণ্য হয় রে। মানুষের অদৃষ্ট ভাল ক'রে দিতে পারে পাগলা ফকির।

ফকিরের কাছে যেতে আমার কোন উৎসাহ ছিল না। দিব্যনাথের দেওয়া নতুন আলোকে তখন অন্তর ভরে উঠেছে; এদিকে এ স্কুলের পালাও প্রায় সাঙ্গ হযে এল! নতুন পথ—বড় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন তখন দেখছি। জগাইকে বললাম,—পাগলা ফকির তো অনেক দূরে থাকে।

জগাই বললে,—কতদূর আর হবে? ওই যে গণির গাঁ দেখা যায়, তার পাশেই একটা মাঠ তারপর কালাদীঘি। সোনার কই-মাগুর ভাসে সেই জলে, আমি একদিন দেখে এসেছি।

জগাই-এর কথায় উৎসাহ পাইনে। তাকে বললাম,—শুনেছি ভাই লোকটা পাগল। পাগল-টাগল দেখলে আমার বড ভয় করে। তোর ফকির আবাব মারধোরও করে।

জগাই হেসে বললে,—মারধোর করলে তো বরাত ফিরে যাবে রে। পাগলা ফকির মাটিকে সোনা করতে পারে।

উত্তর দিই,—মাটিকে সোনা করতে পারে? সোনা দিয়ে আমি কি করব? মেযেরা তো সোনার গয়না পরে, কি দরকার আমার সোনার!

জগাই বলে,—চল্না ভাই! তুই তো দু'একমাস পরেই চলে যাবি। তখন আমাদের কথা মনে থাকবে না।

জগাই-এর কথায় মনটা নরম হ'ল। আমি চলে যাব অনেক দূরে! অনেক কিছু দেখব শিখব; জগাইরা পড়ে থাকবে এই পাড়াগাঁয়ে। তাকে বললাম,—আচ্ছা চল্।

অনেক দূর কালাদীঘি। জগাই আর দত্তদের শম্ভু আমার সঙ্গে চল্‌ল। বড় রাস্তা ধরে পূর্বদিকে প্রায় তিন মাইল হেঁটে চলেছি। আশে-পাশে ঘর-বাড়ি আর মাঝে মাঝে মাঠ। অগ্রহায়ণ মাস,—মাঠে নানা রঙের ধান; কনকশাল, কালিজিরা, হরি-নারায়ণ আর মধু-মালতী—কি সুন্দর নাম ধানগুলির! ছোট, বড়, নানা ধরনের ধান। ধানের আবার কত রঙ—লাল, কালো, হলদে। ধানের শিষ বাতাসে দুলছে। সুবাসে বাতাস ভরপুর। কাছাড়ের সেই শালীধান্যের অতুলনীয় রূপ ভোলবার নয়। ছোট ছোট ছেলেরা আবার বাঁশের চোঙা-পিঠা হাতে নিয়ে ছুটাছুটি করছে। আর মাঝে মাঝে তাতে কামড়ও দিচ্ছে। শ্রীপুর, গোবিন্দপুর আর রতনপুর পার হয়ে গণির গাঁ। গণির গাঁয়ের বড় ভূঁইঞাদের হাতীগুলো রাস্তায় বাঁধা রয়েছে। কি ছোট্ট একটা হাতীর বাচ্চা। গোছা গোছা পদ্মের ডাঁটা ছেলেরা তার মুখের কাছে ধরছে, আর শুঁড় দিয়ে সেগুলো সে কেমন সুন্দর নাচাচ্ছে। তারপর মাঠ পার হয়ে কালাদীঘির পাড়ে উঠলাম। জল টলটল্ করছে; মনে হ'ল সত্যই দীঘির জল কালো-নীল। জলের মধ্যে অনেকে খই মুড়ি ছড়িয়ে দিচ্ছে আর সোনালী রঙের মাছগুলি ভেসে উঠছে।

সারি সারি দেবকাঞ্চন আর কদমের গাছ রয়েছে দীঘির পাড়ে। উত্তর দিকের কোণে প্রকাণ্ড বড় একটা অশ্বত্থ গাছ; তারই তলায় ফকিরের আস্তানা। সেদিকে এগিয়ে যেতে মন আর চায় না। একদৃষ্টে মাছের খেলা দেখতে লাগলাম। জগাই তাড়া দেয়,—চল্ না ফকিরকে দেখে আসি।

শম্ভুরও আমারই মত অবস্থা। সেও এগিয়ে যেতে চায় না, যদি ফকির মারধোর করে! একচালা একটা ঘরে তক্তাপোশের ওপর পাগলা ফকির শুয়ে রয়েছে; কালো দৈত্যের মত তার চেহারা, চোখ দুটো ঘোর লাল। চুল-দাড়ি লম্বা লম্বা; তাকে দেখলেই কেমন ভীতির সঞ্চার হয়। একপাশের একটি বিরাট চুল্লীতে ধুনি জ্বলছে। ফকিরের চেলা কয়েকটি লোক তক্তাপোশের কাছে মেঝেতে বসে রয়েছে।

দূর থেকে আমরা ফকিরকে দেখতে লাগলাম। জোয়ান গোছের একটা লোক ফকিরের পায়ে মাথা রেখে কাঁদছে,—বাবা বাঁচাও; আমার যে জেল হয়ে যাবে।

পাগলা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে হঠাৎ লোকটির নাকে-মুখে এক লাথি বসালে। বাবাগো—বলে লোকটি উল্টে চিৎ হয়ে পড়ে গেল, তার নাক-মুখ দিয়ে

রক্ত পড়ছে দেখতে পেলাম। ভয়ে আমার সর্ব শরীর কাঠ হয়ে গেল। কৌতূহল বাড়লেও ফকিরের কাণ্ডকারখানা দেখে আমার ভীষণ ভয় ধরে গেল। জগাইকে বললাম,—চল্ ভাই, আর নয়।

সে বললে,—ভয় কি রে? যখন এসেছি দেখেই যা।

শম্ভু বললে—না ভাই আমরা কাছে যাব না।

ফকিরের একজন চেলা কল্কেতে গাঁজা সেজে তাঁর হাতে দিল। কল্কেতে জোর দম টেনে ফকির ধোঁয়া ছাড়লে। সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে যেন এক কালো ভয়াল দৈত্য বিকট ভঙ্গীতে বসে আছে। সেই দৈত্য যেন ঘোর লাল বড় বড় চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললে,—হেই বাচ্চারা এদিকে আয়। ডাক শুনে আমি ছুটে পালাতে যাচ্ছিলাম, জগাই আমার হাত ধরে ফেললে। এমন সময় ফকিরের একজন চেলা ডেকে বললে,—ভয় কি? বাবা তোমাদের ডাকছেন; এদিকে এসো।

নিরুপায় হয়ে ফকিরের নিকট যেতে হ'ল। জগাই এগিয়ে গিয়ে ফকিরের পায়ের ধুলো নিল। আমরাও তার দেখাদেখি ফকিরকে প্রণাম করলাম। পায়ে হাত দিতে ভয় করতে লাগল, লাথি মারে যদি! কিন্তু ফকির মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন,—যাও বেটা, লেখাপড়া করগে, এখানে কেন? আমার কাছে ভাল মানুষ কেউ আসে না। যত সব কুত্তার বাচ্চা এখানে আসে। তোমরা কি করতে এসেছ?

জগাই বললে,—না বাবা আমরা শুধু আপনাকে দেখতে এসেছি।

ফকিরের মুখে অট্টহাসি—হাঃ-হাঃ-হাঃ! বড়লোক হবে? সাধু হবে? সোনা-দানা হাতী-ঘোড়া পাবে? হাঃ হাঃ হাঃ।

সেই বিকট হাসি আর কথাগুলোর ভয়ঙ্কর আওয়াজ আমি এখনও ভুলি নি। রূপকথার দৈত্য যেন আমার সামনে দাঁড়িয়েছিল। হাসি থামিয়ে ফকির আবার গাঁজার কল্কেতে দম দিলেন। আবার সেই ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। কালো একখানি কম্বল ফকিরের কোমরে জড়ানো। তাঁর মুখের দিকে তাকাতে ভয় হয়। জগাইকে ইসারা করলাম। জগাই বললে.—বাবা, আপনার দয়া যেন থাকে আমাদের ওপর।

ফকির বললে—দয়া? আমার দয়া কিরে বেটা? দুনিয়া আর আকাশ জুড়ে যে রয়েছে তার দয়া আছে তোদের ওপর। যা, যা, চলে যা।

হঠাৎ ফকির একমুঠো ছাই হাতে নিয়ে আমাদের ছুঁড়ে মারলে। আমরা ভয়ে ভয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলাম।

মনে মনে ভাবি,—গাঁজা খাওয়াই দেখছি ফকির কিংবা সাধু হওয়ার একটা প্রধান লক্ষণ। বাব্বা! গাঁজা খেতে হবে। কি বিশ্রী গন্ধ! নাড়ী-ভুঁড়ি উঠে আসে। জগাইকে বলি,—সব সাধুই দেখছি গাঁজা খায়। তা'হলে পরমহংসদেব ও বিবেকানন্দও কি গাঁজা খেতেন?

জগাই বলে ওঠে—তা জানিনে বাবা! বাবা মহাদেব নিজেই গাঁজা সিদ্ধি খেয়ে থাকেন তাতো জানিস। বড় সাংঘাতিক জিনিস এই গাঁজা। গাঁজা হজম করতে পারলেই সিদ্ধিলাভ।

শম্ভু বললে—গাঁজার ওই নীল ধোঁয়া হজম করেছেন বলেই মহাদেবের নাম বোধ হয় নীলকণ্ঠ হয়েছে।

জগাই উত্তর দেয়—নিশ্চয়ই।

শম্ভু আবার বলে—তা'হলে ফকিরের চেলারাও সিদ্ধিলাভ করবে?

জগাই উত্তর দেয়—সিদ্ধিলাভ কি সহজ জিনিস বাবা? এখন অভ্যেস করছে; ফকির সাহেবের দয়া হলেই হবে।

শম্ভু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উত্তর দেয়—যা যা, গাঁজা খেলে যদি সিদ্ধিলাভ হ'ত তা'হলে আমাদের নবীন তেলিও সাধু। তার বাবা তো মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মরেছে?

জগাই বলে—গুরু চাইরে, গুরু চাই। তাইতো গুরু খুঁজে বেড়াচ্ছি।

আমি বললাম—না ভাই, আমি ওসব চাইনে। এরা মিছিমিছি গাঁজা খায়। কই, বুদ্ধদেব তো গাঁজা খেতেন না। বিবেকানন্দ গাঁজা খেয়েছেন বলে তো জানি না।

জগাই উত্তর দেয়—নিশ্চয়ই তাঁরা গাঁজা খেতেন। তা না হ'লে সিদ্ধিলাভ হ'ত না।

শম্ভু বলে ওঠে—কি ক'রে তুই জানলি বল?

আমি বললাম—ঠিক কথা? সেদিন তো 'প্রহ্লাদ চরিত্র' যাত্রা দেখলাম। তাতে তো প্রহ্লাদের হাতে গাঁজার কল্কে দেখতে পাইনি। শিবের হাতে গাঁজার কল্কে থাকে বটে কিন্তু বিবেকানন্দের কত ছবি দেখেছি তাঁর হাতে গাঁজার কল্কে নেই।

আমার কথা শুনে জগাই বিজ্ঞের মত হেসে উঠল। তারপর সে বললে,—তোরা বড় বোকা! ছোট ছেলে প্রহ্লাদ। তার হাতে গাঁজার কল্কে দেবে

কেন? আর প্রহ্লাদ তো সাধনা করে নি, আপনা-আপনি ভগবান তাঁকে ধরা দিয়েছেন! আর বিবেকানন্দের কথা। ছবি দেখে কিছুই বোঝা যায় না। তিনি অমেরিকায় সাহেবদের কাছে বক্তৃতা করতে গিয়েছিলেন। হুঁকো কল্কে তো সাহেবরা দেখতে পারেনা সেইজন্যই তাঁর ছবিতে কল্কে লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

শম্ভু হঠাৎ বলে উঠল—আচ্ছা জগাই, তুই কোনদিন গাঁজা খেয়েছিস্?

জগাই উত্তর দিলে—হ্যাঁ ভাই, একবার গাঁজার কল্কেতে দম দিয়েছিলাম। ভাগ্যে সাধুবাবা সঙ্গে ছিলেন; ধোঁয়াটা মুখে গিয়েছে কি না গিয়েছে, মাথাটা বোঁ বোঁ ক'রে ঘুরতে লাগল। আকাশ আর মাটি এক হয়ে গেল। তারপর চোখ খুলে দেখি চোখের সামনে হলদে হলদে কল্কে ছুটোছুটি করছে। সাধুবাবা মাথায় জলপড়া দিয়ে আরাম ক'রে দিলে—না হ'লে গিয়েছিলাম আর কি।

পথ চলতে চলতে জগাই ফকিরসাহেবের মাহাত্ম্য কীর্তন করতে লাগল; ফকিরসাহেবের অসাধ্য কাজ কিছুই নেই। তাঁর ইঙ্গিতে জেলের দরজা খুলে যায়! সুলেমান ডাকাত কতবার জেল থেকে পালিয়ে এসেছে ফকিরের দয়ায়। ফকিরের দয়াতেই সিঁদেল চোর রতন ধরা পড়ে না! কি অদ্ভুত তাঁর ক্ষমতা!

এসব শুনে ফকিরের উপর থেকে আমার ভক্তি উড়ে গেল। চোর-ডাকাতদের প্রশ্রয় দেন ফকিরসাহেব? ছিঃ, ছিঃ। জগাই বললে,—জানিস, কারা যায় ফকিরসাহেবের কাছে? শহর থেকে কত সব বড়লোক আসে। লাখপতি মন্টি দত্ত এই ফকিরেরই শিষ্য। ফকিরসাহেবের দয়ায় যুদ্ধে চালানী কারবার ক'রে সে বড়লোক হয়েছে।

জগাইয়ের কথায় মনে মনে দেবতা আর সাধুদের কথা ভাবি। দেবতা আর সাধুদের এইরকমই কাণ্ড! অত বড় দুর্বাসা মুনি সামান্য ছুতো-নাতায় অম্বরীষ রাজার মত মানুষকে কি না নাজেহাল করেছে। আর দেবতাদের রাজা ইন্দ্র! কি সব জঘন্য কাণ্ড! হিংসার অবতার যেন! চুরি, বাটপাড়ি, কিছুই তাঁর আটকায় না! যাত্রাগানে দেখা অম্বরীষের ব্রহ্মশাপ, সুরথ-উদ্ধার ও পৃথুরাজার শতাশ্বমেধ যজ্ঞের দৃশ্যগুলি মনে পড়ে যায়। ছিঃ, ছিঃ! এরা আবার দেবতা! এরা আবার ঋষি, ফকির—সাধু? হ্যাঁ, ওদের মধ্যে নারায়ণ কিন্তু বেশ ভাল, কৃষ্ণঠাকুর মন্দ নয়। মুনিদের মধ্যে বশিষ্ঠকেই বেশ ভাল লাগে। হ্যাঁ, বুঝি, ঠাকুর-দেবতারা যদি এমন কিছু দেন, যাতে

ক'রে বইতে হাত দিলেই তা মুখস্থ হয়ে যায়, কলম চালালেই অঙ্কগুলি আপনা-আপনি ঠিক ঠিক হয়ে যায়। তা'হলেই—বুঝব, তাদের মাহাত্ম্য আছে। যত সব চোর ডাকাতদের বাঁচাতে পারেন, আর এসব ভাল কাজ পারেন না? এরকম সাধুদের দিয়ে আমার দরকার নেই।

পাহাড়ের ধারে বাস করে কত ধরণের লোক; কত জাত আছে তাদের মধ্যে। বুঝতে পারি তাদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ অনেক। ভদ্রপল্লীর লোকেরা তাদের বড় নিচু মনে করে; তাদের নাকি আচার-বিচার নেই; ধর্মও নেই! ওদের ছুঁলে নাকি নাইতে হয়। কালীপণ্ডিত বলতেন, ওরা আদিম যুগের লোক; ওরাই বাবা, সেই আদিবাসী। আর্য ও অনার্যের গল্প জুড়ে দিতেন তিনি। অথচ এই লোকগুলিই আমাদের সকল কাজ করে,—চাষবাস, মজুরি। ওদের না হ'লে আমাদের চলেই না দেখতে পাই। ভিখন, লখন, ককাই, সুনিয়া—আমাদেরই গোরুর রাখালী করে। হাটে-বাজারে তরি তরকারী ও মাছ সবই বিক্রী করে তারা। ভদ্রলোকদের নাকি এসব কাজ করতে নেই!

ঐ আদিবাসীদের নিয়েই নয়ানচাঁদ চক্রবর্তীর কারবার। ভদ্রপল্লীতে নয়ানচাঁদ ছিলেন একরকম ব্যতিক্রম! তিনি বলেন,—ওদের ধর্ম নেই কে বললে? ধর্ম আছে। করিয়ে নেবার লোক নেই। তাই খ্রীষ্টান পাদ্রীরা সাতসমুদ্দুর পার হয়ে এসে ওদের ধর্ম দিচ্ছে। আর আমরা চুপ ক'রে আছি। ওদের ধর্ম জাগিয়ে দিতে হবে বাবা!

নয়ানচাঁদকে ডাকি পিসেমশাই বলে। পাহাড়ীদের পাড়া থেকে প্রায়ই তিনি নারকেল, শশা, কলা—আরো কত ফলমূল নিয়ে আসেন। একা মানুষ, এসব জিনিষ-পত্র বেশীর ভাগই বিলিয়ে দেন। হাঁস, পাঁঠা ও পায়রাও কখন কখন আসে; তারও ভাগ দেন সকলকে। আমাদের বাড়ির পাশেই একটা ঘরে থাকেন তিনি। দেশ তাঁর বহু দূরে অজানা এক গাঁয়ে। মাঝে মাঝে এখানে এসে বাস করেন; তাঁর সঙ্গে আরো দু'চারজন আসে। নিজেরাই তাঁরা রান্না ক'রে খান। নয়ানচাঁদ পিসেমশাইকে আমার বড় ভাল লাগত। অনেক সময় তাঁর ঘরে বসে থাকতাম। অনেক গল্প জানতেন তিনি। পুরাণের কত কাহিনী বলতেন; ধ্রুব ও প্রহ্লাদের গল্প, নল রাজার উপাখ্যান—আরো কত কি?

নয়ানচাঁদ একদিন আমাকে বললেন,—যাবি খোকা, পুজো দেখতে? সেদিন বলেছিলি শনিপুজো দেখবি?

বড় কৌতূহল ছিল; তৎক্ষণাৎ পিসেমশাইয়ের কথায় রাজি হলাম। তিনি বাবাকে বলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে চললেন।

জঙ্গলের মধ্যে শনিপুজো। নদীর ধারে নলখাগড়া বনের মাঝখানে ছোট্ট একখানি কুঁড়ে ঘর তৈরী হয়েছে। সেই আদিবাসীদের পাড়ায় পুজো হবে। ঘরের মধ্যে মাটির মূর্তি,—একদিকে করালী কালী, অপর দিকে শনির মূর্তি। শনির বাহন শকুনি। শকুনিকে দেবতার বাহনরূপে এই আমার প্রথম দেখা; শকুনি দেখলেই একটা বিভীষিকার ছায়া আমার মনের ওপর পড়ত, গা-ও ঘিন্ ঘিন্ ক'রে উঠত। সেই শকুনিও আজ পুজো পাবে? মনে মনে হাসলাম।

যাদুমণি সর্দার পুজোর আয়োজন করেছে; ষোড়শ উপচারে পুজো—নানা দ্রব্যসামগ্রী স্তূপাকারে সাজিয়েছে। লখন, ভিখন, ককাই ও মুনিয়ারাও দাঁড়িয়েছে এক ধারে। ভাটি, মোহন, লাবিয়া ও সোনামুখীও এসেছে—যত সব পাহাড়ীদের ছেলেমেয়ে! ওদের বুড়ো কিংবা জোয়ান পুরুষদের মাথায় আবার চুলের খোঁপা বাঁধাও রয়েছে।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে; পুজোয় বসেছেন নয়ানচাঁদ। কাঁসর-ঘণ্টা বাজছে; কি যেন একটা থমথমে গম্ভীর ভাব সেখানে সবাইকে নিশ্চুপ করে দিয়েছে। অন্ধকার আর জঙ্গলে মনে ভীতির সঞ্চার করলেও যখন এতগুলি লোকের মুখের দিকে তাকাই, তখন অনেকটা সাহস বাড়ে। ভাটি ইসারা ক'রে কি যেন বলতে চায়; মোহন মুচকি মুচকি হাসে। আশে-পাশে পলাশের বন, তার উপর জ্যোৎস্নার রেখা পড়ছে। লাল ফুলগুলি চিক্‌মিক্ ক'রে ওঠে, লক্‌লক্ করছে কালীর জিহ্বা! ভয়ও লাগে। শিয়াল ডেকে উঠল খুব কাছে; ক্রীং-ক্রীং-ঝিঁ-ঝিঁ—আওয়াজ হয় বনে। বুনো শূওরের ঘোঁৎ-ঘোঁতানিও শোনা যায়। আমি ইসারায় ভাটি আর মোহনকে ডাকি; কিন্তু তারা আমার কাছে ঘেঁষে না। ভাটি চুপি চুপি কি বলে সরে গেল,—আমি নাকি এখন বেরাম্মন—ঠাকুর! আমায় এখন ছুঁতে নেই। তবু তারা এসে চুপি চুপি পিছনে দাঁড়ায়; মোহন বলে,—দেখবি রাতের শোভা?

আমিও চুপি চুপি বলি—না, ভয় করে।

ভাটি হেসে ফেলে আমার কথা শুনে। তার সই লাবিয়া আঙুল দেখিয়ে ভাটিকে কি যেন ইসারা করে। ভাটি ক্ষেপে যায়, তাঁর চোখ-মুখ লাল হয়ে

ওঠে। লাবিয়ার কাছে গিয়ে তাকে চিমটি কাটে। তারা কানে বনফুলের ফুল পরেছে; খোঁপায় তাদের থোকা থোকা নাগেশ্বর ফুল। ছোট মেয়েদের খালি গা। কোমরে জড়ানো লাল, নীল, হলদে রঙের কাপড়—হাঁটু পর্যন্ত। মনে হ'ল মহাভারতের ছবি দেখছি; এরা সব গন্ধর্বকন্যা!

শনিপূজো শেষ হলে কালীপূজো আরম্ভ হ'ল। নয়ানচাঁদ দুর্বোধ্য ভাষায় কত মন্ত্র আওড়াতে লাগলেন। হাতজোড় ক'রে হাঁটু গেড়ে বসেছে যত সব বুড়ো আর বুড়ী। নয়ানচাঁদ মাঝে মাঝে জল আর ফুল ছুঁড়ে দিচ্ছেন দেবীমূর্তির দিকে। স্তূপাকার সব ফল-মূল, কাপড় গামছা, বাসন-কোসন অনেক! শনির কাছে কালো পতাকা পত্‌পত্‌ ক'রে উড়ছে। এই সেই শনি,—যাঁর দৃষ্টিতে মা-দুর্গার ছেলের মাথা উড়ে গিয়েছিল; শ্রীবৎস রাজাকে ভিখারীরও অধম হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল! আহা, সে সময় যদি নয়ানচাঁদ পিসেমশাই থাকতেন! তা'হলে রাজা ও রাণীর এমন দুর্গতি হ'ত না। পিসেমশাই শনির পূজো ক'রে তার দোষ কাটিয়ে দিতেন।

বলির আয়োজন হয়েছে। নয়টা পাঁঠা উৎসর্গ হ'ল, খাঁড়ার ঘায়ে উড়ে গেল তাদের মুণ্ড। বুড়ো কান্ত সর্দারের গায়ে এত বল? রক্তে ভেসে গেল কুঁড়ে ঘরের সামনের ছোট প্রাঙ্গণটা। এবার নয়ানচাঁদ বললেন,—হোম হবে। হোমের আগুন জ্বলে উঠল; ঘি-মাখা বেলপাতা এক এক ক'রে পড়ল আগুনে। এসব অনুষ্ঠান শেষ ক'রে তিনি বললেন,—শিবাবলির জায়গা হয়েছে তো?

যাদুমণির ছেলে হিজলমণি জবাব দেয়,—হ্যাঁ বাবা! হয়েছে।

নয়ানচাঁদ বললেন,—কোথায়, চল।

লণ্ঠন আর মশাল নিয়ে কয়েকজন এগিয়ে চলল; নয়ানচাঁদ পূজোর উপকরণ আর নৈবেদ্যর থালা নিয়ে তাদের অনুসরণ করলেন। নিকটেই শেওড়াগাছের তলায় পরিষ্কার ক'রে শিবাবলির জায়গা করা হয়েছে। ঠাকুরমশাই নৈবেদ্যের থালা নামিয়ে রেখে তিনবার হাততালি দিয়ে ডাকলেন, —"ভোঃ, ভোঃ, শিবা! আগচ্ছন্তু!"

আশ্চর্য কাণ্ড! দু'তিনটে শিয়াল জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে নৈবেদ্যের থালায় মুখ দিলে; থালা নিমেষের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেল। এসব দেখে বিস্মিত হয়ে গেলাম। পাহাড়ীরা সাষ্টাঙ্গে নয়ানচাঁদকে প্রণাম করে; আমাকেও প্রণাম করে তারা। ভাটি আর মোহন প্রণাম করতে এসে

হেসে ফেলল। ভাটি একেবারে আমার পায়ের ওপর মাথা রেখে প্রণাম করল। পূজো শেষ হয়ে গেল।

ফল-মূল ও সন্দেশ নিয়ে তারা আমাদের খাবার জন্য কত অনুনয় করলে। নয়ানচাঁদ বললেন,—না বাবা, পরের ছেলেকে নিয়ে এসেছি; অনেক রাত হয়ে গেছে। এখানে নয়, বাড়ি গিয়ে খাবে। তবু তারা জোর ক'রে আমাকে কিছু খেতে দিলে। আমি জানতাম, ওদের ছোঁওয়া ফলমূল ছাড়া কিছুই খাবার উপায় নেই, জলও নয়। নয়ানচাঁদ ওদের ছোঁওয়া জল খান, কিন্তু আমার পক্ষে তাও নিষেধ।

নয়ানচাঁদ এদের গুরু আর পুরুত। তাদের অনেকে পাদ্রীদের প্রলোভনে পড়ে খ্রীষ্টান হয়েছে; আর নয়ানচাঁদেরা তাদের বাড়িতে শনি আর কালীর আসন প্রতিষ্ঠা করছেন। সেইজন্য নয়ানচাঁদেরা সমাজে পতিত—তারা একঘরে। এখনও নয়ানচাঁদ শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের কথা মনে পড়ে। আর প্রকৃতির সরল শিশু পাহাড়ীদের প্রাণখোলা হাসি এখনও ভুলতে পারিনি।

নয়ানচাঁদের সদাহাসি মুখ; রেখে-ঢেকে তিনি কথা বলতেন না। পাহাড়ীরা তাঁকে দেবতার মত ভক্তি করত। পাহাড়ী-পাড়ায় পূজা-অর্চনা ক'রে যা পেতেন তাতেই তাঁর সংসার চলত।

মাঝে মাঝে তিনি নিজের দেশে উধাও হতেন। নয়ানচাঁদ দেশে গেলে আসতেন তাঁর ভাগনে গোবিন্দ চক্রবর্তী। গোবিন্দ চক্রবর্তী একটু কড়া মেজাজের লোক ছিলেন; তিনি পাদ্রীদের বক্তৃতা শুনে ক্ষেপে গিয়ে নাকি যীশুখ্রীষ্টকে যা-তা বলেছিলেন। সেইজন্য পাদ্রীরা গোবিন্দ চক্রবর্তীকে খুব বিপদে ফেলবার চেষ্টা করে। দলে দলে পাহাড়ীরা নয়ানচাঁদের শিষ্য হচ্ছে, এটা পাদ্রীদের সহ্য হয় নি।

একদিন দারোগা আর পুলিস এসে গোবিন্দ চক্রবর্তীর ঘর ঘেরাও করলে। গোবিন্দ চক্রবর্তী নাকি গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা-সভায় উপদ্রব করেছেন; তিনি নাকি আদিবাসীদের কোন এক মেয়েকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন! আরো কত অভিযোগ করেছে পাদ্রীরা।

এসব কথা শুনে গাঁয়ের লোকে ভয় পেয়ে গেল। এখন ইংরেজদের রাজত্ব,—তারাই এখন হর্তাকর্তা বিধাতা। আর এই পাদ্রীরাই হচ্ছে তাদের পুরুত। তারা যখন নালিশ করেছে, তখন কি আর রক্ষে আছে?

গোঁয়ার গোবিন্দ চক্রবর্তীর এবার নির্ঘাত ফাঁসি, না হয় জেল। কিন্তু চাকা ঘুরে গেল; স্বদেশী-ঠেঙানো জবরদস্ত দারোগা চন্দ্র বাবু এলেন তদন্তে। তিনি আবার নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ; খ্রীষ্টানদের তিনি দু'চোখে দেখতে পারেন না। তিনি এসে জিজ্ঞেস করলেন,—"গোবিন্দ বাবাজী, খবর কি? বেশ করেছ বাবা! যত পারো ঐ আদিবাসীদের হিন্দু ক'রে নাও। দেখি আমি কি করতে পারি।"

পুলিসসাহেবও নাকি চন্দ্র দারোগাকে খুব খাতির করেন। চন্দ্র দারোগার রিপোর্টে গোবিন্দ চক্রবর্তী বেঁচে গেলেন। তার উপর পাহাড়ীরাও পাদ্রীদের ওপর ক্ষেপে গেল; যারা গির্জায় যেত, তাদের অনেকেই ফিরে এসে শনি ও কালীর শরণ নিল।

গ্রামের প্রধানেরা কিন্তু এসব পছন্দ করতেন না। পাহাড়ীদের কোন জাত আছে বলেই তাঁরা মানতেন না। সুতরাং গোবিন্দ চক্রবর্তী ও নয়ানচাঁদ অজাতদের যজন-যাজনের অপরাধে অপরাধী হলেন।

মনে পড়ে, একদিন পালেদের প্রবীর একটা বড় পেঁয়াজ নিয়ে এসেছিল; এবং সেই পেঁয়াজ নিয়ে আমরা দুজনে বলের মত লোফালুফি করছিলাম। এমন সময় দত্তদের পুরুত সনাতন ভট্টাচার্য আমার হাতে পেঁয়াজ দেখে শশব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। আমি যেন মহা অপরাধ ক'রে ফেলেছি। তিনি গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—ওহে ছোক্‌রা, তুমি আচার্যিদের ছেলে না? পেলে কোথায় এটা?

আমি সংকোচের সঙ্গে উত্তর দিলাম,—কেন! প্রবীর নিয়ে এসেছে।

আমি জানতাম, পেঁয়াজ আমাদের ছুঁতে নেই; বাড়িতে পেঁয়াজ ঢোকবারও উপায় ছিল না; সমাজের বিধানে পেঁয়াজ সেখানে অখাদ্য। সনাতন ভট্টাচার্য আমার কথা শুনে মুখ খিঁচিয়ে বললেন,—হুঁ বুঝেছি! যাও, এক্ষুনি চান ক'রে এসোগে।

তারপর তিনি জমিদার-বাড়ির দিকে চলে গেলেন। একটু পরেই পাড়ার পিসী নন্দঠাকরুণ এসে আমাদের বাড়িতে পেঁয়াজ আছে কিনা তন্ন তন্ন ক'রে দেখেছিলেন। নন্দঠাকরুণ আমার কাকীমাকে শাসিয়ে গেলেন,—বামুনবাড়ীতে পেঁয়াজ! ছেলেরা এসব অখাদ্য জিনিস নিয়ে খেলা করে, দেখতে পাও না? ছেলেটার মা নেই বলে কি জাতজন্মও হারাবে?

জাতের বিচার আর ভক্ষ্যাভক্ষ্য সম্বন্ধে যে সাংঘাতিক কড়াকড়ি মেনে চলতে হ'ত, তা ভাবলে আজ হাসি পায়। ভাত খাওয়ার পর আঁচিয়ে পান খেয়ে মুখ-শুদ্ধি না ক'রে দত্তদের ছেলে শম্ভুকে ছুঁয়েছিলাম বলে আমাকে একদিন উপবাস ক'রে থাকতে হয়েছিল।

নয়ানচাঁদ বলতেন,—বাবা, এসব বাচ-বিচার আমি মানিনে। সদাচারী হবে, পরিষ্কার-পরিছন্ন থাকবে; শাস্ত্রে তাই বলেছে। ওসব ছোঁওয়া-ছুঁয়ির ব্যাপার সব বাজে ধোঁকা!

তাঁর কথা শুনে বলতাম,—আচ্ছা পিসেমশাই, তা'হলে কি ওই পাহাড়ীদের হাতে খেলে জাত যায় না?

তিনি হেসে জবাব দিতেন,—না বাবা, যায় না। মোদ্দা কথাটা হচ্ছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা। ওরা নোংরা থাকে, তাই ওদের হাতে খেতে ইচ্ছে হয় না। বামুনের ছেলেও নোংরা থাকলে তার হাতে খেতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।

আমি বললাম,—ওরা যে অজাত; ওদের জাত নেই, ধর্ম নেই। ওদের হাতে খেলে জাত যায়। জাত গেলে যে পাপ হয়।

নয়ানচাঁদ হেসে উত্তর দিতেন,—কে বললে ওদের জাত নেই? তোমার আমার যদি জাত থাকে, ওদেরও জাত আছে। সকলেই ভগবানের সৃষ্টি বাবা! কাউকে ঘৃণা করতে নেই। আর প্রাণে না বাঁচলে, জাতে কি করবে? ছয় সাতটি ছেলেমেয়ের পেট ভরাতে হবে তো? তোমার সমাজ কি আমায় খেতে দেবে?

আমি বলতাম,—কিন্তু জাত গেলে যে পাপ হবে।

নয়ানচাঁদ বলতেন,—পাপ? এখন বুঝবি না বাবা! কাকে পাপ বলে বোঝা বড় শক্ত। যাতে লোকের অনিষ্ট হয়, তার নামই পাপ। আমি তো কারো অনিষ্ট করিনি, আমার পাপ হ'তে যাবে কেন? যে কাজ করলে নিজের কিংবা অপর কারো অনিষ্ট হয়, তার নামই পাপ। রাতদিন শুচিবাই নিয়ে থাকলে পুণ্যি হয় না।

নয়ানচাঁদের পাপপুণ্যের ব্যাখ্যা শুনে বিস্মিত হতাম। বারবার মনে হ'ত—এরাও মানুষ; মানুষকে ছুঁলে মানুষের জাত যায়? কই, স্কুলে তো সবাই একসঙ্গে বসি; তাতে জাত যায় না? জুতো পায়ে দিতে পারে না ওরা! ওরা জুতো পায়ে দিলে উঁচু জাতের কি জাত যায়? সেবা-

রাম দাস পাঠশালার পণ্ডিত ; অথচ জুতো পায়ে দিয়ে চলতে পারেন না। ওদের পাড়ার অনেক ছেলে শহরের বড় স্কুলে পড়ে ; অথচ আমাদের পাড়ায় এরা এলে উঁচু আসনে বসতে পায় না! জাতের বিচার আর পাপপুণ্যের মাপকাঠি ধরতে পারিনে। সেবারাম পণ্ডিতের ছেলে নবনী আমায় কত ভালবাসে ; একই সঙ্গে আমরা পড়ি। রাস্তায় হুঁচোট খেয়ে পড়ে গিয়ে আমার পা ভেঙে গিয়েছিল ; নবনী আমায় পিঠে ক'রে বাড়ি পোঁছে দিয়েছিল। দত্তদের বড় ছেলে কুমুদ তো আমায় রাস্তায় ফেলে রেখেই চলে গিয়েছিল। ছোটবাবুকে তো দেখি যাদের জাত নেই, তাদের পাড়াতেই রাতদিন ঘুরে বেড়ান ; ওদের আধবয়সী দু'একটি মেয়ে তাঁর হাতধরে টানাটানি করে ; রসিকতা করতেও দেখেছি! তখন তো তাঁর জাত যায় না? নয়ানচাঁদ পিসেমশাই আর পণ্ডিত দিব্যনাথের কথার মধ্যে যেন যোগসূত্র খুঁজে পাই।

সন্ধ্যার সময় প্রতিদিন নয়ানচাঁদ বটতলার মহাভারত খুলে ঘরের বারান্দায় বসতেন। তাঁর আবৃত্তি শুনে মুগ্ধ হতাম ; নয়ান মালী, সুজন বুড়ো আর আমাদের চাকর দেবীদাস ছিল তাঁর নিত্য শ্রোতা। দেবীদাস তামাক সেজে দিত ; ফাঁকে ফাঁকে পিসেমশাই তামাক খেতেন। অভিমন্যুকে সপ্তরথী বেষ্টন করেছে, মরীয়া হয়ে অভিমন্যু লড়াই করছে ; অভিমন্যুর বিপদ দেখে বিচলিত হয়ে উঠতাম।

অভিমন্যু পড়ি গেলা ভূমির উপরে।
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি ডাকি উচ্চস্বরে॥
অর্জুনের রথে কৃষ্ণ চমকি উঠিলা।
অভিমন্যু মুখ স্মরি পার্থ মূর্ছা গেলা॥
খেলাঘরে উত্তরার পুতুল ভাঙ্গিল।
অঞ্চলে সিন্দুর-বিন্দু ভুলিয়া মুছিল॥
পাণ্ডব-শিবিরে উঠে হাহাকার ধ্বনি।
কি কব অন্যের কথা কাঁদিল শকুনি॥

নয়ানচাঁদ-পিসেমশাই বলতেন,—বাবা, আর যাই কর, রামায়ণ মহাভারত ভুলো না। আমাদের যা কিছু ধর্ম, যা কিছু কর্ম, সবই এই রামায়ণ মহাভারতে আছে।

তাঁর কাছ থেকে রামায়ণ ও মহাভারত নিয়ে পড়তাম ; ঠাকুরমার ঝুলির গল্পের চেয়ে এগুলি আমার বেশী ভাল লাগত। আমার কল্পনায় রাম, সীতা, ভরত আর লক্ষ্মণ ভেসে বেড়াতেন ; বিজয়ী বীর অর্জুনের ভীরুতা দেখে মাঝে মাঝে মর্মাহত হতাম। শ্রীকৃষ্ণের ছলাকলা দেখে মনে আঘাত লাগত। পিসেমশাইকে প্রশ্ন করতাম,—ওরকম ভাবে দুর্যোধনকে ঠকিয়ে তাঁর মাথার মুকুট এনে ভীষ্মের মত বুড়ো মানুষকে ঠকানো উচিত হয়নি!

তিনি বলতেন,—বাবা, যুদ্ধনীতি আর ধর্মনীতি এক নয়। যে রোগের যে ওষুধ, এ পথ ছাড়া যে ভীষ্মকে জব্দ করা যেতো না! আর ভীষ্মের মত বীর ওরকম পাপীর অন্ন খেয়ে শাস্তির যোগ্যই হয়েছিলেন।

আমি বললাম,—কিন্তু দ্রোণাচার্য তো কোন অপরাধ করেন নি?

নয়ানচাঁদ বলেন,—নিশ্চয়ই করেছেন। তাঁরই যুক্তিতে অন্যায় যুদ্ধে সপ্তরথী মিলে অভিমন্যুকে বধ করলে। আর ভীষ্ম ও দ্রোণের মত ধার্মিক লোক ক্ষমতা থাকতেও দুর্যোধনকে বাধা দেয়নি ; এটাও পাপ।

আমি বলতাম,—আচ্ছা পিসেমশাই, রাম কিংবা কৃষ্ণ ওঁরা তো নিজে ভগবান। পাপীদের দমন করতে তাঁদের জন্ম ; এটা তো তাঁরা ইচ্ছে করলেই আপনা-আপনি ঘটে যেত ; তার জন্যে এত কিছু ঘটানোর দরকার হ'ল কেন? কৃষ্ণের চোখের সামনে তাঁর নিজের বংশ ধ্বংস হয়ে গেল। রামকে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হ'ল। সীতার বনবাস, লক্ষ্মণ-বর্জন, আরো কত ঘটনা ঘটল, এসব তো তিনি ইচ্ছে করলেই ঘটত না।

আমার কথা শুনে নয়ানচাঁদ পিসেমশাই হেসে উঠলেন। তিনি বললেন,—বাবা! মানুষকে শিক্ষা দেবার জন্যই ভগবান পৃথিবীতে নেমে আসেন। মানুষ হয়ে জন্মালে ভগবানকেও মানুষের মত সুখ-দুঃখ ভোগ করতে হবে ; তাঁরও নিস্তার নেই ;—এটা শিক্ষা দেবার জন্যই ভগবান এই মাটির পৃথিবীতে মানুষের ঘরে জন্মান। তাঁরও অসুখ-বিসুখ হয় ; তাঁরও আত্মীয়স্বজন মরে। তাঁকেও খেটে খেতে হয়। তাঁরও শত্রু-মিত্র থাকে,—বুঝলে?

পিসেমশাইয়ের কথা তখন বুঝেছিলাম কিনা বলতে পারিনে ; তবু মানুষ হয়ে জন্মালে ভগবানকেও মানুষের মত সুখ-দুঃখ ভোগ করতে হবে,—এ কথাটা খুব মনে ধরেছিল।

সিদ্ধিনাথের মহাবারুণী মেলা। হাজার হাজার লোক জড় হয় সেখানে। বিচিত্র পোশাকে বিচিত্র নরনারী,—জানা-অজানা কত জাতের লোক সারি সারি চলেছে। রাস্তায় জনস্রোত চলে। একমাস ধরে হৈ-হল্লোড় আর কলরব। কাঞ্চনগড়ের পাশেই মেলা বসেছে। ম্যাজিক, সার্কাস, ছায়াবাজি আর বাঘ-ভালুকের খেলা। গোরু, মহিষ, ঘোড়া, ছাগল আর ভেড়ার বাজার বসেছে একপাশে। সারি সারি দোকানে কত চমৎকার সব জিনিস, মনোরম কত খেলনা, কত কাপড়-চোপড়, বাসন-পত্র, আরো কত রকমের জিনিস; মিষ্টির দোকানে কত খাবার। প্রায় মাইল খানেক জুড়ে সব বসেছে।

মেলার উত্তর প্রান্তে নাচঘর—বিরাট প্যাণ্ডেল। তার পাশে পুলিসের ঘাঁটি। যাত্রার দল আসে বাইরে থেকে,—কত নামকরা দল। নাচঘরে একটির পর আর একটি পালা অভিনয় হয়। রাজা, রাণী, রাজপুত্র, মন্ত্রী, সেনাপতি আর জটাজুটধারী মুনি-ঋষি—কি বিচিত্র তাদের পোশাক। রাজার সুন্দর পোশাক লণ্ঠনের আলোতে ঝিক্‌মিক্ ক'রে ওঠে। যাত্রা শোনার জন্ম আমার সে কি ব্যাকুলতা! আজ তা মনে পড়লে হাসি পায়। কাঞ্চনগড়ের ছাত্রদের জন্ম সামনে থাকে ঘেরাও করা আসন। দূর থেকে তা দেখতে পেতাম; যেদিন থেকে একথা শুনেছি, সেদিন থেকেই কাঞ্চনগড়ের ছাত্র হবার লোভ জেগেছে মনে। ভাবতাম কি সৌভাগ্য তাদের। সে স্বপ্ন সফল হয়েছে। তাদের মধ্যেই নেতৃত্ব করছি; গর্ববোধ করি মনে মনে।

আমাদের বাড়িতেও মেলার ক-দিন বেশ হৈ-চৈ লেগে যায়। দূরের আত্মীয়-স্বজন অনেকে মেলা দেখতে আর পুণ্য-স্নান করতে আসেন। বারুণীর পুণ্য-স্নানে নাকি সব পাপ ক্ষয় হয়ে যায়! খুন-খারাপী, চুরি-ডাকাতি করতেও যার বাধে না, সেই যদু মালী, পাঁচ ছ'বার যে জেল খেটেছে, সেও চলে পুণ্য-স্নান করতে। ছেলের বউয়ের গলা টিপে মেরেছিল সোনামণির মা: রাতদিন বউটাকে ঠেঙাত। সে তো আমি নিজের চোখে দেখেছি। বউটা ঘরে মরে পড়ে রইল; সোনামণি রটিয়ে দিল বউয়ের ওলাউঠা হয়েছিল। পাড়ার লোক ওলাউঠার ভয়ে আর কাছে ঘেঁষল না। মা আর ছেলেতে টানাটানি ক'রে নিয়ে গিয়ে বউটাকে নদীর ধারে পুড়িয়ে ফেললে। সেই সোনামণির মা বারুণী-স্নান ক'রে কপালে তিলক কাটে।

মনে মনে মনে ভাবি,—পাপ কাটাবার বেশ সহজ উপায় ভগবান ক'রে দিয়েছেন ; কৃতজ্ঞতায় মন ভরে ওঠে।

আবার ভাবি, হাজার হাজার লোক এসেছে মেলায়। কাতারে কাতারে সবাই স্নান করছে। বাচ্ছা বাচ্ছা দশটা ছেলেকে স্নান করাচ্ছে নিতাই বুড়ো! এই হাজার হাজার লোকের সবাই কি পাপী? এরা কি বছরের সঞ্চিত পাপ ধুয়ে ফেলতে আসে এখানে? কি পাপ করেছে এরা? বাবা যে বাড়িসুদ্ধ আমাদের সবাইকে নিয়ে গিয়ে সিদ্ধিনাথের ঘাটে স্নান করান; এর মানে কি? আমরা কি সবাই পাপী? কি পাপ করেছি আমি? বারুণী-স্নানের দিন স্নান না সেরে জল পর্যন্ত মুখে দেবার যো নেই। স্নান সেরে সিদ্ধিনাথকে প্রণাম ক'রে নৌকোয় বসে দই আর চিঁড়ে গুড় দিয়ে মেখে খেতে হ'ত। সেদিন দিনের বেলা ভাত খাবার উপায় ছিল না। মাটির সরায় চিঁড়ে দই খেতে অবশ্য খুবই ভাল লাগত। সেই অসংখ্য লোকের হল্লোড়ে মন আনন্দে নেচে উঠত।

পাপ-পুণ্যের কোন হিসেব বুঝে উঠতে পারিনি। আমরা তো ছোট ছেলে, মেলার হৈ-চৈ আর দোকান-পশারই আমাদের ভাল লাগত। ভাবতাম পাপ যদি বা কিছু ক'রেই থাকি, সব তো ধুয়েই ফেলছি বছরে বছরে। পুণ্যের প্রতি একটা লোভও ছিল ; স্নান না করলে মন খুঁত খুঁত করে; পাপীরা যে স্বর্গে যেতে পারে না! স্বর্গে যে আমার মা আর কচি ভাই রয়েছে! সেখানে যেতে হবে। পিসীমা বলেন,—যাঁরা মরে গেছেন, তাঁরা সবাই সেখানে রয়েছেন; গেলেই তাঁদের দেখতে পাব! আমার ঠাকুরদা, ঠাকুরমা আর এক দিদি,—তাঁদের আমি কোন দিন দেখিনি। তাঁরাও স্বর্গে আছেন। তাঁরা কি আমায় চিনতে পারবেন? নাঃ,—মা তো আমাকে চেনেন। মা-ই তাঁদের দেখিয়ে দেবেন। বেশ মজা হবে!

ইংরেজী স্কুলে পড়ি ; এখন অনেকটা বড় হয়েছি। অনেক কিছু বুঝি ; তবুও পাপ-পুণ্য আর স্বর্গ-নরকের খট্‌কা আমার ঘুচল না। দিব্যনাথ এত কথা জানেন, তিনিও পাপ-পুণ্যের কথা সঠিক কিছু বুঝিয়ে দেননি। তিনি বলেন,—কারো ক্ষয় নেই বাবা! মরণটা কিছুই নয়। শুধু দেহ পালটায়। পাপ-টাপ কিছুই নেই; সবই মনের খেলা। যাতে মন ভাল থাকে, তাতেই পুণ্য। বিচিত্র এই বিশ্বের খেলা। বড় হ'লে সব বুঝতে পারবে।

বারুণী-স্নানে পাপ-খণ্ডনের আর একটা ব্যাপারে বেশ খটকা লাগে। পাপ খণ্ডনের জয়-টীকা পরিয়ে দিতে আসে গ্রহাচার্য আর পাণ্ডার দল। ডুব দিয়ে উঠতে না উঠতেই তারা প্রায় ঘিরে ফেলে। তাদের প্রণাম করে পুণ্যার্থীর দল। আবিরের লাল টিপ পরিয়ে দেন তাঁরা কপালে। পাণ্ডাদের মধ্যেযে আগে টিপ পরিয়ে দিতে পারে, তারই লাভ। এক একটি টিপের নিম্ন-মূল্য এক পয়সা। আনি, দুয়ানি, সিকিও দেয় অনেকে। কেউ কেউ আবার জলে তর্পণও করে। ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিলে নাকি পুণ্যের পরিণাম বেড়ে যায়। বেচারী হরিশ্চন্দ্র রাজার কথা মনে পড়ে যায়। অবশ্যি এদের কেউ বিশ্বামিত্রের মত অত জবরদস্ত মুনি-ঋষি নন।

আমাদের বাড়িতে এরকম পুণ্য-বাড়ানোর অভিলাষী আত্মীয়েরা কেউ কেউ এসে আশ্রয় নেন দু'এক দিনের জন্য। তাঁদের বেশ আদর-যত্ন হয়। তাঁরাও বাড়ির ছেলেমেয়েদের জন্য কত খাবার ও খেলনা নিয়ে আসেন। এখনও রসিককাকার কথা বেশ মনে পড়ে; বারুণীর দিন সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরে এক থলে পয়সা তক্তাপোশের ওপর ঢেলে তিনি গুণতেন। তিনি আবার গাঁজা খেতেন; গাঁজায় দম দিয়ে রসিককাকা শিবের গান করতেন। সে গান আমার বড় ভাল লাগত; কিন্তু শিব যে কুচুনী পাড়ায় গিয়ে কোচ-রমণীদের সঙ্গে রসিকতা করেন, এটা আমার ভাল লাগত না। বড় হয়ে গিয়েছি বলে রসিককাকাদের দেওয়া খেলনা আমি নিই না। তার বদলে চুপি-চুপি পয়সা চাই। রসিককাকা বলেন;—এক মুঠোতে যতটা পার, তুলে নাও।

সেবার এসেছেন তান্ত্রিক চন্দ্রনাথ—দূর সম্পর্কের মামা তিনি। তাঁর সঙ্গে পুণ্য-কামী একদল ভক্তও এসেছে—নানা জাতের লোক। কাঞ্চনগড় থেকে ফিরে এসে দেখি, জারুলগাছের তলায় তারা আস্তানা গেড়েছে। সেখানে উনুন ক'রে রান্না-বান্না চাপিয়েছে তারা। গাছের তলায়ই চাটাই বিছিয়ে তাদের অনেকে গড়াগড়ি দিচ্ছে। ভোর হতে না হ'তে "জয় সিদ্ধিনাথ" বলে কলরব ক'রে তারা মেলার পথে পা বাড়াল। তাদের কলরবে ঘুম ভেঙে যায়।

ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে আমিও মেলায় যাবার জন্য ছটফট ক'রে উঠি; মেলার প্রথম কয়েকদিন ছাত্রাবাসে থাকবার নিয়ম নয়। দশটার সময় খেয়েদেয়ে মেলায় যাবার কথা। কিন্তু তাতে বাধা পড়ে গেল। চন্দ্রনাথের

সঙ্গে এসেছেন আমার কনক কাকীমা,—উজ্জ্বল আনন্দ-ভরা তাঁর মুখখানি। তাঁকে দেখে শৈশব স্মৃতি—সুব্রতার মুখখানি মনের কোণে উঁকি-ঝুঁকি মারতে লাগল।

পিসীমা বললেন,—তাড়াহুড়ো করছিস কেন খোকা? আজ না হয় একটু দেরীই হ'ল।

আমি বললাম,—দেরী করতে পারব না। নল-দময়ন্তী যাত্রা হবে। বারোটার আগে আমাকে পৌঁছুতে হবে!

কাকীমা এগিয়ে এলেন। হাসিমুখে আমার কাছে এসে বললেন,—কিরে খোকা? কাল থেকে তোর দেখা নেই; কখন এসেছিস, জানতেই পারিনি!

পিসীমা বললেন,—তোর কাকীমা; প্রণাম কর খোকা। মাথা নুইয়ে তাঁর পায়ে হাত দিতে না দিতেই তিনি দু'হাতে আমার মাথাটা তুলে ধরে আদর ক'রে বললেন,—থাক্ থাক্; বেশ বড় হয়ে গেছিস্! কতদিন যে দেখিনি!

কাকীমার কথা শুনে লজ্জা পাই; আমার মত বড় ছেলেকে যে কেউ এমন ক'রে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে পারে, তা ভাবি নি। তিনি বললেন,—হ্যাঁরে, এখানে তো তোর লেখাপড়া শেষ হয়ে এসেছে। তুই নাকি বড় স্কুলে পড়ছিস, এবার নাকি আরো দূরে চলে যাবি?

পিসীমা বললেন,—হ্যাঁ বোন। আর ক'টা মাস, এখানকার পড়া শেষ হয়ে যাবে। বাসুদেবের দেশে যাবে, তার এক দিদির বাড়িতে থাকবে।

পিসীমার কথায় গর্ব বোধ করি। হ্যাঁ, বড় স্কুলে পড়ব! বাসুদেবের দেশে রথ হয়! কি মজা! এ খবরটা বন্ধুদের দিতে হবে। সুবীর শুনলে খুশী হবে। আর দিব্যনাথ? নিশ্চয়ই তিনি সব চেয়ে বেশী খুশী হবেন। কাঞ্চনগড়ে এক্ষুনি যেতে হবে। আর ক'টা মাস!

পিসীমাকে বললাম,—আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে পিসীমা। সেখানে আমার কত কাজ। আমায় ক্যাপ্টেন করেছে কিনা। স্কুলের ছেলেদের সামলাতে হবে।

কাকীমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে কথাগুলি বলতে বেশ গর্ব বোধ করলাম। তিনি মৃদু হেসে বললেন,—আবার ছেলেদের ক্যাপ্টেন হয়েছিস! তোর সেই ভৃগু-ভৃগু খেলা ভুলে গেছিস নাকি?

কাকীমার কথাটা খচ্ ক'রে বুকে যেন বিঁধল। অনেক দিনের কথা। সুব্রতার মুখখানি চোখের সামনে ভেসে উঠল। পিসীমা বললেন,—সে কি ভোলে বাছা! এখন তো ওর ভৃগু নামই হয়ে গেছে। এখানেও সবাই ডাকে ভৃগু।

কাকীমা বললেন,—সুবিকে মনে পড়ে তোর?

কি জানি কেন, লজ্জায় মুখটা রাঙা হয়ে ওঠে; কোন উত্তর দিতে পারি না। কাকীমার মুখের দিকেও আর তাকাতে পারি না।

তিনি বললেন,—আহা! বেচারীর বিয়ে হয়ে গেছে। যে গাঁয়ে তার বিয়ে হয়েছে, সে গাঁয়ে আমার এক ভাগনের বাড়ি। ভাগনের বিয়েতে গিয়ে সুব্রতাকে দেখলাম। তাকে আর চেনা যায় না। সোনার প্রতিমা কালি হয়ে গেছে। তোর কথা জিজ্ঞেস করলে। সে পাগল হয়ে গেছে রে, পাগল হয়ে গেছে।

সুব্রতা পাগল হয়ে গেছে?—সেই রাত্রের কথা মনে পড়ল; আর মনে পড়ল সেই স্বপ্ন আর অভিশাপের কথা। সুব্রতা বলেছিল. বিয়ে করবে না। তবে যে বড় বিয়ে করলে? মনে মনে হাসিও পায়।

কাকীমাকে জিজ্ঞাসা করলাম,—কেন কাকীমা, সে পাগল হয়ে গেছে কেন?

তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন,—তুই বুঝবি না খোকা! তোকে বোঝাতে পারব না! সুবির বাবা মেয়েকে ও-জায়গায় বিয়ে দিয়েই খারাপ করেছেন।

পিসীমা বললেন,—আহা, বেচারীর শেষে একটা তেজবরে বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিলে শিবতোষ! আমরা শুনে মানা করেছিলাম। কিন্তু কে কার কথা শোনে? বিষয়-সম্পত্তি, টাকা পয়সার লোভে মেয়েটাকে গলায় কলসী বেঁধে জলে ফেলে দিলে।

কাকীমা বললেন,—ছিঃ ছিঃ। বড়ঠাকুর মেয়ের সর্বনাশ করেছেন। তোমায় বলব দিদি! সে অনেক কথা। সুবি আমাকে সব বলেছে।

পিসীমা বললেন,—আমরাও তার কিছু কিছু জানি। মেয়েটা বিয়েই করতে চায়নি। তার ওপর এই বুড়ো বর! জোর জবরদস্তি ক'রে বিয়ে দিলে; মেয়েটা বাসর ঘরেই মূর্ছা গেল।

সুব্রতার কথা চিন্তা ক'রে মনটা কেমন করতে লাগল। এখন তো সে অনেক বড় হয়েছে। এখনও কি বুদ্ধি-শুদ্ধি হয়নি তার? ভাবলাম, একবার

তার কাছে গেলে হয় না? আমি বুঝিয়ে বললে নিশ্চয়ই তার মতিগতি ভাল হয়ে যাবে। কাকীমাকে জিজ্ঞেস করি,—সে কোথায় আছে কাকীমা?

তিনি বলেন,—কোথায় আবার থাকবে? বিয়ের পর স্বামীর ঘরে এসেই তো পাগল হ'য়ে গেল। কি যে আবোল-তাবোল বকে! কিন্তু আর সব ঠিকই আছে; ঘরকন্না ঠিকই করে কিন্তু বরকে দেখলেই ক্ষেপে যায়। তাঁর বাবা দু'একবার এসে নিয়ে গেছলেন; সেখানে গেলে বেশ ভাল থাকে। তারপর আবার স্বামীর ঘরে আসে; তখন সব গোলমাল হয়ে যায়।

পিসীমা বললেন,—বড় কষ্ট হয় বোন। তার কথা যখনই শুনি, চোখে জল আসে। বাপ-মায়ের আদুরে মেয়ে; তার কিনা শেষে এই হ'ল?

কাকীমা বললেন,—ওর বরটা নিতান্ত ভাল মানুষ। সুবিকে কত যত্ন-আত্তি করে। এত যে পাগলামি করছে, সে বেচারী চুপ করে সব সয়ে যায়।

পিসীমা বললেন,—শাহজালালের জল দিলে শুনেছি, পাগল ভাল হয়ে যায়। শিবুকে সেই জল আনতে বলে দিয়েছিলাম। জানিনে সে কি করলে? আমরা তো অনেক দূরে থাকি; কি করেছে, কি ক'রে জানব বল?

কাকীমা হেসে বললেন,—না দিদি। ওসব দৈবে সুবি ভাল হবে না। আমার মনে হয়, সত্যিই মেয়েটা শাপভ্রষ্টা কোন দেবতা; সময় হলেই নিজের জায়গায় চলে যাবে।

পিসীমা ও কাকীমার এ আলোচনা আমার মনকে ভারাক্রান্ত ক'রে তোলে। হায় সুব্রতা! সে শাপভ্রষ্টা? তবে কি তার স্বপ্নের কথা সুব্রতা কাকীমাকে বলেছে? নিশ্চয়ই। তা না হলে কাকীমা এমন কথা বলেন কি ক'রে? নিশ্চয়ই সে আমার কথাও বলেছে।—যেদিন সুব্রতার কাছে তার স্বপ্নের কথা শুনেছিলাম, সেদিন এত কথা ভাবতেও পারিনি। আমার সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা মনে হওয়ায় লজ্জা ও সংকোচ আমাকে পেয়ে বসল। কি জানি কেন, আমার চোখে জল এলো। তার দেওয়া পেতলের সেই আংটিটা এখনও বইয়ের বাক্সে লুকানো রয়েছে!

কাকীমা আঁচল দিয়ে আমার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললেন,—যা খোকা; মেলায় যাবি না?

আমি উত্তর দিই,—হ্যাঁ কাকীমা, যাব।

পিসীমা বললেন,—খেয়ে দেয়ে চলে যা; নিবারণের সঙ্গে যাবি।

পিসীমার ভয় দেখে মনে মনে হাসি। তিনি জানেন না, হাজার হাজার লোকের ভিড়েও আমি পথ হারাই না। কাঞ্চনগড়ের পথ-ঘাট, আর মেলার অলি-গলি আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। আর আমি ছোটটি নেই। তিন-চারশো ছেলের আমি ক্যাপ্টেন।

পিসীমাকে বললাম,—হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি। নিবারণ এতক্ষণ হয়ত চলে গেছে।

—না রে না। আমি তাকে বলে এসেছি, তোকে ডেকে নিয়ে যাবে।

কাকীমা বললেন,—যা, শীগগির চলে যা? নল-দময়ন্তী যাত্রা হবে যে।

নাচঘরের ভিড় আর নল-দময়ন্তীর করুণ দৃশ্যগুলি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। দময়ন্তীর করুণ বিলাপ সুব্রতাকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল। কতবার যে নল-দময়ন্তী যাত্রা দেখেছি, তার ঠিক নেই। তবু নতুন ঠেকে। বারবার মনে জাগে, কাঞ্চনগড়ের পালা যে আমার শেষ হয়ে এসেছে; তবু তার আকর্ষণ ছাড়তে পারিনি। ভাবলাম, এবার ফেল ক'রে আর এক বছর এখানে থাকি!

কাঞ্চনগড় বেঁধে রাখতে পারলো না। মেলার শূন্য মাঠের উপর দিয়ে এঁকে বেঁকে রাস্তা চলে গেছে—পূব থেকে পশ্চিমে। দু'ধারে তিসি আর তিলের ফুল,—নীল আর সাদা। ছোট ছোট গাছগুলি বাতাসে দুলছে, মাঠভরা রবি শস্য। পাশেই নদী 'বড়বক্র'। আনমনা হয়ে পথ চলি; সঙ্গে কেউ নেই। কত কথা মনে জেগে ওঠে। এ মাঠেই বছরে বছরে মেলা বসবে; কিন্তু আমি কোথায় থাকব? না, না, মেলার সময় যেখানেই থাকি না কেন, একবার ক'রে আসব। আবার ভাবি, তা কি সম্ভব? সুবীর আর কাঞ্চনগড়?—সুবীরও তো এখান থেকে চলে যাবে। পথ চলি আর ভাবি; দূরে পাহাড়ের গায়ে পলাশবনে যেন আগুন লেগেছে। নাচঘরের ভিটের কাছে এসে পৌঁছেছি; পা আর চলে না। কুলগাছের ছায়ায় বসে পড়লাম।

পিছন থেকে কে এসে ডাকলে,—এ কি? তুমি এখানে বসে যে?

ফিরে দেখি,—সুবীর আর হরেন। তারা দু'জনেই এক ক্লাসে পড়ে। তা'হলে স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। সুবীরকে বললাম,—হ্যাঁ ভাই, ভাল লাগছে না। তাই এখানে একটু বসেছি।

—দূর! তোমার কাণ্ডই আলাদা। ক'দিন ধরে দেখছি, তোমার যেন কি হয়েছে। ভাল ক'রে পাশ করেছ ; এবার তো আমাদের ছেড়ে চললে,—হরেন বলে।

সুবীর বলে,—মনে থাকে যেন, সামনের বার মেলায় আসা চাই-ই। আমার পালা তো আসছে বার পড়বে। কোথায় যে চলে যাব, জানিনে। আর হয়ত আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হবে না।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। সুবীরকে বললাম,—ভাল ক'রে পড়াশুনা কর ভাই ; সবাইকেই যেতে হবে। আমার জন্য ভেবো না। যেখানেই থাকি, আসছে বার মেলায় আসব। কিন্তু তারপর ? তারপর তো মেলার কোন আকর্ষণই থাকবে না। তুমি আমি সবাই দূরের মানুষ হয়ে যাব। এখানে আসবে নতুনের দল ; কাঞ্চনগড়ের ছেলেরা তখন আমাদেব চিনতেই পারবে না।

হরেন বললে,—ঠিক কথা বলেছ ভাই ! আমরা সব তখন পর হয়ে যাব।

সুবীর বললে,—কি ক্ষতি হবে তাতে ? আমরাও আর ছোটটি থাকব না। তবু ভাই, সামনের বছর আমরা তো আছি ; তুমি আসবে। আমিও পরে আর এখানে আসব না।

হরেন বললে,—তুমি নাকি অনেক দূরে তোমার এক দিদির বাড়িতে থেকে পড়াশুনো করবে ?

আমি বললাম,—হ্যাঁ, সে অনেক দূব।

হরেন বললে,—এত দূরে যাবে কেন ? এখানকার শহরের স্কুলে তো পড়তে পার।

আমি বললাম,—না ভাই, শহরে থাকবার মত জায়গা আমার নেই। আর খরচ ক'রে বোর্ডিংযে থাকতে পারব না।

সুবীর বললে,—বেশ, কিন্তু সামনের বার মেলায় আসতে ভুলো না। চল এখন, তোমায় আমরা এগিয়ে দিয়ে আসি।

তিনজনে পথে এগিয়ে চলেছি ; হৈ-চৈ কাণ্ড ! একপাল ছেলেমেয়ে পাগল বোষ্টমীকে ক্ষেপাচ্ছে ! বোষ্টমী ঢিল ছুঁড়ছে আর অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল দিচ্ছে। পাগলা বোষ্টমী,—লালুর কুকুনী। কে এর নাম দিয়েছে জানিনে। বোষ্টমীকে দেখলে সবাই ক্ষেপায় ; লালুর কুকুনী বলে চীৎকার করে। ভিক্ষেয় বের হ'লে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে বোষ্টমী।

আমরাও তাকে ক্ষেপাতাম। আজ কিন্তু তাকে দেখে মমতা জেগে উঠল।

রোগা পাতলা—হাড় ক'খানা দেখা যাচ্ছে; কোমরে গামছার মত ময়লা একখানা মার্কিন কাপড়ের টুকরো জড়ানো, কাঁধে তার শত তালি দেওয়া ভিক্ষের ঝুলি। লালুর কুকুনী এগিয়ে যেতে পারে না। ছেলেরাও ঢিল ছোঁড়ে, হাততালি দেয়।

ফুলছড়ি গাঁয়ের একপ্রান্তে পাগলা বোষ্টমীর আখড়া। কতদিন সে আখড়ায় গিয়েছি। দু'তিনটে কুল গাছ আছে সে আখড়ায়; বোষ্টমী কুল আগলায়। ফাল্গুন মাসে যখন কুল পাকে, তখন বোষ্টমীর আখড়ার দিকে যাওয়াই মুস্কিল। তবু ছেলেরা যায়; কুল চুরি করে।

আখড়ায় আছে এক অন্ধ বুড়ো বোষ্টম। সবাই বলে ওরই নাম লালু। যৌবনে বামুনের বিধবা সদু লালুর সঙ্গে বেরিয়ে এসে ভেখ্ নিয়েছে। রূপসী ছিল সে! দু'জনে নাকি ভিক্ষে ক'রে আর নাম গান ক'রে বৃন্দাবন আর নবদ্বীপ ঘুরে এসেছে।

পালেরাই আখড়া ক'রে দিয়েছিল। কিন্তু বোষ্টমী রূপসী ছিল,—একথা কে বিশ্বাস করবে? মাথায় টাক, তার উপর ঠিক ব্রহ্ম-তালুর পেছনকার ক'গাছি চুল টিকির মত ঝুলছে; তার ডগায় লালুর কুকুনী তুলসীর ছোট্ট একটি ডাল পাতাসুদ্ধ বেঁধে রাখে। গলায় দেড় হাত একটা চাদর ঝুলিয়ে রাখে সে। বুকটাও শুকিয়ে গেছে। মুখে-গায়ে বসন্তের দাগ। মনে হয়, পাহাড়ী কুকীদের কথা ভেবেই কেউ লালুর বোষ্টমীর নাম লালুব কুকুনী রেখেছে।

পালেদের অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়েছে; তবু তারা রোজ একটা সিধে পাঠায় আখড়ায়। কিন্তু তাতে কি হবে? কানা, খোঁড়া, অন্ধ, আতুর ভিখারী দেখলেই বোষ্টমী আখড়ায় ডেকে নিয়ে গিয়ে খেতে দেয়। পিসীমা বলেন,—বাবা! তোরা ওর পেছনে লাগিস নি; বোষ্টমী বড় ভাল মানুষ রে!

বোষ্টমীর আখড়ায় একদিন চুপি চুপি কুল কুড়োতে গিয়েছিলাম; সেদিন আর কেউ ছিল না। বোষ্টমী হঠাৎ কোথা থেকে এসে খপ ক'রে আমার হাত ধরলে। আমি তো ভয়ে অস্থির। বোষ্টমী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে,—ছিঃ খোকা! কুল খেতে পাও না? খেতে হয়, আমার কাছে চাইবে; যত খুশী পাবে।

আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল বোষ্টমী। আখড়ার ভেতরে নিয়ে গিয়ে অনেক কুল দিলে; আর দিলে কত আচার। তিন চারটে পঙ্গু লোক তার উঠোনে বসে রয়েছে। একজনের নাক-মুখ ফুলে উঠেছে; হাতে দগদগে ঘা। আমার এসব দেখেশুনে ভাল লাগল না। বাইরে এসে কুল আর আচার ঢেলে ফেলে দিয়ে বাড়ি চলে এলাম। আর কোনদিন বোষ্টমীর কুল চুরি করিনি।

ছেলেমেয়েরা বোষ্টমীকে ক্ষেপাচ্ছে; তা দেখে হরেনকে বললাম,—দে না ভাই, ওদের একটা ধমক। দেখছিস না, বোষ্টমী পড়ে গেছল; হাঁটু দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে।

হরেন এগিয়ে গিয়ে ওদের ধমক দিয়ে তাড়া করলে; সবাই পালিয়ে গেল। বোষ্টমীকে আমরা বললাম,—তুমি চলে যাও; আমরা এখানে দাঁড়াচ্ছি। ছেলেগুলো আর তোমার পেছনে ছুটবে না।

বোষ্টমী চলে যায় মাঠের দিকে। তখন সে সুর ধরেছে—

"শ্যামের বাঁশী বাজে গো রাই
জল ভরিতে চল।"

আমরাও এগিয়ে চলি; বেলা পড়ে আসে। ছোট্ট খালের ওপর বাঁশের সাঁকো। বন্ধুরা এখানে এসে বিদায় নেয়। চোখের সামনে কাঞ্চনগড় ঝিকমিক করে; ওপারে সিদ্ধিনাথের চুড়া। বারবার ফিরে ফিরে তাকাই, ওই যে তারা! আর দেখা যাবে না। দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পড়ে; সামনে দীর্ঘ পথ; অন্ধকারে যে আমার ভীষণ ভয়! সুব্রতা কাছে নেই। সে পাগল হয়ে গেছে! তার বিয়েও হয়ে গেছে!

আমি নদীর ধারে বসে আছি! হঠাৎ খেয়াল হ'ল সবই স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেছে। সুব্রতা, সুবীর দিব্যনাথ আর ক্ষেত্রদিদি,—তাঁরা তো অনেক দূরে। আমার এখন নতুন পথে যাত্রা; অনেক বড় হয়েছি, কলেজে পড়ছি। নতুন শহরে, নতুন আবহাওয়ায়, কত কি নতুন দেখছি। এখানেও টিলার উপর ছবির মত লাগে কলেজকে। পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকে-বেঁকে গেছে মাটির রাস্তাগুলি।

অমল এসে আমার চিন্তার সুর কেটে দেয়। নতুন বন্ধু জুটেছে অমল। রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনর্গল মুখস্থ বলতে পারে। মোটা মোটা খাতায়

সব কবিতা লিখে রেখেছে। শুধু মুখস্থই বলে না,—আবেগও থাকে তার মাঝে। অমল বললে,—আমার দেরী হয়ে গেল ভাই। চল আজ পূবদিকে পাহাড়ের ধারে বেড়াতে যাই।

আমি বললাম,—চল; ওদিকটা আমার বড় ভাল লাগে।

শহরের চাল-চলন ও আব্‌হাওয়ায় মুগ্ধ হয়ে যাই। আমাদের যদি শহরে বাড়ি থাকত? কেমন কলের জল, বাঁধানো পাকা পায়খানা, কত গাড়ী আর কত ঘোড়া। রাতদিন হৈ-চৈ। সকাল-বিকেল-দুপুর সব সময়ই বাজার খোলা। এ যেন সেই বারুণী মেলা। লোকগুলো খুব ব্যস্ত; শুধু স্কুল, কলেজ, অফিস আর আদালত—আর কোন কথা নেই। দশটা-পাঁচটায় সারবন্দী হয়ে লোক চলে রাস্তায়। পাড়ায় পাড়ায় স্কুল।

শহরে এসেছি; কিন্তু সম্পূর্ণভাবে অদৃষ্টের উপর নির্ভর ক'রে। বাবাও চলে গেছেন; সংসার থেকে খরচ আসে না। অজানা অচেনা জায়গায় এসে আশ্রয় খুঁজে নিয়েছি; সেই বড় স্কুলের শিক্ষক কনকবাবু আর দাশ মশাইয়ের চিঠির জোরে এক ভদ্রলোক সদয় হলেন। কিন্তু এত বড় শহরেও স্থান মেলে না; এত বড় বড় ঘর পড়ে রয়েছে, কেউ কাউকে থাকতে দেবে না। আশ্চর্য হয়ে ভাবি, এরা—শহরের লোকেরা ভারি স্বার্থপর।

শহরের ধারে খুব বড় একটা ঝিল; তারই পূবদিকে এক জায়গায় দশ বারোটা প্রকাণ্ড বটগাছ; তারা অনেক দূর ডালাপালা মেলেছে। সেই গাছগুলির আচ্ছাদনীর নীচে সাদা পাথরের বেদী, সন্ধ্যার পর সারারাত সারি সারি মোমবাতি জ্বলে। পীরের দরগা,—পাঁচপীর। আজিজের মায়ের কথা, আমার সেই মুসলমান বড়দিদির কথা মনে পড়ে যায়—"পাঁচপীর তোকে রক্ষে করবেন।"

দরগার পাশেই একখানি ছোট ঘরে থাকি। রাত্রে ভয় করে। বড় বড় কত পাখী আশ্রয় নেয় সেই সব বটগাছে। কোন কোনটা বা বিকট আওয়াজ করে। একাই থাকি একখানা ঘরে। একটু দূরেই সারি সারি লোকালয়—বাবুদের বাসা। বন্ধুরা বলে,—ওখানে কেমন ক'রে থাকো ভাই? তোমার ভয় করে না?

তাদের কথা শুনে মনে মনে হাসি। ভয় ডর যে আমার নেই। ক্ষেত্রদিদির মন্ত্রবলে সব উড়ে গেছে। অন্ধকারে কালো কালী-মূর্তি আমার

সামনে যেন দাঁড়িয়ে থাকে। ক্ষেত্রদিদির সে অভয়বাণী কানে ঝঙ্কার দেয়। তবুও মাঝে মাঝে বুকটা কেঁপে ওঠে।

দু'বেলা টিউশনি করি। রাত দশটা-এগারোটায় ঘরে ফিরি, তারপরে পড়াশুনো। একই রকমে দিন চলে। আজকাল আবার অমল জুটেছে; বিকেলে দু'জনে ঘুরে বেড়াই। কোনদিন বা তাদেরই বাসায় নিয়ে যায়। অমল রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে; আমি শুধু বসে বসে শুনি।

বড়লোক এক উকিলের বাড়িতে পড়াই; তিন-চারটি ছেলেকে একসঙ্গে পড়াতে হয়। বিরক্তি লাগে; ওদের ঐশ্বর্য আমাকে পীড়া দেয়। তাদের মধ্যে বড় ছেলেটি অঙ্ক কষতে ভালবাসে; শুধু অঙ্কই করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। রাত ঘনিয়ে আসে। তারপর ঘরে ফিরে এলিয়ে পড়ি বিছানায়। একদিন রাত এগারোটার পর ঘরে ফিরেছি; গরমের দিন, দরজা খুলে রেখেই বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছি। বটগাছে একটা পাখী ডাকে 'পিউ, পিউ'। হঠাৎ ঘরে ছায়া পড়ল; ফিরে তাকিয়ে বিস্মিত হলাম। আমার সেই ছাত্রটি খালি-গায়ে ঘরে এসে ঢুকেছে।

—এ কি সুধা! তুমি এত রাত্রে এখানে?

—দেখতে এলাম আপনি কি করছেন?

—কি দেখবে? এখন যে রাত বারোটা?

—তা হোক্, আমি মাকে বলে এসেছি।

—মাকে বলে এসেছ? তোমার ভয় করল না?

—কিসের ভয়?

—এই পাঁচপীরের মোকাম আর বটগাছের তলা দিয়ে নিশুতি রাত্রে আসতে ভয় করল না?

সুধাংশু হাসিমুখে বললে,—আমার ভয় করে না। আচ্ছা মাষ্টারমশাই, আপনি খাওয়া দাওয়া করবেন কখন?

—কখন আর করব? রান্না ক'রে খেতে হয়, আজ আর কিছুই বোধ হয় হয়ে উঠবে না।

—আপনি রান্না ক'রে খান?

—হ্যাঁ, ওই উনুন আর বাসনপত্র দেখতে পাচ্ছ না? এত রাত্রে আর কিছু করব না।

—বাঃ রে! উপোস ক'রে থাকবেন আপনি?

—কেন, তাতে কি হয়েছে? একটু গুড় আর জল খেয়ে নেবো।

আমার কথা শুনে সুধাংশু হেসে উঠল। সে বললে,—এরকম বুঝি সবদিনই কাটান?

—হ্যাঁ, কি করব বল? তোমার যা অঙ্ক করার ঝোঁক, তোমাদের ওখানেই এগারোটা বেজে যায়।

—আমাদের বললেই পারেন।

—কি বলব? তোমরা চার ভাই পড়বে। ওদেরও পড়া আছে। তা হ'লে তো ফাঁকি দিয়েই আসতে হয়।

সুধাংশু বললে,—ফাঁকি দিতে হবে না। মাকে আমি সব কথা বলব।

—কি বলবে মাকে? না পড়িয়ে মাইনে দেবে নাকি?

—না মাষ্টার মশাই! আমাদের প্রিয়দা বললে, আপনি খুব কষ্ট ক'রে থাকেন। বই-পত্র পর্যন্ত নেই। তার ওপর রান্না-বান্না করেন, টিউশনি করেন। তাই দেখতে এলাম।

—বেশ, দেখলে তো? আমার মত অনেকেই এরকম কষ্ট ক'রে পড়াশোনা করে, তাতে দেখবার কি আছে?

সুধাংশু ব্যথার সুরে বললে,—আমরা এসব ভাবতেই পারিনে। বইতে শুধু পড়েছি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা।

সুধাংশুর কথা শুনে জোরে হেসে উঠলাম,—হ্যাঁ, আমিও বিদ্যাসাগর হ'তে যাচ্ছি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাবা তবু ছিলেন। তাঁর খাওয়ার ভাবনা ছিল না, আমাকে সব ভাবনাই ভাবতে হয়।

সুধাংশু হেসে ফেললে,—এই যে. মাত্র দু'তিন খানা বই রয়েছে; আর বই-টইও নেই বুঝি?

সে আমার টেবিলের বইগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগল। রাত বেড়ে যাচ্ছে দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। তাকে বললাম,—চল আমি তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

নিতান্ত কিশোর বালক সুধাংশুর চোখে জল ছলছল করতে লাগল; সে আর কথা বলতে পারে না। বড়লোকের ছেলে সে; আমার এ দারিদ্র্য তাদের কল্পনারও অতীত। কোন কলেজের ছাত্র যে এরকম কৃচ্ছ-সাধনা ক'রে চলতে পারে, তা সে ভাবতেই পারে না। তক্তাপোশের ওপর একটা

শতরঞ্জি ; তার ওপর একখানা চাদর বিছানো। ঘরের এক পাশে উনুন। সরঞ্জাম—একখানি থালা, দুটি এলুমিনিয়ামের বাটি, একটা ঘটি, কড়াই, হাতা আর খুন্তি। সে যেন নির্বাক বিস্ময়ে সব দেখছে! আমি তার মনের ভাষা কিছু কিছু বুঝতে পারছি! আমারও মনটা উদ্বেলিত হয়ে উঠল। তার হাত ধরে বললাম,—চল সুধা, বাড়ি চল। বড্ড দেরী হয়ে গেছে।

সুধাংশুর হাত ধরে দরজায় তালা দিয়ে এগিয়ে চললাম। পাঁচপীরের দরগায় অসংখ্য মোমবাতি জ্বলছে। ভয়াবহ অন্ধকারের মধ্যে জ্বলজ্বল ক'রে জ্বলছে—শত শত রক্তরাঙা চোখ! অভয় মেলে না সে চোখে ; দেখলে ভয়ে কেঁপে ওঠে বুকটা। বটের শাখায় শকুনির পাখার ঝাপ্‌টা শোনা যায়। বিকট আওয়াজ—হিঁ-হিঁ-হিঁ।

বাড়ির কাছে এসেই সুধাংশু বললে,—আপনি এখন যান মাষ্টারমশাই। ওই যে শিবনলাল লণ্ঠন নিয়ে আসছে।

সুধাংশুকে রেখে ঘরে ফিরলাম। কত কথা মনে জেগে ওঠে,—কলেজ জীবনের কৃচ্ছ-সাধনা অবসাদ এনে দিয়েছে। তবু হৃদয়ে মনে অপূর্ব উন্মাদনা জাগে। এখানে পঠন-পাঠনের ধারা সম্পূর্ণ নতুন ; দিব্যনাথ যে ধারার স্বপ্নমাত্র দেখিয়েছিলেন, আজ তার বাস্তব চিত্র দেখছি। বড় বড় কবি, বড় বড় সাহিত্যিকের ছন্দ, ভাব ও রচনা-শৈলী মনকে কোথায় টেনে নিয়ে যায়। অধ্যাপকদের জ্ঞানভাণ্ডার বিস্মিত করে। কত পড়াশুনো করেছেন এঁরা? ইংরেজী পড়াতে গিয়ে সমপর্যায়ের বাংলা ও সংস্কৃতের উদ্ধৃতি আবৃত্তি করেন। শেক্সপিয়র, মিল্টন, বায়রন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ উন্মাদনা জাগায়। দেশের কবিদের মধ্যে তাঁদের সমপর্যায়ের সাদৃশ্য খুঁজি ; —কই? কেউ তো নেই! মধুসূদন? হ্যাঁ, অসীম শক্তিশালী এক জ্বলন্ত উল্কা। আর, আর? আর আছেন—একমাত্র রবীন্দ্রনাথ! তাঁর মধ্যে সবই আছে। গর্বে বুক ভরে যায়! রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালী। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি। অধ্যাপক সেনের আবৃত্তি মনে ঝঙ্কার তোলে এলোমেলো ভাবে ; কিন্তু সবটুকু মনে পড়ে না—

জীবনে যত পূজা হল না সারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।
যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে,

যে নদী মরুপথে হারাল ধারা,
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা ॥

দশ-পনের মিনিট পর, হঠাৎ কে হেঁকে উঠল;—হেই বাচ্চা, হেই ব্যাটা, একটু আগুন দে রে ব্যাটা।

আপদ আর কি? সেই পাগলা ফকিরটা। রাতদিন দরজায় দরজায় ঘোরে; নানা রঙের শত তালি দেওয়া আলখাল্লা পরে; লম্বা লম্বা চুল আর দাড়ি; কাঁধে ভিক্ষের ঝুলি। গাঁজাও খায়। লোক দেখলেই গালাগালি করে। সহজে কেউ তার কাছে ঘেঁষে না। পাগল, বদ্ধ পাগল। তবুও অনেকে খাতির করে; সামনে পড়লে সেলাম করে অনেকে। তার দয়া হ'লে নাকি বিপদ-আপদ কেটে যায়। ফকিরের হাঁক-ডাক শুনে ভয়ে মরি। দরজা খুলে উত্তর দিই,—বাবা যাও না ঐ তো দরগায় কত বাতি জলছে; আগুন নাও গে।

ফকির বলে,—বাতি কি রে ব্যাটা। বল্ চেরাগ। যত পাপী-তাপীকে পথ দেখাচ্ছে; তোদের যত পাপ-তাপ পুড়ে যাচ্ছে। চেরাগ,—চেরাগ,—আসমানের চেরাগ।

—হ্যাঁ চেরাগ! চেরাগের আগুন নাও গে।

হিঃ হিঃ ক'রে হেসে ওঠে পাগলা;—ওরে ব্যাটা দে, দে, আগুন দে। ভয় কি রে? দেশলাইটা ফেলে দে না। তোর ভাল হবে,—তোর নামে চেরাগ জালিয়ে দিচ্ছি।

দরজায় ফাঁক দিয়ে দেশলাইটা ফেলে দিলাম। দেখতে পেলাম, পাগলা একটা মোমবাতি ধরিয়ে দরগার দিকে এগিয়ে গেল। সে বললে,—কাল দেখতে পাবি আলো পড়েছে তোর কপালে,—আসমানের আলো!

পরদিন সন্ধ্যায় সুধাংশুকে পড়াতে গেলাম। দশটার সময় সুধাংশু বললে,—চলুন মা আপনাকে ডাকছেন। তার সঙ্গে ভেতরে গেলাম;—এ কি? খাওয়ার আয়োজন? আমাকে সেখানে খেতে হ'ল। সুধাংশুর মা বললেন,—বাবা! তুমি এখন থেকে এখানেই খাবে। হঠাৎ সুধাংশু আট দশখানা নতুন বই আমার হাতে দিয়ে বললে,—এগুলো নিয়ে যান, আপনারই পড়ার বই। আজ কিনে এনেছি।

সুধাংশুর মাকে প্রণাম করতে যাচ্ছি, তিনি বাধা দিয়ে বললেন,—ও কি বাবা! তুমি বামুনের ছেলে, আর আমরা কায়েত।—তবুও আমার হাত তাঁর পা স্পর্শ করেছিল।

পাঁচপীরের দরগার বাতিগুলি আজ আর বিভীষিকা দেখায় না; আবেগ ও উচ্ছ্বাসে মনটা ভরে উঠেছে। এত সহজে মানুষ পরকে যে আপন ক'রে নিতে পারে তা ভাবতেও পারিনি। ক্ষেত্রদিদির কথা মনে পড়ে যায়। তিনি বলতেন,—কেউ পর নয় রে! যারা তোকে আপন ক'রে টেনে নেবে জানবি তাদের সঙ্গে তোর নাড়ীর যোগ রয়েছে। মানুষ মরে গেলে তো আবার ফিরে আসে! কেউ বা মরণের ওপারে থেকে যায়, কেউ আবার এপারে আপন জনের কাছে ফিরে আসে।

বুড়ো পিসীমা বলতেন,—যারা মরে গেছে তারা স্বর্গে রয়েছে। তোর বাবা, মা, কচি ভাই সবই একসঙ্গে সেখানে আছে। কোন কষ্ট নেই তাদের। যারা মরে যায় তারা আবার সেখানে তাদের আপন জনের সঙ্গে মিশতে পারে। আমিও একদিন ওদের কাছে চলে যাব। কাজ ফুরোলেই সবাইকে যেতে হবে রে।

ক্ষেত্রদিদি আর পিসীমার কথা মনকে তোলপাড় করে। মনে মনে ভাবি, —এই সুধাংশু, অমল কিংবা সুধাংশুর মা, এঁরা নিশ্চয় আমার পূর্বজন্মের ভুলে যাওয়া সব আপন জন। পরপার থেকে ফিরে এসে এঁরা আমারই জন্য অপেক্ষা করছেন। আগেকার কথা এঁরা সব ভুলে গেছেন, আমিও ভুলে গেছি পূর্বজন্মের কথা!—তা'হলে কি যেখানে যাব সেখানে আমার আপন জনকে দেখতে পাব?

উতলা মন নিয়ে আমার ছোট্ট ঘরে ফিরে আসি। টেবিলের ওপর বইগুলো রেখে বিছানায় শুয়ে পড়ি। নিশীথ রাত্রে সেই পাগলা ফকিরের ডাকে ঘুম ভেঙ্গে যায়। ফকির হেঁকে বলে,—কিরে ব্যাটা! দেখেছিস পীরের খেলা? তোর নামে চেরাগ জ্বেলে দিয়েছি। দে দে, আগুন দে।

ভয় লাগে এ পাগলকে! দরগার রক্ষণাবেক্ষণ করেন বৃদ্ধ এক মুসলমান। সন্ধ্যার একটু আগে তিনি এসে বাতিগুলো জ্বেলে দিয়ে চলে যান। তিনি একদিন আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন,—বাবা, রাত-বিরেতে একা

বের হয়ো না, গভীর রাত্রে আউলিয়া আসেন, ভয় পেয়ো না। দোর খুলে কখনো বের হয়ো না।

হ্যাঁ। এইতো সেই আউলিয়া; দিনের বেলায় কচিৎ তাঁকে দেখতে পাই। নিশ্চয়ই অদৃশ্য হয়ে যায় এ পাগল! আউলিয়ারা তো সিদ্ধ-পুরুষ। তবে এ পাগলামি কেন তাঁর? এঁরা তো অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন; নিশ্চয়ই আমার ওপর তাঁর দয়া হবে। দেখি না তাঁর কাছে গিয়ে।

দরজা খুলে সাহসে ভর ক'রে একটা দেশলাইয়ের বাক্স নিয়ে পাগলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বিকট হাসি তার। হাতে একটা বড় কল্কে। জ্যোৎস্নার আলো পড়েছে তাঁর চোখে মুখে; ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে "বাবাগো!" বলেই তাঁর পায়ের কাছে পড়ে গেলাম।

সেই পাগলা আমাকে কোলের কাছে তুলে বসালে। তারপর মাথায় হাত বুলিয়ে বললে,—ভয় পেলি বাপজান? আমাকে তোর কিসের ভয়?

তখনও আমি কাঁপছি; তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হলাম। জ্যোৎস্না ধারায় যেন দিব্যজ্যোতি ফুটে বের হচ্ছে। তবুও ম্লানহাসি হেসে পাগলা বললে,—সবাই আমায় ভয় পায় রে! তোর ভয় নেই। বল্, কি বলবি বল?

—দয়া ক'রে আমার কষ্ট ঘুচিয়ে দাও পীর-সাহেব!

আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে পাগলা উত্তর দেয়,—তোর দুঃখ খোদা ঘোচাবেন বাবা! সত্যপথে চলবি। কখ্‌খনো নিমকহারামি করবি নি। যা হবার তা হবে।

—তুমি দয়া করলে আমার সব হবে।

পাগল হেসে বললে,—হ্যাঁ আমি দয়া করব। মানুষের জন্যই তো মানুষ রে বাবা! মানুষ কি একা চলতে পারে? খোদা মানুষকে শূন্য হাতে পাঠান এই মানুষের দুনিয়ায়; তারাই তার শূন্য হাত ভরে দেয়। বাপ-মা, ভাই বন্ধু তাদের তো খোদাই তোর জন্য পাঠিয়েছেন।

পাগলার কথা শুনে বিস্মিত হই। এ যে বড় সুন্দর কথা! তাঁর কথা শুনে মনে সাহস পাই। তাঁকে জিজ্ঞেস করি,—তবু মানুষ এত কষ্ট পায় কেন?

পাগলা উত্তর দেয়,—ওসব বুঝবি নে রে! যার কাজ তিনিই এ সব বুঝতে পারেন।

—আচ্ছা, তুমি এ রকম রাত্রে ঘুরে বেড়াও কেন?

—কেন ঘুরে বেড়াই শুনবি?

—হ্যাঁ শুনব। নিশ্চয়ই তুমি তোমার আল্লাকে খোঁজ।

—তাঁকে কি খুঁজতে হয় রে! তিনি যে সব জায়গায় রয়েছেন। এই আকাশ আর ত্বনিয়া জুড়েই তিনি রয়েছেন। তাঁকে খুঁজছি না; আমি খুঁজছি আমার বাপজানকে।

—বাপজানকে খুঁজছ? সে আবার কে?

—আমার ছেলে রে ব্যাটা, আমার ছেলে। তোরই মত তার মুখ-চোখ!

—সে কি হারিয়ে গেছে?

—হ্যাঁ, হারিয়ে গেছে। এ ত্বনিয়ার কোথাও তাকে খুঁজে পাচ্ছি না। আকাশ, মাটি আর জল কোথাও সে নেই। পূব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ কোথাও তাকে খুঁজে পাই নি।

—কি ক'রে সে হারাল?

এবার পাগলা হেসে উঠল। আবেগ ভরে সে বললে,—কি ক'রে হারাল শুনবি! হাকালুকি হাওরে আমার ভরা ডুবেছে রে, আমার ভরা ডুবেছে।

ভীষণ ভয়াল হাকালুকি হাওরের কথা জানি। বর্ষায় তার উত্তাল তরঙ্গ সমুদ্রের বিভীষিকা সৃষ্টি করে; কত নৌকো তলিয়ে যায় তার বুকে। সে সময় নির্মম হয়ে যায় হাকালুকি। আকাশে হঠাৎ মেঘ দেখা দিলে ইষ্ট-নাম স্মরণ করে নৌকার যাত্রীরা। শাহ্‌জা বাদশার দোহাই পাড়ে দাঁড়ি-মাঝি। 'বদর্ বদর্' বলে। হাকালুকির তলদেশে লুকিয়ে আছে কত মানুষ, কতজনের কত প্রিয়জন। তবু সে হাওর পাড়ি দিতে হবে; এ ছাড়া যে ওপারে যাবার উপায় নেই।

পাগলা দরবেশকে জিজ্ঞেস করি,—তোমার ছেলে তা'হলে হাকালুকিতে ডুবে মরেছে?

পাগলা উত্তর দেয়,—হ্যাঁ রে হ্যাঁ। পনের বছর হয়ে গেছে, এখন বেঁচে থাকলে তোরই মত হ'ত দেখতে। শাওন মাসের রাত, আকাশে জ্যোৎস্না ছিল; পরিষ্কার ছিল আকাশ। শুধু দক্ষিণের ওই কোনটায় এক কালি কালো মেঘ দেখা দিয়েছিল। আমার সোনাজান আর তার মা ছিল নৌকোয়। সোনাজানের মামার বাড়ি থেকে ফিরছি। ছোট্ট নৌকো।

দাঁড়ি মাঝি আমিই নিজে। কতবার এই ভয়াল হাকালুকি আল্লার নাম ক'রে পাড়ি দিয়েছি, ভয় করিনি। মাঝ-দরিয়ায় পৌঁছতে না পৌঁছতে এই এক ফালি মেঘ কি ক'রে যে সারা আকাশ ছেয়ে ফেলল বুঝতে পারিনি। তারপর উঠল ঝড় আর তার সঙ্গে ঢেউ। নৌকো সামলাতে পারিনি। সোনাজান আর তার মা আমায় জাপটে ধরলে। একজনকে পিঠে আর একজনকে বগলে ধরে ঢেউয়ের সঙ্গে কতক্ষণ যে লড়াই করেছি জানিনে। পরের দিন সুলতানপুরের জঙ্গায় নাকি আমাকে অচেতন অবস্থায় পেয়েছিল সেখানকার লোকেরা।

—তারপর কি হ'ল সোনাজান আর তার মার ?

—তাদের পাইনি রে। দু'চারদিন আমার হুঁশই ছিল না। তারপর চাঙ্গা হয়ে ওঠামাত্রই সব কথা মনে পড়ল। আমার বাপজান সোনাজানকে ডেকে ডেকে ছুটলাম হাকালুকির দিকে। কেউ আমাকে ধরে রাখতে পারেনি। পাগল হয়ে ছুটেছি রে বাবা! কত দিন, কত বছর তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

—তাদের আর পাওয়া গেল না ? আর বাড়ি ফিরে যাওনি ?

—গেছি রে বাবা, সব জায়গায় গেছি। হাকালুকির বুকে ডুব দিয়ে দেখেছি। চষে বেড়িয়েছি হাকালুকির চারধার।

পাগলা আউলিয়ার কথা শুনে কষ্ট হয়। তাকে বললাম, এতদিনের মধ্যে তাঁদের একজনেরও কোন খোঁজ-খবর পাওনি ?

—না, পাইনি। বাড়ি-ঘর সব শূন্য। দুনিয়াটাই আমার কাছে শূন্য হয়ে গেল। ভাবলাম, নিশ্চয়ই তারা কোথাও ভেসে গিয়ে উঠেছে; তাদের খুঁজে বার করতে হবে। তাই গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াই। কাপড়-জামা ছিঁড়ে গেল, চুল-দাড়ি লম্বা হয়ে গেল। লোকে ভাবে পাগল। কেউ ভাবে ফকির, কেউ ভাবে আউলিয়া। জামা দেয়, কাপড় দেয়; ভক্তি ক'রে খাবার দেয়। সব বিলিয়ে দিই রে বাবা! এদেশের আনাচে-কানাচে যত গাঁ আছে, যেখানে যত ছেলে-মেয়ে আছে তাদের সবার মাঝে তাকে খুঁজে বেড়িয়েছি। কত বছর হয়ে গেছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। আজ হঠাৎ তোর মুখ দেখে মনে হ'ল, পনের-ষোল বছর আগে তুই যেমনটি ছিলি আমার সোনাজানও সে সময় তেমনটিই ছিল।

—বুঝেছি, ছেলের জন্য তুমি আউলিয়া হয়ে গেছো।

—না, না, আমি আউলিয়া নই রে বাবা। আমার বাপজান আমাকে আউলিয়া ক'রে গেছে।

—তা'হলে মিছিমিছি এ রকম ঘুরে বেড়াও কেন ? নিজের বাড়ি-ঘরে ফিরে যাও।

—কোথায় ফিরব রে বাবা ! বাড়ি-ঘর কি আর আছে ? এই দুনিয়া আমার বাড়ি-ঘর হয়ে উঠেছে ; আজ কেউ আমার পর নয়।

—তবু এ রকম ক'রে ঘুরে বেড়িয়ে লাভ কি ?

—লাভ আছে রে বাবা ! যাকে হারিয়েছি তাকে এখন দুনিয়ার মাঝে দেখতে শিখেছি। ঘর-বাড়ি বেঁধে আবার গণ্ডীর মধ্যে ঢুকলে তো তাকে আর দেখতে পেতাম না।

—কেন, সবাই তো ঘর-বাড়ি বেঁধে সুখে আছে !

আমিও সুখে ছিলাম রে বাবা। কিন্তু—নিজের যারা তাদেরই কেবল আপন ভাবতাম। আমার বাপজানকে তারই খেলার সাথী ইদ্রিস ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল একদিন ; তার কপাল ফেটে গিয়েছিল। ছেলের রক্ত দেখে আমি বেহুঁশ হয়ে ইদ্রিসকে এক আছাড় মেরেছিলাম। ইদ্রিস বেচারী তারপর সাতদিনও বাঁচেনি রে বাবা। তারই পাপ আমার লেগেছে। আমার সোনাজান তাকে বড় ভালবাসত ; ছুটে যেত তার গোরস্তানে।

পাগলার চোখ দিয়ে দর্‌দর্‌ ক'রে ধারা নামল। তারপর সে বললে,—ঘর বাঁধলে মানুষ বড় স্বার্থপর হয়ে ওঠে রে ! আপন-পর ভেদ করে। বড় ছোট হ'য়ে যায় তার নজর। হাকালুকির রাক্ষুসে ঢেউ আমার ছোট্ট ঘর ভেঙ্গে দিয়ে গেছে ! আর কি আমি ঘর বাঁধতে পারি ?

—তবু এই পাগলের মত পথে পথে ঘুরে বেড়ানো কি ভাল ? শরীর ক'দিন এ অত্যাচার সইবে ?

—সইবে রে বাপজান ! শরীরের নাম মহাশয়, যা সহাবে তাই সয়। কাক-চিল, গোরু-ঘোড়া তারা তো সবাই সইছে। আমরাও একদিন বনে-জঙ্গলে এমনি ঘুরে বেড়িয়েছি। আজ না হয় কাপড়-চোপড় পরে মিঞা-সাহেব ভদ্রলোক হয়েছি।

—শরীর খারাপ হ'লে তোমায় কে দেখবে ?

—কে আর দেখবে ! জানিস তো লোকে আমাকে আউলিয়া মনে করে। আমার আবার ভাবনা !

—তবু, তবু—কষ্ট হবে তো?

পাগলা হেসে বললে,—কেউ দেখবে না? যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মরে যাব? তাতে ভয় কি রে? আমার বাপজান তো জলের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে মরে গেছে ছটফট ক'রে।

বুঝলাম, এ প্রসঙ্গ না তোলাই ভাল। পাগলা দরবেশকে তখন আমার নিতান্ত আপনার জন বলে মনে হ'ল। তাকে বললাম,—আচ্ছা দিনের বেলা তুমি থাক কোথায়?

—টিলাগড়ের জঙ্গলে! জঙ্গলা মানুষ আছে সেখানে। লুকিয়ে থাকি তাদের মাঝে! দিনের বেলায় বের হবার উপায় নেই বাপজান! আমার দয়া কুড়োবার জন্য কাড়াকাড়ি করে যত সব হতচ্ছাড়ারা। তাই তো লুকিয়ে থাকি। রাতের বেলা এখানে আসি। বড় ভাল জায়গা পাঁচপীরের এই দরগা। এর চেরাগের আলোতে যেন আমার সোনাজানের মুখ দেখতে পাই।

পাগলা তার ঝুড়ির ভেতর থেকে মুঠোমুঠো কিসমিস বের ক'রে আমার আঁচলে দিয়ে বললে,—যাও বাবা ঘুমোও গে। তোমার কোন ভয় নেই। আকাশ আর মাটিকে অবহেলা কোরো না। জল আর আগুন দিতে কোনদিন কৃপণ হয়ো না। এগিয়ে যাও, আপন জন তোমার আছে পথে-পথেই।

আউলিয়ার সেই স্নেহের দান অবহেলা করতে পারিনি। আজও কিসমিস দেখলেই সেই আউলিয়ার কথা মনে পড়ে। আজ মনে হয়, ছেলে-পাগল হলেও সত্যিই সে আউলিয়া হয়েছিল, সত্যিকার পথের সন্ধান পেয়েছিল সে। তাঁর স্নেহশীতল 'বাপজান' ডাক আজও যেন শুনতে পাই।

পরের দিন ভোরবেলা।

—বলহরি—হরি বোল—

বীভৎস চীৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। শ্মশানে মড়া নিয়ে যাচ্ছে। এ অবশ্য কিছু নতুন নয়; কিন্তু দরজা খুলে বের হয়ে বিমূঢ় হয়ে গেলাম। এ কি এ!—জীবন পরামানিক খই ছড়াতে ছড়াতে মরার আগে আগে চলেছে। পিছনে শববাহী এপাড়ারই কয়েকজন। এগিয়ে গেলাম। এ কি, খাটিয়ার ওপর কে ও? কার ও মুখ?—চন্দ্রাদি! চন্দ্রা!

চন্দ্রাদির সঙ্গে আমার পরিচয় বড় আকস্মিক, তার ইতিহাসটাও বিচিত্র। এই জীবন পরামানিকই চন্দ্রাদির স্বামী। পিশাচটা তিলে তিলে তাকে মেরেছে। না, না, চন্দ্রাদি আত্মহত্যা করেছে! মনে হ'ল সমস্ত ইতিহাসটা আমি জানি কিন্তু বলবার উপায় নেই। বললেও কেউ শুনবে না। আজ চন্দ্রার শবদেহটা যারা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তারাও নর-পিশাচ জীবনেরই সহচর। জীবন আমার দিকে তাকিয়ে গদগদ স্বরে বললে,—দা'ঠাকুর, মরবার আগে কতবার যে তোমার নাম ক'রে ডেকেছিল কিন্তু তোমার পাত্তাই পাইনি ক'দিন।

জীবনের কথার উত্তর না দিয়ে ঘরের দিকে ফিরলাম; ওরা এগিয়ে চলল নদীর দিকে। মনে পড়ল দু'বছরের বিচিত্র ইতিহাস। দীঘির ঘাটেই চন্দ্রাদির সঙ্গে পরিচয়। মজা সেই দীঘি। নাম তার জল্লা। জল্লার পাড়েই পাঁচপীরের দরগা। অজস্র জারমান পানায় দীঘিটা ছেয়ে গেছে। আশে-পাশে আবার কলমীলতারও দাম রয়েছে। তবুও জল্লার এ পাশটায় কিছু কিছু জল থাকে। দু'একটি ঘাটও রয়েছে তার। শহরের এদিকটা পাড়া-গাঁয়ের মতই দেখতে, জল্লার ওপারে বন-বাদাড়ে রাত্রে শিয়ালও ডাকে।

জল্লার ঘাটে বাসন মাজে একটি বধূ। রোজই তাকে দেখি। বেশ স্বাস্থ্য-বতী বলে মনে হয়। তার শ্যামল নিটোল হাতের দিকে তাকিয়ে দেখি রূপোর দু'গাছি ক'রে চুড়ি আর শাঁখা প্রভাতী সূর্যের কিরণে ঝলমল ক'রে ওঠে। ঘোমটার আড়ালে মুখটা ঠিক দেখতে পাইনে। তার বয়সও ঠিক আন্দাজ করতে পারিনে। তবু মনে হয় আমার চাইতে বয়সে কিছু বড়ই হবে।

আমাকেও ঘাটে গিয়ে নিজের থালা বাসন মেজে নিয়ে আসতে হয়। গাছের পাতা আর বালি দিয়ে একটু ঘসেই আমি বাড়ি ফিরি। একদিন কড়াটা মাজতে গেছি; কিছুতেই তার তেল আর কালি ওঠে না। আমার হাতে কালি যেন আরো বেশী লেপ্‌টে যাচ্ছে। আধ ঘণ্টা ধ্বস্তাধ্বস্তি ক'রেও কিছু করতে পারলাম না। বধূটি হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে বললে,—ও ভাই, ও কি করছ? তোমার মুখে যে কালি লেগে যাচ্ছে।

—কই কোথায়?

তার কথা শুনে সচকিত হয়ে বাঁ হাতে মুখটা মুছি। তারপর হাতটা চোখের সামনে পরখ ক'রে দেখি। সংকোচ ও লজ্জায় মরে যাই,—এ কি আমার হাতে যে কালি!

বধূটি বললে,—ও তোমার কাজ নয় ভাই! দাও তো কড়াটা।

এগিয়ে এসে আমার হাত থেকে সেই কড়াটা কেড়ে নিয়ে মাজতে বসল সেই বধূ। তারপর বললে,—যাও সাবান নিয়ে এসে হাত-মুখ ধুয়ে ফেলগে।

তাঁর আচরণে বিস্মিত হই। আমার মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল 'দিদি'। না, না, আমি নিজে পারব, তোমার কষ্ট করতে হবে না।

আমার সেই হঠাৎ ডাকা নতুন দিদি বললে,—লক্ষ্মী ভাই! যাও হাত-মুখ ধুয়ে ফেলগে, আমি তোমার বাসনগুলো মেজে দেব।

বধূটি আমার মুখের দিকে তাকাল। এবার তাকে আন্দাজে চিনতে পারলাম। তার সে ডাগর আয়ত চোখে কি স্নেহ-কোমল দৃষ্টি! ছলছল তার চোখ। কিন্তু একি? মুখের দু'তিন জায়গায় কালসিটে পড়ে গেছে; ডান-দিকের কপালের কোণটা যেন ফুলে উঠেছে; চিরে গেছে সে জায়গাটা। শিউরে উঠলাম তাঁর মুখ দেখে।

তা'হলে যা শুনি তা ভূতের কান্না নয়! জীবন পরামানিক বৌটাকে মারধোর করে।

জীবনকে দেখলে ভাল মানুষ বলে মনে হ'ত না। তার সম্বন্ধে মদন ময়রা কত কথা বলে। বিশ্বাস করিনি সে সব কথা। জীবনই আমার চুল-দাড়ি ছাঁটে; সে প্রায়ই আমাকে বলে,—দা'ঠাকুর, পাঁচ-পীরের তলায় থাকো, রাত বিরেতে বের হয়ো না। ভূতেরা সব হল্লা করে। রোজ ভূতের কান্না শুনতে পাওনা?

কতদিন সে কান্না শুনেছি; কোন কিছুই ঠাহর করতে পারিনি। শুধু কান্না—বুক ফাটা চাপা কান্না—কোন অসহায় নারীর মর্মভেদী স্বর;—কোন্ নারী? কান্না শুনে কোন কোন দিন ঘুম ভেঙ্গে যেত। কান খাড়া ক'রে থাকতাম; কোন্ দিক থেকে আওয়াজটা আসে শোনবার চেষ্টা করি। ঝিঁঝিঁর ডাক আর দরগার বটগাছের ওপর শকুন ও হুতুম পেঁচার বিকট আওয়াজ সব গুলিয়ে দেয়, বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। মনে মনে ক্ষেত্রদিদির সেই কনক-চাঁপাতলার বেদীকে স্মরণ করি।

বধূটিকে বললাম,—দিদি তুমি কি পড়ে গেছলে?

—না, না,; সে তোমার শুনে কাজ নেই।

—তুমি কি রোজ রাত্রে কাঁদ?

শঙ্কা ও সঙ্কোচে সে যেন বিব্রত হয়ে উঠল। আমাকে বললে,—যাও ভাই, হাত-মুখ ধুয়ে নাও; তোমার কড়াটা হয়ে গেছে।

আমি বললাম,—জানি; কিন্তু প্রায় রাত্রেই আমি তোমার কান্না শুনি।

—কি ক'রে জানলে?

—এই তো তোমার চোখে মুখে দাগ রয়েছে। তা'হলে মদন ময়রা সত্যি কথাই বলে।

—লক্ষী ভাইটি, ওসব কথা আর তুলো না। বড় জ্বালায় পুড়ে মরছি আমি!

কিসের জ্বালা তার বুঝতে পারিনে। কিন্তু এটুকু বুঝি যে তার স্বামী নির্যাতন করে। অমানুষিক সে নির্যাতন! মনে মনে প্রশ্ন জাগে,—লোকটা কি পশু? বধূটি কেন বাপের বাড়ি চলে যায় না? বাপের বাড়ি থাকলেই বা কি?—হয়ত কোন্ দূর পাড়াগাঁয়ে তাদের ঘর! বধূ-বেশে কেঁদে-কেটে একদিন পাল্কি চেপে স্বামীর ঘরে এসেছে। কে-ই বা খবর নেয়? ছোটবেলা থেকেই এরকম কন্যা-বিদায় দেখে আসছি। এই নির্যাতিতা বধূর প্রতি আমার মন সহানুভূতিতে পূর্ণ হয়ে উঠল। তাকে বড় নিঃসহায় ভেবে আপন জন মনে ক'রে নিলাম। কি মধুর তার কথাবার্তা! এরকম মেয়েকে কি দোষে জীবন মার-ধোর করে? থানা-পুলিস কি করতে রয়েছে? শহরে তো কত উকিল-মোক্তার রয়েছে! তারা কি এসব দেখতে পায় না? স্বামী হয়েছে বলেই কি একটা অসহায় মেয়ের ওপর অত্যাচার করবে?

বধূটিকে বললাম,—দেখ দিদি, বুঝেছি তুমি আমায় বলবে না। বেশ, আমি জীবনদার সঙ্গে বোঝাপড়া করব।

সে বিবর্ণ মুখে আঁৎকে উঠে বললে,—না ভাই! তোমায় কিছুই করতে হবে না। তাতে হিতে বিপরীত হবে।

—কেন? কেন? শহরে কি থানা-পুলিস নেই? ম্যাজিষ্ট্রেট অভয়-বাবুর মেয়েকে আমি পড়াই। তাঁকে বলেই আমি এর একটা বিহিত করব।

এবার বধূটি বললে—দোহাই লক্ষীটি! অমন কাজ তুমি কোরো না। ওরা কেউ তোমার কথা শুনবে না।

—বেশ, কিন্তু মনে রেখ এ আমি কিছুতেই হ'তে দেব না!

—হ্যাঁ, আমার যেটুকু আশ্রয় আছে তাও তোমার জন্যে যাবে!

বধূটির মুখে বিষাদের হাসি ফুটে ওঠে। দারুণ উত্তেজনায় ছট্‌ফট্ করতে থাকি। ঘরে ফিরে এসেও ছট্‌ফট্ করি।—তা'হলে দেখছি এর কোন

প্রতিকার নেই। এরা যদি মুখ ফুটে না বলে কে এর প্রতিকার করবে? থানা-পুলিসের দোষ কি? নিজের দোষেই এরা চিরদিন মার খেয়ে আসছে। ছিঃ! ছিঃ! জীবন পরামানিকের মত নিষ্ঠুর লোকেরা তাতে প্রশ্রয় পেয়ে যাচ্ছে। জীবনকে সবাই খাতির করে। উকিল, দারোগার বাড়িতেও তার বেশ খাতির। সেদিন তো শুনলাম যামিনী উকিলের বিধবা মেয়েটিকে সে নাকি ঝাড়-ফুঁক দিয়ে ভাল করেছে। জীবন ওষুধ-পত্রও দেয়। কিসের ওষুধ? শহর-জোড়া এত ডাক্তার-কবরেজ থাকতে জীবন পরামানিকের ডাক পড়ে কেন? জীবনের বাড়িতে এত লোকজনই বা কেন যায়? জীবন পরামানিক কি ডাক্তার?

বধূটির অনুরোধ আমার কৌতুহল আরো বাড়িয়ে দিল। তার ছলছল চোখ দুটি কিছুতেই ভুলতে পারিনে। নিশ্চয়ই এর কোন হেতু আছে। ভয় কি তার? মনে মনে জীবনকে জব্দ করবার ফন্দী আঁটতে লাগলাম।

কয়েকদিন কেটে গেল। ঘাটের সেই পাতানোদিদির সঙ্গে আমার এক মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠল; এমন কি জীবন পরামানিকও আমাকে বেশ খাতির যত্ন করতে লাগল। তার ওপর প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছেটাও প্রায় নিভে এল। দিদিটি সেদিন থেকে আমার শ্রম অনেকখানি লাঘব ক'রে দিল। মাঝে মাঝে আমার ঘরেও সে যাতায়াত করতে শুরু ক'রে দিলে। সবই গুছিয়ে দিয়ে যেত সে দিদি। আমার রান্না-বান্নার উপকরণের দৈন্যও তার কৃপায় অনেকটা দূর হ'ল। জীবনও আসে। মাছটা, তরকারিটা দিয়ে যায়। দিদির লাঞ্ছনাও মনে হ'ল অনেকখানি কমে গেছে।

তবুও সেই পরামানিক-বধূর জীবন-রহস্য জানবার একটা কৌতুহল জেগে রইল। তাকে কত দিন কত ভাবে জিজ্ঞেস ক'রেও কোন উত্তর পাইনি। রাত্রে কান খাড়া ক'রে থাকতাম,—যদি ভূতের কান্না শোনা যায়! দু'এক দিন শুনতেও পেলাম। দিদি একদিন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে জল্লার ঘাটে বাসন মাজতে এল। তাকে সেদিন বললাম,—নিশ্চয়ই জীবনদা তোমায় মারধোর করেছে।

দিদি বললে,—দেখ ভাই! তুমি ওসব কথা আর আমায় কোনদিন জিজ্ঞেস কোরো না।

অভিমানের সুরে বললাম,—বেশ তাই হবে। কিন্তু কেন তুমি এসব সইছ দিদি ?

সে উত্তর দিলে,—কর্মের ফল ভাই ! আমার জন্মটাই এক অভিশাপ।

বেশী কথা হল না ; দিদি চোখের জল ফেলতে ফেলতে চলে গেল। ওদের কথা কিছুই বুঝতে পারিনে। কাকেই বা জিজ্ঞেস করি ? আশেপাশে যারা থাকে, তাদেরও ভাল মানুষ বলে মনে হয় না। ওই পাড়ায় শুনেছি যত মাতালের আড্ডা জমে রাত্রে। কাছেই মদন ময়রার দোকান সদর রাস্তার ওপরে। মদন অবশ্য অনেক দিন অনেক কথা বলেছে। দেখলাম, বধূটি যে আমার কাছে আসে, তা তার চোখ এড়ায় নি।

মদন বললে,—দা'ঠাকুর ! তুমি ছেলেমানুষ। কোন্ দিন শেষে বিপদে পড়বে। জীবন লোকটা সুবিধের নয়।

আমি বললাম;—কেন কি হয়েছে ? জীবনদা আমাকে বেশ ভালবাসে।

মদন উত্তর দেয়,—বলেছি তো জীবনের খপ্পরে পড়লে তোমার এখানে থাকা কঠিন হয়ে উঠবে। কষ্ট ক'রে লেখাপড়া করছ ; সবই ঘুচিয়ে দিতে পারে জীবন পরামানিক।

আমি হেসে বললাম,—আমার সঙ্গে তো তার ঝগড়া বিবাদ নেই। শুধু শুধু জীবনদা আমার পেছনে লাগবে কেন ?

মদন সহাস্যে উত্তর দেয়,—এই তো মজা দা'ঠাকুর ! জীবনের মতলব তুমি কি বুঝবে ? সে বউটাকে মার-ধোর করে। কারো বাড়ি যেতে দেয় না ; কারো সঙ্গে কথা বলবার জোটি নেই। তবু তোমার ঘরে যায়, তোমার কাজ ক'রে দেয়। জীবনও তোমার সঙ্গে বেশ ভাব ক'রে নিয়েছে ; নিশ্চয়ই তার কোন মতলব রয়েছে।

আমি বললাম,—এর ভিতর কি মতলব থাকতে পারে মদনদা !

মদন বললে,—জীবনের মত পাজি লোক যখন ভালমানুষ সাজে, তখন তার একটা কিছু মতলব রয়েছে বৈকি ? বউটা তোমায় ভালবাসে। তোমারও দরদ রয়েছে। কি জানি কখন ছেলেমানুষি ক'রে সব কথা কোথাও ফাঁস ক'রে দাও, তাই এখন ভালমানুষ সেজেছে।

আমি উত্তর দেই,—আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না মদনদা ! আরো দু'চারদিন দেখি, অযথা বউটার ওপর এ অত্যাচার কেউ সহ্য করতে পারে না। তুমিই দেখ না !

মদন বললে,—ওরে বাপ রে! এক দিনে আমার দোকান-পাট লোপাট ক'রে দেবে। জীবনের পেছনে লাগবার সাহস কেউ করবে না।

—কেন? সরকারী উকিল বরদাবাবুকে বললেই জীবন টিট হয়ে যাবে।

আমার কথা শুনে মদন হো-হো ক'রে হেসে বললে,—কোন ফল হবে না দা'ঠাকুর, তাঁরাই তোমায় চুপ ক'রে থাকতে বলবেন। জীবনের হাতে যে অনেক ভদ্রঘরেরও চাবি-কাঠি রয়েছে!

—চাবি-কাঠি? কিসের চাবি-কাঠি?

—কেলেঙ্কারির চাবি-কাঠি দা'ঠাকুর! তুমি ছেলেমানুষ, ওসব তুমি বুঝবে না।

—কেন বুঝব না? জীবন বুঝি লোকের কুৎসা রটায়?

—না দা'ঠাকুর! জীবন কেলেঙ্কারির হাত থেকে লোককে বাঁচিয়ে দেয়। জীবন মানুষের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। মহা পাপী, আর পাষণ্ড সে।

—কি আশ্চর্য? সে লোকের উপকার করে অথচ বলছ সে পাপী, সে পাষণ্ড। তোমার কথা বুঝতে পারছি নে।

—তোমাকে বুঝোতে পারব না দা'ঠাকুর! বুঝেও তোমার কাজ নেই। সমাজে চলতে গেলে লুকিয়ে অনেক অপকর্মও চাপা দিতে হয়। সে তুমি বুঝবে না। তার জন্য মহাপাতক করে লোকে; প্রাণে মারে, নিষ্ঠুর হয়ে শিশুরও গলা টিপে মারে।

—গলা টিপে মারে? কই, কোনদিন তো এমন কথা শুনিনি। ডাকাতেরাই শুনেছি এরকম করে।

—না, না, কেলেঙ্কারির ভয়ে লোকে অনেক সময় এ কাজ করতে বাধ্য হয়। সমাজে বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে হলে অনেক সময় এরকম কেলেঙ্কারি চাপা দিতে হয়।

—কি বলছ মদনদা? আমি যে বুঝতে পারছি নে।

—তোমায় কি বুঝোব দা'ঠাকুর? সত্যিকারের খুন কেউ করে না। জীবন পরামানিক নানা রকম ওষুধ জানে। তাই যারাই বিপদে পড়ে, তারাই তার শরণ নেয়। একজনকে মারতে গিয়ে দু'জনকেও কখন কখন মেরে ফেলে সে। ওই তো সেদিন অবনী মোক্তারের বিধবা বোনটা মারা গেল।

—জীবন তার কি করেছে মদনদা? বড় ডাক্তারই তাকে দেখছিল।

—সব ধোঁকা দা'ঠাকুর, সব ধোঁকা!

—কেন? জীবন তো শুনেছি, অনেক টোটকা ওষুধ জানে; তাতে লোকের উপকার হয়।

—হ্যাঁ, উপকার হয় বৈকি! ঘরের কেলেঙ্কারি চাপা পড়ে!

মদন ময়রার কথা আমাকে ভাবিয়ে তুললে। তা'হলে কোন উপায়ই নেই? জীবন যা খুশি তাই করতে পারে। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে মদন বললে,—দা'ঠাকুর! ভাবছ কি? তোমাদের কাঁচা বয়েস; মনও কাঁচা। লোকের কষ্ট দেখলে প্রাণও কাঁদবে, ছুটে যাবে তাকে বাঁচাতে। কিন্তু কি করবে বল?

—কি করব মদনদা?

—দরকার কি বাপু ওসব চিন্তার? বউটার জন্যে কষ্ট হয়, কিন্তু চন্দ্রার মা-ই এ সর্বনাশ ক'রে গেছে।

—কে? কে চন্দ্রা?

—পরামানিকের বউ গো! তোমার সেই পাতানো দিদি।

—তার মা? তার মা কি করেছে মদনদা?

—সে-ই সর্বনাশ ক'রে গেছে। ওসব বিদ্যে তো চন্দ্রার মায়েরই। জীবন কোথা থেকে এসে জুটে গেল। কত তোষামোদ করেছে সে চন্দ্রার মায়ের। পা পর্যন্ত টিপে দিত। চন্দ্রার মাকে 'মা' বলতে অজ্ঞান হয়ে যেতে জীবন! তার চাতুরীতে ভুলে চন্দ্রার মা তারই হাতে মেয়েটাকে সঁপে দিয়ে গেছে। আর তার বিয়েও দিয়ে গেছে ওই জীবনকে।

—ওঃ বুঝেছি। কিন্তু জীবন ছাড়া কি অন্য পাত্র জোটেনি?

—কি ক'রে জুটবে? চন্দ্রার মায়ের স্বভাব চরিত্তির ভাল ছিল না। ঘর থেকে বেরিয়ে আসা মেয়েছেলে। তার মেয়েকে কে বিয়ে করবে দা'ঠাকুর? চন্দ্রা তো জীবনের বিয়ে করা বউ নয়।

মদনের কথা আমার মর্মস্থলে আঘাত করল। চন্দ্রা জীবনের বিয়ে করা বউ নয়! তার মা ঘর থেকে বেরিয়ে আসা মেয়েছেলে! ছিঃ, ছিঃ! এদের ছায়া মাড়ালেও যে পাপ! বিদ্রোহী হয়ে ওঠে মন! পতিতার মেয়ে চন্দ্রাদি। ছিঃ, ছিঃ! সে আমার ঘরে আসে!

মদন বললে,—এখন বুঝলে দা'ঠাকুর। ব্যাপারটা কি? তবু মায়া হয়, মেয়েটির কি দোষ বল? বড় ভাল মেয়ে চন্দ্রা। ছোটবেলা থেকে তাকে দেখছি; তার কোন দোষ নেই। এই বাড়ি-ঘর সবই তার মায়ের। নিজের ঘরেই সে আজ ঝি-বাঁদীর অধম হয়ে রয়েছে।

চন্দ্রার প্রতি আবার সহানুভূতি জেগে উঠল! নিশ্চয়ই, তার কি দোষ? তার মা কেন কি কারণে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল; তার শাস্তি কি নির্দোষ মেয়েকে পেতে হবে? পতিতার মেয়ে বলেই কি তার এই লাঞ্ছনা? এরা কি মানুষ নয়?

মদনকে বললাম,—জীবন তা'হলে মহা পাষণ্ড।

সে উত্তর দেয়,—হ্যাঁ মেয়েটাকে সরিয়ে দিতে পারলেই তার সব হয়ে যায়।

আমি বললাম,—তাই বুঝি এরকম মার-ধোর করে?

মদন বললে,—হ্যাঁ! সন্দেহপিশাচ জীবন। মেয়েটাকে বিশ্বাস করে না। আর চায়, অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সে পালিয়ে যাক; না হয় আত্মঘাতী হোক। ছিঃ, ছিঃ!

মদনকে বললাম,—তার মরণই ভাল মদনদা! হাতে-মুখে কালসিটে পড়ে গেছে। কাটার দাগও আছে গায়ে।

মদন বললে,—যাক্ দা'ঠাকুর! তুমি সাবধানে থেকো। কাজ কি বাপু ওসব ঝামেলায়? কপালের লিখন খণ্ডাবে কে?

চন্দ্রার প্রতি সহানুভূতি জাগলেও মদনের কথায় আতঙ্কই বেড়ে গেল। ভাবলাম এদের যা স্বভাব চরিত্র, আমার পক্ষে সাবধানে থাকাই ভাল। আর চন্দ্রা? সে তো পতিতার মেয়ে! এসব মেয়ের সংস্রবে থাকা বিপজ্জনক। সাপ কক্ষনো ছোবল মারতে ছাড়বে না। সত্যিই জীবন ফাঁদ পেতেছে।

মদনকে বললাম,—ঠিক বলেছ মদনদা! এদের এড়িয়েই থাকব।

মদন বললে,—বেশ! বেশ! তাই করো দা'ঠাকুর।

সন্ধ্যার সময় চন্দ্রাদি এসেছে। আজ আর তার হাব-ভাব ভাল লাগল না। পরনে তার গঙ্গা-যমুনা শাড়ী; কপালে সিঁদুরের টিপ জ্বল জ্বল করছে। বাটি ক'রে ঘন দুধ আর থালা ক'রে মিষ্টি নিয়ে এসেছে চন্দ্রাদি। টেবিলের

ওপর এগুলো রেখে চন্দ্রাদি আমার সামনে দাঁড়িয়ে বললে,—ভাই! এগুলো তোমার দাদা পাঠিয়ে দিলে।

—দাদা পাঠিয়ে দিলে?

—হ্যাঁ। ঘরে তৈরী খাবার; তোমার জন্যেই তৈরী হয়েছে।

চন্দ্রাদির সঙ্গে সহজভাবে কথা বলতেও আজ সংকোচ আসতে লাগল। সহানুভূতির বদলে অজানা আতঙ্ক ও বিরক্তি এসে আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলল। তাকে বললাম,—চন্দ্রাদি! তুমি এগুলো নিয়ে যাও! তোমার ভালবাসা ভুলতে পারব না, কিন্তু তুমি আর আমার কাছে এসো না।

আমার গলার স্বর হঠাৎ ভারি হয়ে উঠল। চন্দ্রাদি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মুখে হাসি টেনে বললে,—কেন? কেন এ কথা বলছ ভাই?

—তোমার—তোমাদের মতলব কি জানিনে, কিন্তু আমায় আর জড়িয়ে ফেলো না চন্দ্রাদি! তুমি আর এসো না। জীবনদা' এসব ভাল চোখে দেখে না।

চন্দ্রাদি বাইরের দিকে একবার উঁকিঝুঁকি মেরে দেখে আমার কানের কাছে মুখ এনে চুপিচুপি বললে,—জানি সে কথা। সে তোমাকে যে ভালবাসা দেখায় তা ভান। তুমি সাবধানে থেকো। এ দুধ-মিষ্টি খেয়ো না।

—কেন? ওতে এত কি বিষ মিশিয়েছে?

—তা জানিনে। তবু বলছি, ওর দেওয়া খাবার তুমি খেয়ো না; লুকিয়ে ফেলে দিও।

—জেনেশুনে তুমি এসব নিয়ে এলে চন্দ্রাদি!

—আমার নামও জেনে ফেলেছ দেখছি! যাক্, না নিয়ে এ'লে উপায় নেই। তুমি তো সবই জানো ভাই!

—জানি। আরো অনেক কিছু জেনে ফেলেছি চন্দ্রাদি!

—অনেক কিছু? তা'হলে আর কিছু বাকী নেই?

—না। তুমি আর আমার কাছে এসো না চন্দ্রাদি!

—কেন? ভয় পেয়ে গেছো? আমাদের মত মেয়েদের সংস্রব এড়িয়ে থাকতে চাও?

—হ্যাঁ। সব কথা তুমি আমায় লুকিয়েছো; কোনদিন কোন-কিছুই বল নি।

—আমাদের যে সবই লুকোনো ভাই! লুকিয়ে লুকিয়ে মার খেতেই আমাদের জন্ম।

—থাক চন্দ্রাদি! এসব কথা শুনিয়ে কাজ নেই। তুমি আর আমার কাছে এসো না,—এ কথা বলতেও কষ্ট হয়; কিন্তু এছাড়া আর কোন উপায় নেই।

—তোমার বিপদ-আপদ ঘটে, এটাও আমি চাইনে। তাই এ কথাটা বলবার জন্তে তোমার কাছে শেষবারের মত এসেছি ভাই!

—তোমায় দেখলেও কষ্ট হয় চন্দ্রাদি! জীবন তোমাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে।

—কি করবে বল?

—আমায় শুধু একটা কথা বলে যাও চন্দ্রাদি! সত্যিই কি জীবনের ফাঁদে ফেলবার জন্তেই তুমি আমার কাছে যাওয়া-আসা করছ?

—না। তার ফাঁদে কাউকে ফেলতে চাইনে বলেই আমার এ দুর্গতি।

চন্দ্রাদি ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগল। গভীর উত্তেজনা তার চোখে-মুখে ফুটে উঠল। সে অবস্থায় আমার দু'খানি হাত ধরে চন্দ্রাদি বললে—এখান থেকে সরে যেও; তুমি তার পেছনে লেগেছ এ কথা সে জানতে পেরেছে। লক্ষ্মী ভাইটি! দিদিকে মনে রেখো!

ঝরঝর ক'রে তার চোখের জল ঝরতে লাগল; চন্দ্রাদি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। এমন সময় হঠাৎ জীবন পরামানিকের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল—দাদাভাই! দুধ-মিষ্টিটা খেয়ো। তোমার দিদিকে শীগগির পাঠিয়ে দাও।

দিদি শশব্যস্তে চোখ মুছে বের হয়ে গেল। নিশ্চল ও হতবাক আমি চন্দ্রাদির কথা ভাবতে লাগলাম। হায় অসহায়া নারী!

তারপর একেবারে আজ পনেরো কুড়ি দিনের পর তাকে দেখতে পেলাম, পরপারের যাত্রাপথে—কোথায়—কোথায় সে? তার সকল যন্ত্রণার অবসান কি হয়েছে? সে কি পাপী? শুনেছি,—পাপীরা অশেষ নরক যন্ত্রণা ভোগ করে, ভূত প্রেত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। পতিতার মেয়ে চন্দ্রা,—তার মাও মহাপাপী! মহাপাপীর মেয়ে কি পরলোকে শান্তি পাবে? আচ্ছা, পতিতার ঘরে জন্ম হয়েছে বলে কি সে-ও পতিতা? তার মধ্যে কি সতীত্ব থাকতে পারে না? সতীত্ব জিনিসটা কি? বেঁধে-ধরে কারো সঙ্গে বিয়ে দিলে

তার অত্যাচার সহ্য করা? এই কি সতীত্ব? স্বামী যদি তাকে কুপথে ঠেলে দেয়,—নিজের স্বার্থের জন্য মূল্য নিয়ে তাকে কুপথে ঠেলে, অত্যাচারে জর্জরিত ক'রে তার খেয়াল-খুশী মত চালায়, তা'হলেও কি সেই নারী পাতকা হবে? না, না, এ হতে পারে না। চন্দ্রা পাপী নয়; তার মধ্যে স্নেহশীলা নারীকে, প্রীতিময়ী দিদিকে আমি দেখেছি। চন্দ্রাদি নিশ্চয়ই স্বর্গে গেছে।

আবার নতুন যাত্রাপথের সুরু হবে। কাঞ্চনগড় আর সেই পাহাড়ী আবেষ্টনীর মধ্যে ফিরে এসেছি। দিব্যনাথের আদর্শ যে স্বপ্ন-ঘোরে ডুবিয়ে দিয়েছিল, সম্মুখে তারই আলো জ্বলে উঠেছে। তবু পাহাড়ী মায়া ভুলতে পারিনি; সবই আজ নতুন ঠেকছে। নতুন ক'রে তাদের দেখছি। তাদের বাড়ি-ঘর, পাহাড়ের ভেতরকার সমাজ ও জীবনের সঙ্গে আজ নতুন পরিচিতি ঘটছে! সেই বালিকা ভাটি আজ অভিনব মায়াজাল নিয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়েছে·।

পাহাড়ের গায়ে এখানে-সেখানে ছড়ানো বস্তির খড়ো কুটিরগুলি,—বাঁশ বেত আর উলু-খড়ে তৈরী। মাটির ওপর অনেকখানি উঁচুতে কাঠ আর বাঁশের পাটাতনে তৈরী মাচানই ঘরের মেঝে। তার ওপর বেতের চাটাই পাতা। ঘরের নীচের দিকটা একদম ফাঁকা। কাঠের কিংবা বাঁশের মই লাগিয়ে ওপরে উঠতে হয়। মাচানের তলার নীচে ফাঁকা জায়গাটা বড় বড গাছের গুঁড়ি দিয়ে ঘেরা। ওপরে থাকে মানুষ, আব নীচে থাকে পশুব পাল—গোরু, মহিষ, শূকর, ছাগল, হাঁস আর মুবগী। বিচিত্র কোলাহল,—খাঁ-খাঁ-গাঁ-গাঁ-ঘোঁৎ-ঘোঁৎ-হাম্বা-হাম্বা-প্যাঁ-প্যাঁ! বুনো মানুষগুলি কিন্তু বেশ আরামে আছে এরই মাঝে।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দিব্যি উলঙ্গ থাকে। একটু বডরা নেংটি পরে ঘুরে বেড়ায়। জঙ্গলের মানুষ এরা। ভয়-ডর আছে বলে মনে হয় না। গাছের মগ-ডালে উঠে বসে থাকে। বানরের মত লাফ দিয়ে এক ডাল থেকে অন্য ডালে অনায়াসে চলে যায। পাহাড়ের আশে-পাশে কত রকমের গাছ, কত রকমের ফুল আর কত ধরনের ফল। জামের মত অম্ল-মধুর ফল পিচণ্ডি। মুঠো মুঠো পিচণ্ডি খায় পাহাড়ী ছেলেমেয়েরা। হলুদ

রঙের পাকা ফল ছুবি। ভেতরটা তার ঠিক লিচুর মত; থোকা থোকা ফল ঝোলে গাছে।

সবাই সর্দারের নাত্‌নি ভাটি আজ আমার অভিযানে সঙ্গী হয়েছে। তাকে ছোটবেলা থেকেই জানি। সেই ভাটি এখন অনেক বড় হয়েছে। গোলগাল সুঠাম চেহারা; মুখে তার বন-গোলাপের আভা। বনে বনে ঘুরে বেড়ায়; কত কি দেখায় আমাকে। খাড়া পাহাড়ে তর তর ক'রে কেমন উঠে পড়ে সে। ভারি রহস্যময় ঠেকে তার কথাবার্তা ও আচরণ। কথা বলতে বলতে খিলখিল ক'রে হেসে ওঠে ভাটি।

—আয়, আয় ভৃগুয়া! ঐ ওপরে রাজার পাট দেখাব।

ভাটি আমাকে টেনে পাহাড়ের ওপর তুলে নিয়ে যায়। কালো পাথরে তৈরী পুরনো এক বাড়ি; তার ওপর বড় বড় গাছ জন্মেছে। কি ভয়াবহ আর কি ভীষণ লাগে দেখতে! উঁচু একটা চূড়ার ওপর বুড়ো একটা দৈত্য যেন বসে রয়েছে।

ভাটি বলে,—দাদু কেমন গল্প বলে। ঐ যে এঁকে-বেঁকে সাপ-নালা গেছে, তারই গল্প।

আমি বলি,—তুই জানিস নে?

ভাটি হেসে বলে,—না রে না; জানি কিন্তু বলতে পারব না। চোখে জল আসে।

ভাটির সঙ্গে মোহনের ভাবী সম্পর্কের কথা জানি বলে তাকে ক্ষেপাবার জন্যে বললাম,—তা'হলে মোহন নিশ্চয়ই জানে।

ভাটির কানে চাঁপাফুল দুলে ওঠে। হঠাৎ ভাটি আমার হাত দু'খানি চেপে ধরে। তার স্পর্শে কি এক অনুভূতি জাগে, বুঝতে পারিনে। বড় মমতা-ভরা তার কণ্ঠস্বর, বলে,—আমিও জানি; ভালবাসার গল্পরে ভৃগুয়া, ভালবাসার গল্প। রাজার ছেলেকে ভালবাসত এক পাহাড়ী চাষীর মেয়ে। রাজা সেই মেয়েকে দিয়েছিল অজগরের মুখে। তুই দাদুর কাছে শুনবি সে গল্প?

তার চোখের জল আমার হাতের ওপর টপটপ ক'রে পড়তে লাগল। এত কোমল ভাটির মন! যে মেয়ে সাপ নিয়ে খেলা করে, বুনো শুয়োরকে বর্শা নিয়ে তাড়া করে, তার মন এত কোমল? ভাটির হাব-ভাব আমাকে বিস্মিত করে।

তারপর আবার পাহাড় থেকে নামবার পালা। সন্তর্পণে আমার হাত ধরে খাড়া পাহাড়ের পথে আমাকে ভাটি নামিয়ে আনে। আমি যেন তার খেলার পুতুল! পাহাড়ের মোহজাল আমার নতুন শিক্ষা-দীক্ষার উদ্দীপনার ওপর একটা আবরণ টেনে দেয়। শহরের বৈচিত্র্য পাহাড়ের শ্যামলিমায় ঢাকা পড়ে।

পাহাড়ী ছড়ার জল সর্পিল গতিতে তরতর বেগে নেমে আসে। মাঝে মাঝে বড় বড় খাড়া পাথর মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। ছড়ার জল সেই খাড়া পাথরে ধাক্কা খেয়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ফোঁস ফোঁস ক'রে ফোয়ারার মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। দূর থেকে মনে হয়,—নিকষ কালো পাথরের শিবকে ঘিরে শত শত দুধরাজ সাপ শিবের মাথায় শতধারে দুধ ছড়িয়ে দিচ্ছে।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সেই পাথরের ঢিবির উপর চেপে বসে। ফোয়ারার জলের ধারায় তারা অবগাহন করে। সেই কালো সুঠাম দেহশ্রী তাদের চিক্‌চিক্‌ করে ওঠে সূর্যের রশ্মি পড়ে। ভাটিকে তারা ভয় করে। তাকে দেখে পালিয়ে যায়। ভাটি আমাকে নিয়ে গিয়ে একটা পাথরের ঢিবির ওপর বসে।

সেই মোহন! দিব্যি জোয়ান হয়ে উঠেছে! কানে রূপোর কুণ্ডল তার। ঝড়ু সর্দারের ছেলে মোহন। ভাটি আর মোহনের মধ্যে কত ভাব ছিল। দু'জনে সমবয়সীই হবে। মোহনের হাতে তীর-ধনু। মোহন এদিকে এগিয়ে আসে! সে হাঁক দিয়ে বলে,—হেই ভাটি, ঠাকুরের ছেলে। ওঁর সঙ্গে এক আসনে বসে আছিস যে? তোর ভয়-ডর নেই?

ভাটি হিঃ হিঃ ক'রে হেসে উঠে বলে,—যাঃ, যাঃ! তোকে আর শেখাতে হবে না।

দু'হাতে ফোয়ারার জল ধরে ভাটি চার দিকে ছড়াতে থাকে। জলের ধারায় সূর্যের কিরণ পড়ে রামধনুর সাত-রঙ ফুটে ওঠে। ভাটির গায়েও রামধনু। তার হলদে রঙের তামাটে দেহখানি বড় সুন্দর লাগে।

ওপর থেকে মোহন বড় বড় পাথরের চাঁই তুলে জলে ছুঁড়ে মারে। তোলপাড় হয় জল। ভাটি হাঁক দিয়ে বলে,—যা, যা, তোকে চাইনে।

তাদের এ খেলা দেখে আমি হেসে উঠি। ভাটিকে বলি,—ছিঃ ছিঃ। মোহন রাগ করবে যে!

বনভূমির মায়া আর ভাটির আকর্ষণ আমাকে উন্মনা করে তোলে। পাহাড়ের আনাচে কানাচে গোরু, ছাগল আর মহিষের রাখালী করে বেড়ায় পাহাড়ী কিশোর-কিশোরী। বড়রা যায় নীচেকার মাঠে চাষ-বাস দেখতে। পাহাড়ের গায়ে আখ আর আনারসের বাগান রয়েছে। মাঝে মাঝে উঁচু পাহাড়ের গায়ে কমলালেবুর গাছ।

ওদের আমি এড়িয়ে থাকতে চাই ; তাই বনভূমির নির্জন অঞ্চলে বেড়াতে যাই। ক্ষেত্রদিদির সে কনক-চাঁপার বেদীর কথা মনে পড়ে। পাহাড়ীদের সরলতার মধ্যেও কেমন একটা আকর্ষণ রয়েছে বুঝতে পারি,—আমাদের সঙ্গে তাদের কত তফাৎ রয়েছে। তবুও তাদের সঙ্গে মিশতে আমার আটকায় না। মনে মনে ভাবি,—পাহাড়ীরা সত্যি মায়া জানে! তাদের বেশ-বাস ও জীবনযাত্রা আমাদের কাছে হেলা-ফেলার জিনিস। ওই ভাটি—কি আশ্চর্য মেয়ে! লজ্জা-সরম কিছুই ওর মধ্যে নেই! যেন কিছুই জানে না। কই সুলতা অণিমা কিংবা মাধবী—তাদের সঙ্গে তো ছোট বেলায় কত খেলা করেছি। কিন্তু এখন তো তারা আমার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলতেও বেশ সংকোচ করে। আগের মত সে প্রাণখোলা হাসি আর মেলামেশা নেই কেন? কিন্তু ভাটিকে ছোট বেলায় দেখেছি ; বড় লাজুক ছিল সে। আমাকে দেখলে মুচকি হেসে ছুটে পালাত। মোহন আর ভাটি কত কি উপহার দিয়েছে আমাকে! অবশ্য আমাদের মত ভদ্রলোকের ছেলেদের তারা এড়িয়েই থাকত। হঠাৎ একদিন সে আগলও ভাটি ভেঙ্গে দিয়েছিল।

ছড়ার ধারে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম, কোথা থেকে ছুটে এসে ভাটি আমার হাত ধরে তুলেছিল। তখন বুঝেছিলাম, পাহাড়ীদের গায়ে অনেক জোর। এমন লেগেছিল যে হাঁটতেই পারি না। ভাটি আমাকে উঠতে নিষেধ করে কোথায় চলে গেল। তারপর মোহনকে সঙ্গে ক'রে এসে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল সে। বন-গোলাপ উপহার দিয়েছিল মোহন ; আর ভাটি দিয়েছিল টিয়ে পাখীর ছানা।

কাঞ্চনগড় ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ী-মায়ায় ছেদ পড়লেও এরা আমাকে ভোলেনি। নির্জনে চুপচাপ বসে থাকলেও ভাটি আমাকে খুঁজে বের করে। আজও তার বিয়ে হয়নি দেখে আশ্চর্য হই। সে আজ অনেক বড় হয়েছে। গায়ে তার সবুজ আঙরাখা, আর পরনে গোলাপী কাপড় জড়ানো। তার

চোখে মায়া-মধুর দৃষ্টি! মোহন আর ভাটিতে ছিল খুব ভাব। প্রায়ই একসঙ্গে তারা ঘুরে বেড়াত; এখন দেখি, মোহনকে ভাটি যেন এড়িয়ে চলে।

সাপ-নালা আর রাজার পাটের গল্প আমার আর শোনা হ'ল না। আমিও ভাটিকে এড়িয়ে চলতে লাগলাম। একদিন একাই পাহাড়ের চুড়ায় উঠছি, কিন্তু খাড়া পাহাড়ে উঠতে পারছি নে; দু'পা উঠি তো তিন পা নেমে আসি। ক্লান্ত হয়ে একটা পাথরের ওপর বসে পড়লাম। হঠাৎ দেখি ভাটি আমার দিকে এগিয়ে আসছে; অস্তগামী সূর্যের কিরণ পড়েছে তার মুখের ওপর। তার কানে সোনালী বনলতার কোরক দুলছে। সবুজ আঙরাখা আর গোলাপী কাপড়ে তাকে অপরূপ দেখাচ্ছিল। মনে হ'ল, যেন কোন গন্ধর্বকন্যা পাহাড়ের চূড়ায় আবির্ভূতা হয়েছে।

ভাটি কাছে এসে আমার হাত ধরে একটা হেঁচ্‌কা টান মারলে। আমি প্রায় পড়ে যাচ্ছিলাম, কোন রকমে সামলে গেলাম। সে হিঃ হিঃ ক'রে হেসে বললে,—বড় না মুরোদ। উঠবি রাজার পাটে?

আমি বললাম,—ছিঃ ভাটি! আমি যে পড়ে যাচ্ছিলাম!

ভাটি বললে,—পড়লেই হ'ল? আমি আছি কি করতে? চল্‌ রাজার পাট দেখবি।

—না, সন্ধ্যে হয়ে যাবে। বাড়ি ফিরতে দেরী হবে!

—হোক্‌ দেরী, চল। ভয় কি রে? বড় হয়ে উঠেছিস মরদ জোয়ান।

আমাকে উত্তর দেবার অবসর না দিয়ে ভাটি আমাকে টেনে নিয়ে পাহাড়ে উঠতে লাগল। রাজার পাটের কাছে এসে পৌঁছলাম। ভাটি বললে,—ঐ যে, ঐ দেখ অন্ধকার গর্ত-গুহা। বড় গহীন; পাতালে চলে গেছে। ওখানে থাকত মস্তবড় অজগর—রাজবাড়ির বাস্তু সাপ। সেই অজগর ঐ পথে গাঙে নেমে গিয়েছিল; তারই দেহের আঁচড়ে হয়েছে এই সাপ-নালা। পাতালের জল উঠে সাপ-নালা দিয়ে গাঙে পড়েছে।

কি ভীষণ সে গহ্বর! অন্ধকারে তলদেশ আচ্ছন্ন, কিছুই দেখা যায় না। পাহাড়ের নীচু দেশ থেকে বেরিয়েছে সাপ-নালা। আঁকা-বাঁকা রেখায় যেন এক বড় সাপ এগিয়ে চলেছে। খাড়া পাহাড়ের ওপর শ্যামল চত্বর। তারই ওপর রাজার পাট। নিচেকার মাঠ-ঘাট, বাড়ি-ঘর ও নদী-নালাকে সেই চত্বরে দাঁড়িয়ে দেখতে ছবির মতই লাগে। রাজার পাট আর সাপ-নালার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক বিষাদময় প্রেমের কাহিনী। প্রতি বৎসর

শারদীয় পূর্ণিমায় পাহাড়ীরা শত শত পদ্মফুল ওপর থেকে নীচেকার এই গুহা-গহ্বরে ফেলে দেয়,—সেই কাহিনীর নায়ক-নায়িকা রাজার ছেলে তার তার প্রণয়িনী এক পাহাড়ী মেয়ের উদ্দেশে। সাপ-নালা শারদ-পূর্ণিমায় পদ্ম-স্রোতে ভরে উঠে।

ভাটি বলে,—তোর বুঝি এই জায়গাটা ভাল লাগে?

আমি উত্তর দিই,—হ্যাঁ, বড় চমৎকার!

ভাটি বললে,—হ্যাঁ, রে, ভারি সুন্দর! আমি যদি এখান থেকে লাফিয়ে ওই গুহার গর্তে পড়তে পারি তা'হলে আরো সুন্দর হয়।

ভাটির কথায় আঁৎকে উঠি। এবার তাকে বড় উন্মনা দেখছি, কিছুই বুঝতে পারিনে! পাহাড়ী মেয়েদের বিশ্বাস নেই। তাকে বললাম,—কেন মরবি? কোন দুঃখে?

সে হেসে উত্তর দেয়,—দুঃখে কেন সুখে। দুঃখ ভোলবার জন্তেই মরণ; দুঃখের জ্বালায়ই মানুষ মরণকে ডাকে। তাইতো লোকে আগুনে ঝাঁপ দেয়, গলায় ফাঁস লাগায়! জানিস নে?

আজ নতুন কথা শুনলাম ভাটির মুখে। দুঃখকে ভোলবার আনন্দে মানুষ মৃত্যুকে বরণ করে,—এ যে নতুন কথা। দুঃখের জ্বালায়ই মানুষ মরে, তাই জানি। মানুষ কি সত্যই মরণ কামনা করে? না, মানুষ তো সহজে মরতে চায় না; বাঁচতেই চায় মানুষ। ভাটির কথায় মনটা বিচলিত হয়ে উঠল।

ভাটিকে বললাম,—চল, নীচে নেমে যাই।

সে মুচ্‌কি হেসে উত্তর দেয়,—কেন? ভয় পেয়েছিস? না, না, আমি মরব না।

তার মুখে ভাবান্তর লক্ষ্য করি। পড়ন্ত রোদের লালচে আভায়ও তার মুখে বিষাদের ছায়া দেখতে পাই। মনে হল নৈরাশ্যের তিক্ততা তাকে পীড়ন করছে। কি জানি পাহাড়ীরা মায়া জানে! ভাটি কি মায়াজাল বুনছে? নিজের সম্বন্ধে হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠি,—আমার সামনে দাঁড়িয়ে পর্বতকন্যা—উদ্ভিন্ন-যৌবনা নারী।

ভাটি বলে,—তোরা বুঝবি নে ভৃগুয়া! আমাদের মনের কথা তোরা বুঝবি নে। লেখাপড়া শিখেছিস; বড় ঘরের ছেলে তোরা। জঙ্গলী পাখী পোষাই তোদের শখ। তাদের মনের কথা তোরা বুঝবি কি ক'রে?

—তুই কি বলতে চাস ভাটি? কি বলবি বল?

—কি বলব ? কত দূরে কোথায় চলে যাবি ; বনের পাখী বনেই থাকবে, আর খাঁচার পাখী খাঁচারই মরবে।

—আমি তো কোন পাখী পুষিনি ভাটি !

—ওঃ ! তাই তো বলছি, তুই এসব বুঝবি নে। ফুল তোদের ভাল লাগে ; পশু-পাখী দেখলেও কখন কখন মায়া হয়,—না ? কিন্তু সে ফুল আর সেই পাখীরও মায়া-দয়া থাকতে পারে ; পাখীও মানুষকে ভালবাসতে পারে। সেটা বুঝিস ?

—পাখী মানুষকে ভালবাসতে পারে ? তুই হাসালি ভাটি !

—না রে না। সত্যি বলছি ! তাই তো তুই দূরে চলে যাবি, আর আমরা এই জঙ্গলেই পড়ে থাকব। আর ভাল লাগে না ; মোহনটা বড় জ্বালাতন করে।

মোহনের নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই ভাটির চোখে জল দেখা দিল। তার রহস্যময় কথাবার্তার কিছুই বুঝতে পারিনে।

ভাটিকে বললাম,—তোকে জ্বালাতন করে ? আচ্ছা বারণ ক'রে দেবো।

ম্লান মুখে ভাটি বললে,—তাতে হিতে বিপরীত হবে। তুইও চিরটা কাল এখানে থাকবি নে ; বনের মানুষ নিয়েই আমায় থাকতে হবে।

—খুব কথা শিখেছিস ভাটি। আমি কি বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলে যাব ?

—হ্যাঁ যাবি। তোকে বেঁধে রাখবে কে ? তোর যে মা নেই।

ভাটির কথায় সচকিত হয়ে উঠলাম। মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। অনেক দিন হযে গেছে ; আমার মা নেই। মায়ের কথা ভুলেই গেছি। সত্যিই ঘর-বাড়ির আকর্ষণ আমার কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেছে ! আজ অবধি দেখছি, শৈশবের সঙ্গী-সাথী অনেকেই কোথায় দূরে সরে গেছে, আমিও কত দূরে চলে এসেছি। আর পেছন ফেরা যায় না। সেই সুব্রতা, ক্ষেত্রদিদি, চন্দ্রাদি, রমাপদ, উৎপল—তারাও আজ বহু দূরে ; কেউ এপারে আর কেউ বা ওপারে। জীবনের নিত্য নতুন খেলাঘর গড়ে ওঠে, আবার ভেঙ্গে যায়।

শৈশবের খেলাঘর ভেঙ্গে গেছে। বাল্য ও কৈশোরের সৌহার্দ্য চমক লাগিয়েছিল বটে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবেগও বেড়ে যায় দেখেছি। সমবয়সী কাউকে বা বড় আপন ভাবতাম। মনে হ'ত তাদের ছেড়ে এক তিলও থাকতে পারব না। আবার বিচ্ছেদও ঘটে যেত সামান্য কারণে। তাদের আকর্ষণ গৃহকেও ভুলিয়ে দিত। গৃহের আকর্ষণ ছিলেন মা। তাঁর

মুখখানি মাঝে মাঝে দেখতে পাই বন্ধুদের মায়ের মুখে। বন্ধু সরোজের মা আর সুধাংশুর মায়ের মুখে যেন আমার মাকে আরো স্পষ্ট ক'রে দেখতে পাই।

ভাটিকে বললাম,—মোহনকে তোর কিসের ভয় শুনি?

সে উত্তর দিলে,—মোহনকে ভয় করিনে; তার ভালবাসাকেই আমি ভয় করি।

সহাস্যে উত্তর দিই,—সে আবার কিরে ভাটি? তোকে কে না ভালবাসে! আমিও বোধ হয় তোকে ভালবাসি।

ভাটির মুখে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল; রাঙা হয়ে উঠল তার মুখ। তার মুখে কে যেন হঠাৎ আবীর ছড়িয়ে দিল।

ভাটি বললে,—বেশ, বেশ। তোরা সবাই আমাকে ভালবাসিস পোষা পাখীর মত—না?

আমি বললাম,—না রে, সত্যি তোকে ভালবাসি।

ভাটি খিলখিল ক'রে হেসে উত্তর দেয়,—বেশ তো! আচ্ছা, আমি যদি তোদের কাউকে ভাল না বাসি, তা'হলে কি হয়?

আমি বললাম,—ধ্যেৎ, নিশ্চয়ই তুই সবাইকে ভালবাসিস। মোহনকে তুই ভালবাসিস না?

ভাটি উত্তর দেয়,—না।

আমি বললাম,—তা'হলে আর কাকে ভালবাসিস? আমাকে নিশ্চয়ই ভালবাসিস, সেটা আমি জানি।

আমার কথায় ভাটি যেন হাসতে ফেটে পড়ল। একটু সামলে নিয়ে সে বললে—লোকের মনের কথা তো বেশ বলতে পারিস দেখছি। কিন্তু যাকে চাইনে, যাকে ভালবাসিনে, সে যদি হেংলার মত পিছু লাগে, তা'হলে কি করি বলত?

কিছুক্ষণ ভেবে উত্তর দিলাম,—এ তোর বড় অন্যায় ভাটি! কেউ যদি তোকে ভালবাসে, তাতে তোর ক্ষতিই বা কি? সবাইকে ভালবাসতে পারলে কত সুখ! কোন রেষারেষি থাকবে না; সবাই খুশী হবে।

ভাটি বললে,—তুই ভালবাসার কিছুই বুঝিস নে। ভালবাসা অত সোজা নয় রে ভুশুয়া! ভালবাসার জন্যেই এই রাজার ছেলে গুহা-গহ্বরে ঝাঁপ দিয়েছিল।

—তুই কি বলতে চাস যে তোর জন্যে সবাই গুহা-গহ্বরে ঝাঁপ দেবে? আমি কিন্তু পারব না ভাটি! মোহন হয়ত পারবে।

—তোকে গুহা-গহ্বরে ঝাঁপ দিতে কে বলেছে? তোদের ভালবাসা আমি জানি। যাক্, ওসব কথা ছেড়ে দে। চল দাদুর কাছে, আজ যে রাজার পাটের গল্প শুনবি।

—না ভাটি, রাজার পাটের গল্প শুনে কি হবে? সে-ত বললি ভালবাসার গল্প? সে গল্প শুনে আমার কি লাভ? বরং মোহনকে শুনিয়ে দে তোর উপকার হবে।

আমার রসিকতা শুনে ভাটি যেন অভিমানে ফেটে পড়ল,—যা, যা তোকে আর মাতব্বরি করতে হবে না। আমাকেই মরতে হবে এই গুহা-গহ্বরে।

—কি দুঃখে? মোহন তো তোকে ভালবাসে।

—হ্যাঁ, ভালবাসে। কিন্তু তাকে আমি চাইনে।

—একেবার নতুন কথা শোনালি ভাটি! তোদের তো ছোটবেলা থেকেই ভাব।

—এখন তো আমি ছোট নই ভৃগুয়া।

—ওঃ, বড় হয়ে উঠেছিস। সে কথা ভুলেই যাই।

—ঠাট্টা করছিস?

—না ঠাট্টা নয়; একটা কথা তোকে জিজ্ঞেস করব ভাবছি ভাটি!

—কি কথা? বল না।

—তোদের বিয়ের কথা।

—না, সে হবে না। আমার ইচ্ছে নেই।

—কেন রে? তোদের রীতি তো ভাল; আমাদের ঠিক তার উল্টো। জানা নেই, শোনা নেই,—কোথা থেকে কে এসে বিয়ে ক'রে নিয়ে চলে যায়। মেয়েরা কোন কথাই বলতে পারে না। তোদের তো ছোটবেলা থেকে জানাশোনা হয়ে যায়, ভাবসাবও থাকে। মানুষটাকে আগাগোড়াই তোরা জানতে পারিস; আর মোহন তো ভাল ছেলে।

—ছোটবেলার মন আর এখনকার মনে অনেক তফাৎ ভৃগু! মোহন আমাকে নিয়ে সুখী হতে পারবে না। আমি বিয়েই করব না!

ভাটির কথায় বিস্মিত হই। মনে পড়ে যায় সুব্রতার কথা। সেও এইরকম কথাই বলেছিল। কিন্তু পাহাড়ী মেয়েদের কথা তো আলাদা। এরা নিজের মনের মত বেছে নেবার সুযোগ পায়।

ভাটিকে বললাম,—দেখ ভাটি! তোদের কথা কিছুই আমি বুঝিনে।

মোহন কি দোষ করলে? বেশ তো, কাকে বিয়ে করবি স্পষ্ট ক'রে বলে দে।

সে বললে,—না, আমার বিয়ে হবে না। আমি কাউকে বিয়ে করব না।

তার কথা শুনে হেসে বললাম,—বেশ, দেখা যাবে। আমার কি বল? তোরা দু'জনে সুখেই থাকবি। তোর দাদু কি ছেড়ে কথা কইবে?

—যা,—যা। তোর কোন কথাই আমি শুনতে চাইনে। চল, নেমে পড়ি। সূর্যি পাটে নামছে; অন্ধকার হয়ে যাবে।

আমার হাত ধরে ভাটি নামতে লাগল। মনে মনে কত কথা ভাবি; এরা পাহাড়ী বলেই আমাদের কাছে এদের কোন মূল্য নেই। আজ এ বয়সের কোন ভদ্র কন্যার হাত ধরে এ অবস্থায় আমি এরকম পাহাড়ী পথে নামতে পারতাম না। বিগর্হিত কাজ হ'ত এটা। নানা কথা উঠত লোকের মুখে। হয়ত সমাজে বাস করাও কঠিন হয়ে উঠত। কিন্তু এদের বেলা কিছুই হবে না। এদের কোন মূল্য নেই। কেউ কিছুই বলবে না। শুধু বক্র-হাসি ফুটতে পারে কারো কারো মুখে। এরা যে আলাদা জগতের মানুষ!

ভাটি নীরব। হাতটা তার মাঝে মাঝে কাঁপতে লাগল। কি জানি, তার মনে কি তোলপাড় উঠেছে! নিশ্চয়ই মোহনের সঙ্গে তার মন কষাকষি হয়েছে: দু'দিন পরেই তা কেটে যাবে।

নদীর অপর পারে আলো দেখা গেল, মিটি মিটি প্রদীপ জ্বলে উঠেছে। পাহাড়ের নীচেও ঘরে ঘরে যেন জোনাকীর আলো জ্বলছে। নৌকায়ও আলো! নদীতে যেন প্রদীপ ভেসে চলেছে একটির পর একটি ক'রে। নদীর ধারে পৌঁছেই ভাটি বললে,—চলে যা ভৃগু। কাল আসিস, গল্প শুনবি।

খেয়া নৌকায় পা দিলাম। ভাটিও অদৃশ্য হ'ল। জলের ভেতর আকাশের তারার চিকমিক মনকে দোলা দেয়। জলে ছায়া পড়ে; মানুষের মনেও বুঝি ঠিক এই রকমই ঘটনার ছায়া পড়ে। ছেড়ে-আসা মুখগুলি মনের ভেতর ঢেউ তোলে।

রাজার পাটের গল্প শুনছি। সবাই সর্দার গল্প বলছে; সে পাহাড়ীদের সর্দার। তাদের মন্ত্র-গুরু বলা চলে। তুক-তাক, জাদুবিদ্যা, বাণ-মারা, অনেক কিছু জানে এই বুড়ো সর্দার। লোহার শাবলের মত শক্ত তার হাত পা। হাতীর মত মন্থর গতিতে সে রাস্তা কাঁপিয়ে চলে। পাহাড়ীরা তাকে মান্তি

করে, আবার ভয়ও করে। রাজার পাট আর রাজবংশ এই সবাই সর্দারেরই কোন এক পূর্বপুরুষের তুকতাকে বিনষ্ট হয়েছে। তার পূর্বপুরুষ শঙ্খ সর্দার রাজবংশের ওপর নির্মম প্রতিশোধ নিয়েছিল! রাজবংশ লোপ পেয়েছে। যে ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে এই প্রতিশোধ, সেই কাহিনী জড়িয়ে আছে সাপ-নালা, পাহাড়ী মেয়ে চম্পা আর রাজার ছেলে মদনকুমারের সঙ্গে।

সবাই বলছে,—ওই যে পাহাড়ের চূড়ার চত্বরে রাজপাট দেখছো দাদাঠাকুর, ওখানে ছিল আমাদের রাজা গম্ভীর সিংহের রাজপুরী। রাজার দাপট ছিল; পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ অনেক দূর তার দখলে ছিল। ওই কালো পাথরগুলো তখন জ্যোৎস্না রাতেও ঝিকমিক ক'রে উঠত। আজ তার ওপর বট গাছ জন্মেছে, শ্যাওলা ধরে গেছে।

অর্জুনের কথা শুনেছো? সেই মহাভারতের অর্জুন? পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যম পাণ্ডব। মস্ত বড় বীর ছিল সে। অর্জুন এ দেশে বেড়াতে এসেছিল; এই পথেই সে মণিপুর আর নাগার দেশে গিয়েছিল। আমাদের রাজার অতিথি হয়েছিল অর্জুন। তাঁরই পরিচর্যা ক'রে মহারাণী পেয়েছিল সুধন্বাকে। সেই সুধন্বার বংশের শেষ রাজা গম্ভীর সিংহ। এই রাজপাট গম্ভীর সিংহেরই রাজপুরী।

কৃষ্ণসখা অর্জুনের আদেশেই রাজবংশ বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। ঐ যে রাধাকৃষ্ণজীর মন্দির, ওটা রাজা সুধন্বারই। রাস আর ঝুলনের সময় এখনও কত লোক আসে রাধাকৃষ্ণজীর মন্দিরে। আগে কত ধূমধাম হ'ত। কৃষ্ণলীলার পালা চলত দিনের পর দিন; তোমার সিদ্ধিনাথের মেলার মতই মেলা বসত এখানে। বেশীদিনের কথা নয়; আমার ঠাকুরদার বাবাও দেখেছেন গম্ভীর সিংহকে।

রাজা ছিলেন পরম বৈষ্ণব। রাজার একটি মাত্র ছেলে; ঠিক কেষ্ট ঠাকুরের মত চেহারা,—নাক মুখ চোখ খোদাই করা কালো পাথরের মত। সুন্দর বাঁশী বাজাত রাজার ছেলে মদনকুমার। রাজার ছেলে হ'লেও রাজার ছেলের মত সে থাকত না, নেমে আসত পাহাড়ী বস্তীতে। পাহাড়ী ছড়ায় জলকেলি করত আমাদেরই মত চাষাভুষোর ছেলেমেয়ের সঙ্গে। যেখানটায় কালো পাথরের ঢিবির ওপর ফোয়ারার মত জল ছড়িয়ে পড়ছে, সেইখানে সে ঢিবির ওপর বসে মাঝে মাঝে বাঁশী বাজাত।

আমার ঠাকুরদার বাবার বোন ছিল চম্পা, এগারো-বারো বছরের মেয়ে।

সেও বাঁশী বাজাতে জানত। মদনকুমারের বাঁশীর আওয়াজ শুনলেই সে ছুটে যেত ফোয়ারার দিকে। পরে এমন হ'ল যে দু'জনেই কেমন যেন উন্মনা হয়ে উঠল। দু'জনেই বসে থাকত সেই ফোয়ারার কালো পাথরে ; বাঁশী বাজাতে বাজাতে তন্ময় হয়ে যেত দু'জন। চম্পার গায়ের রঙ ছিল ঠিক চাঁপা ফুলের মতন। আমার মনে হয় কি জানো দাদাঠাকুর? ঠিক আমার ভাটিরই মতন।

সর্দারের কথা শুনে ভাটির মুখ রাঙা হয়ে ওঠে।

সর্দার বলে,—কি প্রাণ-মাতানো সে বাঁশীর আওয়াজ! বনের পশুপাখী পর্যন্ত তন্ময় হয়ে যেত সে বাঁশী শুনে। সবাই বলত,—রাধা আর কৃষ্ণ! মদনকুমার বারণ শোনে না ; চাষাভুষোর সঙ্গে মেলামেশা রাজা আর রাজবাড়ির কেউ পছন্দ করে না। সত্যিই তো, যে একদিন রাজপাটে বসবে, সে কিনা বনে- জঙ্গলে বাঁশী বাজিয়ে পাহাড়ী চাষী মেয়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়াবে?

ধনুর্বিদ্যা, মল্লবিদ্যা কিংবা বর্শা চালানো এই সতেরো বছরের ছেলের কিছুই শেখা হ'ল না! রাজা বড় দুর্ভাবনায় পড়লেন। মহারাণী ছেলেকে কত বোঝান। মন্ত্রী, সেনাপতি ও কোটাল সকলেই হার মানেন ; ছেলে কোন কথাই শোনে না। শুধু বাঁশী আর বাঁশী।

পাহারা বসল। রাজার হুকুম মদনকে আর পাহাড়তলীতে নামতে দেওয়া হবে না। কিন্তু তবুও বাঁশীর বিরাম নেই। ওই রাজার পাটের উত্তর দিকে একটা বকুলগাছ ছিল দাদাঠাকুর! সেই বকুলগাছে বসে মদনকুমার বাঁশী বাজাত। পাহাড়ী ছুড়ার সেই ফোয়ারার ঢিবির ওপর বসে চম্পা তার উত্তর দিত। সেই ফোয়ারা এখনও রয়েছে দাদাঠাকুর! সে ফোয়ারা তুমি দেখেছ?

সবাই সর্দারের গল্পে তন্ময় হয়ে উত্তর দিই,—হ্যাঁ, তার ওপর বসেছিও।

সর্দার বলে,—আমাদের ছেলেমেয়েগুলো তারই ওপর বসে খেলা করে। এই ঢিবিটা একদিন রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল দাদাঠাকুর। শোন সে গল্প,— রাস-লীলা আর ঝুলনের সময় রাজার ছেলের আর পাহারা থাকে না। রাধাকৃষ্ণজীর মন্দিরে যায় রাজবাড়ির সবাই। সেখানে চলে রাধাকৃষ্ণের লীলার পালা। রাজার কুমার হঠাৎ একদিন সে আসরের মাঝখানে কোথা থেকে ছুটে এসে বাঁশীতে মুখ দিল। হাজার হাজার লোক মন্ত্র-মুগ্ধ হয়ে সে বাঁশী শোনে। তারপর কখন যে কোথা থেকে তার পাশে এসে দাঁড়াল

চম্পা; তারও হাতে বাঁশী। দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বাঁশী বাজায়! গোকুলের রাধাকৃষ্ণ যেন নেমে এসেছে! হাজার হাজার লোক ধন্য হয়ে গেল; লুটিয়ে পড়ল তারা দু'জনের পায়ে।

মহারাণীও মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর চোখে জল ঝরতে লাগল। রাজাও কেঁদে ওঠেন। সেনাপতি ও মন্ত্রীর চোখেও জল। কতক্ষণ যে এ ভাবঘোরে সব ডুবে ছিল বলা যায় না। ভোরবেলা পাখীর ডাকে সকলের সে ভাবঘোর ভাঙল। থেমে গেল বাঁশী। অচেতনের মত মদনকুমার ঢলে পড়ল; চম্পারও চেতনাহীন ভাব।

সেদিন থেকে আরো কঠোর হ'ল রাজার ছেলের পাহারা। রাজার যে আর কোন ছেলেমেয়ে নেই! রাজা কঠোর হলেন; মদনকুমার আর বের হতে পারে না। কিন্তু চম্পাকে সামলায় কে? চম্পা আপন মনে বাঁশী বাজায়। রাজবাড়ির ছাদের ওপর থেকে তার প্রতিধ্বনি আসে; তার সঙ্গে আসে তার প্রত্যুত্তর।

আশপাশের গাঁয়ের আর পাহাড়পুঞ্জীর লোকেরা বলাবলি করে,—রাধা আর কৃষ্ণ নেমে এসেছে আবার! রাধার প্রেমে পড়েছে কৃষ্ণ! রাধা কৃষ্ণকে চিনতে পেরেছে। ওদের মিলনে বাধা দেবে কে?

এমনি ক'রে দিন যায়! রাজকুমার আরো বড় হয়ে ওঠে; চম্পাও বড় হয়। কিন্তু তাদের কারো স্বভাব বদলায় না। রাজকুমারের একই কথা, বাঁশীব একই সুর—রাধা, রাধা, রাধা। চম্পার বিয়ের উদ্যোগ নষ্ট হয়ে যায়; বড় বড় সর্দারের ছেলে ফিরে যায়। চম্পাকে কত সাধ্য-সাধনা করে; চম্পা তাদের ফিরিয়ে দেয়। চম্পার মুখে আর হাসি নেই। কিন্তু যখন সে বাঁশী মুখে ধরে, তখন যেন এক জ্যোতি বেরিয়ে আসে চম্পার মুখ থেকে।

চম্পাকে ছোটবেলা থেকে ভালবাসত রতন। চম্পাও তাকে ভালবাসত। সকলেই আশা করেছিল চম্পাকে নিয়ে রতন সংসারী হবে, দু'জনের হবে বিয়ে। বুঝলে দাদাঠাকুর! ঠিক যেন আমার ভাটি আর মোহন!

তারপর সেই বাঁশী এমন ক'রে দিলে যে, রতন আর চম্পার মন পায় না। রতন কাছে এলেই চম্পার চোখে জল ঝরে। চম্পা বলত,—সরে যা রতন! আমার এখনও সময় হয় নি। দূরে দাঁড়িয়ে বাঁশী শোন। শুনতে পাচ্ছিস কালো কালিয়ার বাঁশী আমায় ডাকছে?

চম্পা বাঁশীতে মুখ দেয়,—করুণ সুর ভাসে বাতাসে ; যেন ভেসে বেড়ায়—

'মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব।

আমার কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব।'

সবাই সর্দার সেই গানের দু'টি চরণ করুণ সুরে গাইতে লাগল। ভাটি আমার পাশেই বসে আছে। দু'জনে চুপচাপ শুনছি। মনে হ'ল, পাহাড়ী ছড়ার দিক থেকে বাঁশীর আওয়াজ ভেসে আসছে।

সর্দার বলতে থাকে,—বাঁশীর আওয়াজ শুনলেই রতনের চোখ জলে ভরে উঠত ; সত্যিই সে চম্পাকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল। চম্পার মন বোঝা যেতো না ; রতনকে যে সে ভালবাসত না, তাও নয়! কিন্তু রাজার ছেলের বাঁশীই তাকে উন্মনা ক'রে তুলেছিল। রতনের কাকুতি-মিনতি চম্পার মন ফেরাতে পারে না ; তবুও রতন চম্পার পিছু পিছু ঘোরে। সকলেই জানে চম্পার সঙ্গে রতনের বিয়ে হবে। দু'জনেরই বিয়ের বয়স হয়েছে। আর দেরী করা চলে না।

সর্দারদের বৈঠক বসে শঙ্খ সর্দারের বাড়িতে। সাতপুঞ্জীর মোড়ল শঙ্খ সর্দার। ঐ পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে শাঁখে ফুঁ দিলে পাহাড়ীরা যে যেখানে আছে ছুটে আসত—তীর, ধনু আর বর্শা বল্লম নিয়ে। লুসাইরা একবার আমাদের রাজার রাজ্য চড়াও করেছিল ; শঙ্খ সর্দারের দল কচুকাটা ক'রে তাদের পাহাড়ের গহ্বরে ফেলে দিয়েছিল। রাজা তাই খুশী হয়ে শঙ্খ সর্দারকে সোনায় মোড়া শাঁখ বকশিস্ দিয়েছিল!

সেই শঙ্খ সর্দারের নাতনি চম্পা। রাজার হুকুম,—চম্পাকে সামলাতে হবে! সে আর বাঁশী হাতে নিতে পারবে না। সে হুকুম অমান্য করে কার সাধ্যি! এমন যে শঙ্খ সর্দার সে-ও রাজাকে দেখলে থরথর ক'রে কাঁপত। শঙ্খ সর্দার জলপড়া ছিটিয়ে দিলে বাঘও কুকুরের মত বশ হয়ে যেত ; কত জানত শঙ্খ সর্দার! কিন্তু নাতনিকে বশে আনতে পারলে না।

রাজার হুকুম ;—রাজা যে নারায়ণ দাদাঠাকুর! পাণ্ডব অর্জুনের রক্ত বইছে তার দেহে। শঙ্খ সর্দার বুড়ো হয়েছে ; ছেলে আর বউ কবে যে মারা গেছে ছোট্ট মেয়েটি রেখে। শঙ্খ সর্দার চম্পার দিকে তাকায় আর আপসোস করে ; বুক তার ফেটে যায়! চোখে তার জল আসে। বড় আদরের নাতনি চম্পা! রতন আর চম্পা ছিল মানিকজোড় ঐ বুড়োর কাছে। রতনের বাপ লুসাইদের হঠাতে গিয়ে দু'চোখ হারিয়েছিল ; আগুনের

তীর ছুড়ে মেরেছিল তারা তার চোখে। পাহাড়ীপুঞ্জীর চৌকস্ ছেলে রতন!

শঙ্খ সর্দার ভাবে, একি হ'ল! রাজার ছেলের বাঁশী যে তার স্বপ্ন ভেঙ্গে দিচ্ছে! সর্দার চম্পাকে বোঝায়, আর চম্পা শুধু কাঁদে।

চম্পা বলে,—আমার জন্মে ভেবো না দাদু! আমার কিছুই হয়নি, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

বুড়ো বলে,—তা'হলে রতনের বাপকে বলে দি?

চম্পা উত্তর দেয়,—তোমার জন্মেই ভাবনা দাদু! তুমি বুড়ো মানুষ, আমায় ছেড়ে একা-একা থাকবে কি ক'রে?

শঙ্খ সর্দার হেসে উত্তর দেয়, আর নাতনির মাথায় হাত বুলোয়,—বেশ বলেছিস যা হোক্! বুড়ো দাদুর জন্মেই তোর ভাবনা! তুই তো আর পালিয়ে যাবি নি। আমার কাছেই থাকবি।

ভাটি হঠাৎ বলে ওঠে,—তা'হলে চম্পা রতনকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে গেল দাদু?

লবাই সর্দার হেসে বললে,—হ্যাঁ। রতনকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে গেল!

ভাটির চোখে-মুখে বিস্ময়, কৌতূহল আর আবেগ ফুটে ওঠে। গল্পে বাধা পড়ে গেল। লবাই সর্দারও যেন হঠাৎ তার এই বাপ-মা-হারা নাতনি ভাটির মুখের দিকে চেয়ে ক্ষণকাল কি ভাবতে লাগল। ভাটি আমার পাশেই বসেছিল। সে আমার একখানা হাত চেপে ধরল। তার হাতে যেন একটা কম্পনের ঢেউ চলছে। ভাটি আবার সর্দারকে প্রশ্ন করলে,—তারপর কি হ'ল দাদু?

—কতদিন শুনেছিস আমার মুখে এ গল্প। তবু দিদির আমার আশা মেটে না! লবাই সর্দার আবার সুরু করলে,—চম্পা বন্দিনী হয়েছে; ঘর ছেড়ে যাবার আর হুকুম নেই। সে আর বাঁশীতে হাত দিতে পারে না। শঙ্খ সর্দারের ওপরই পড়েছে নাতনিকে পাহারা দেবার ভার।

কিন্তু রাজার ছেলের বাঁশী আর বন্ধ হয় না। রাজার পাটের সেই উঁচু চূড়ায় বসে মদনকুমার বাঁশী বাজায়। শাল, তমাল আর বেত বনের ফাঁকে ফাঁকে তার বাঁশীর সুর ঢেউ তোলে, আছাড়ি পিছাড়ি খেয়ে বেড়ায় সে সুর। বন্দিনী চম্পা উত্তর দিতে পারে না, ছটফট করে। একদিন, দু'দিন, তিনদিন; চম্পা কিছুই মুখে দিতে চায় না। ফলে তার বুড়ো দাদুরও মুখে অন্ন ওঠে না।

এদিকে রাজার ছেলেরও ঐ একই অবস্থা। বাঁশীর সুর যেন কেঁদে কেঁদে ওঠে। কিন্তু মনের মানুষকে সে সুর যেন খুঁজে পায় না; চম্পা বাঁশীতে হাত দিতে পায় না। বাঁশীর সুরে তার বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে যেতে লাগল। রাজার ছেলেও জল স্পর্শ করে না। রাজা হুকুম দিলেন,—চম্পার বিয়ে দাও ওই রতনের সঙ্গে; তা'হলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

পাহাড়ী-পুঞ্জীর সকলেরই সেই ইচ্ছে। শঙ্খ সর্দার যেন আশার আলো দেখতে পেলে। মেয়ের বিয়ে হবে সামনের পূর্ণিমার দিনে। আমাদের একটা রীতি আছে দাদাঠাকুর! আমাদের বিয়ের সে রীতি বড় কঠিন ছিল।

বিস্মিত হ'য়ে প্রশ্ন করি,—কি রীতি? ছেলে আর মেয়ে নিজেরা পছন্দ ক'রে বিয়ে করে,—এই তো?

—হ্যাঁ, তবু আরো একটা রীতি আছে। সর্দার বলে,—বিয়ের আগের দিন সকলের অজান্তে হবু বউকে নিয়ে পালিয়ে যায় হবু বর। একটি রাত তাকে লুকিয়ে রাখতে হবে; তার পরদিনই হবে বিয়ে। কিন্তু সে রাত্রে তাদের খুঁজে পেলেই মহা বিপদ। লড়াই করে সবাইকে হারিয়ে দিতে হবে। তা না পারলে তাকে প্রাণ দিতে হবে।

সে রীতিটা এখন রদ হয়ে গেছে দাদাঠাকুর! তবুও দু'জনকে লুকিয়ে থাকতে হয় একটা রাত। মহারাণীর রাজত্বে তো আর খুন-জখম হ'লে রক্ষে নেই! অবশ্যি এখন খোঁজ-খবর নেওয়া হয় বৈকি? হৈ-হৈ ক'রে বল্লম আর সড়কি নিয়ে খুঁজে বেড়ায় জোয়ান ছেলেরা। কিন্তু এটা এখন একটা লোক-দেখানো আচারে দাঁড়িয়ে গেছে।

পূর্ণিমার আগের দিন। চতুর্দশীর চাঁদ দেখা দিয়েছে। থরে থরে জ্যোৎস্নার ঢেউ নেমে আসছে পাহাড়ের ওপর। শরৎকাল সেটা; কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো হবে পরের দিন। ঐ টিলায় ছিল স্থলপদ্মের বন। ফুটন্ত স্থল-পদ্মের পাপড়িগুলোর গোলাপী আভা যেন হাসাহাসি করছে; গাঢ় সবুজ কমলালেবুর ভারে কমলাবন ঝুঁকে পড়েছে। লেবুগুলো চিক্‌চিক্ করছে চাঁদের আলোয়। কাল চম্পার বিয়ে।

শঙ্খ সর্দারের ঘরের বাঁ-পাশ দিয়েই কমলার বন সুরু হয়েছে। তার ভেতর দিয়ে একটা পথ চলে গেছে ঐ পাহাড়ী ছড়ার দিকে। সেই পথে চলেছে দু'জন হাত ধরাধরি ক'রে; রতন আর চম্পা। মাঝে মাঝে কমলা বনের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলো পড়ছে তাদের মাথায়, মুখে আর গায়ে।

চম্পার মুখের দিকে তাকিয়ে শিউরে ওঠে রতন। তার মুখখানা যেন সাদা পাথরের মত দেখাচ্ছে; তাতে কোন ভাব বা আবেগের লেশমাত্র দেখতে পায় না রতন। হাত দু'খানিও যেন বরফের মত ঠাণ্ডা। চোখ তার পলকহীন, যন্ত্রের পুতুল যেন চলেছে।

রতন বিহ্বল হয়ে উঠল; নানা কথা তার মন তোলপাড় ক'রে তোলে। রতন ডাকে,—চম্পা, কাজ নেই, তুমি ফিরে যাও। চম্পা বলে,—সে হয় না রতন, রাজার হুকুম মানতেই হবে। রতন বলে,—শুধু কি রাজার হুকুম মানতেই তুমি আমার সঙ্গে চলেছ? চম্পা উত্তর দেয়,—কেন রতন? এ কথা আজ আবার কেন আমায় জিজ্ঞেস করছ? আমাদের দু'জনের মিলন তো কবে হয়ে গেছে।

চম্পার কথায় বিস্মিত হয় রতন। এ হেঁয়ালি সে বুঝে উঠতে পারে না। চম্পাকে জিজ্ঞেস করে,—তা'হলে রাজকুমারের বাঁশী তোমায় এত উতলা করে কেন? তুমি তো আগের মত আমার ডাকে সাড়া দাও না।

চম্পার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। খোদাই করা পাষাণ মূর্তি যেন আবেগে জীবন্ত হয়ে ওঠে। চম্পা বলে,—কিছুই বুঝতে পারিনে রতন; ওর বাঁশী শুনলে আমি সব ভুলে যাই। স্বপ্নের ঘোর নেমে আসে আমার দেহে আর মনে। গোকুলের কৃষ্ণের কথা শুনেছি। মনে হয়, সেই কৃষ্ণের বাঁশী আমি শুনছি; বৃন্দাবনে যমুনার তীরে আমার মত কতজন আকুল হয়ে তার বাঁশী শুনছে।

চম্পার কথা শুনে রতনের বুকে যেন নিঃশ্বাস আটকে যায়। অতি কষ্টে নিঃশ্বাস ছেড়ে রতন বলে,—তা'হলে তুমি তো সুখী হতে পারবে না চম্পা। রাজকুমার যতদিন বেঁচে থাকবে তার বাঁশী ততদিন আমায় সুখী করতে পারবে না! চম্পা উত্তর দেয়,—তা'হলে কি করতে চাও রতন? রতন বলে,—শোন চম্পা, আমার কথা শোন। যেখানে বাঁশী নেই, যেখানে মদনকুমার নেই, যেখানে তার বাঁশীর সুর ভেসে যাবে না, চল আমরা সেই দেশে চলে যাই এ দেশ ছেড়ে। চল চম্পা আমরা চলে যাই, আর আমরা ধরা দেব না।

চম্পার চোখে জল ঝরে। আবেগের সুরে সে বলে,—সে হয় না; তুমি বুঝবে না রতন। পাতালে গেলেও আমার নিস্তার নেই। সেখানেও বাঁশীর সুর আমার কানে পৌঁছবে। তার জন্য চিন্তা কেন? তুমি আমাকে চাও? আমি তো ধরা দিয়েছি তোমার হাতে। আর কি চাও রতন?

রতন আশ্চর্য হয়ে যায় চম্পার কথা শুনে ; স্তম্ভিতের মত শুধু তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে,—চম্পা, সত্যিই কি তুমি ধরা দিয়েছ ? চম্পা তার গলা জড়িয়ে ধরে,—হ্যাঁ রতন, ধরা তো দিয়েছি, তা' নইলে কি তোমার সঙ্গে আসি ?

ভাটির ওপর আমার চোখ পড়ল। সে যেন চম্পা আর রতনের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে শিউরে উঠছে। পুলকের আবেগে সে যেন তন্ময় হয়ে উঠেছে। হঠাৎ ভাটি বলে ওঠে,—আচ্ছা ভৃগু, এরকম হ'লে তুই কি করতিস।

ভাটির প্রশ্ন আমাকে চমকে দেয়। বুড়ো লবাই সর্দারের দিকে তাকিয়ে লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে উঠি ; ভাটির মুখে একি কথা ! আমাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে ভাটি বলে ওঠে,—বল না ভৃগু, চম্পা কি সত্যই রতনকে ভালবাসত ?

উত্তর দেয় লবাই সর্দার,—ভালবাসত বৈকি ! কিন্তু রাজকুমারের দিকে তার যে টান ছিল সেটা দৈবেরই একটা আকর্ষণ। কোন দেবতার শাপে চম্পা এসে পাহাড়ীদের ঘরে জন্ম নিয়েছিল। মদনকুমারও শাপভ্রষ্ট দেবতা। দেবতারাও মানুষের ঘরে জন্ম নেন। আর এখানকার কাজ ফুরোলেই বিদায় নেন। মা গঙ্গা এসে এক রাজার ঘরের ঘরণী হয়েছিলেন, জানিস সে সে গল্প ?

লবাই সর্দার বলতে থাকে,—তারপর চম্পা আর রতন চলেছে বনপথে। কোথায় গিয়ে লুকোবে, তারাই জানে। রতনের কাঁধে বড় একটা ধনুক : পিঠে তার তীরের তাড়া ; হাতে বল্লম। তার কোমরে বিষমাখা ছুরি। যোদ্ধার বেশ তার। চম্পার পরনে লাল রঙের ঘাঘরা ; গায়ে গোলাপী আঙরাখা। চুলগুলি এলোমেলো। জোর কদমে চলেছে তারা। দূরে হৈ-হল্লা শোনা যাচ্ছে। প্রাণের ভয় আছে তাদের। এমন সময় একদিক থেকে বাঁশীর সুর ভেসে আসতে লাগল ; উন্মনা হয়ে উঠল চম্পা। তাকে আর ধরে রাখা যায় না। রতনও চমকে উঠল বাঁশীর সুরে। সে সুর তার বুক যেন চিরে দিচ্ছে। হঠাৎ রতনের হাত ছাড়িয়ে ছুটে চলল চম্পা, সেই বাঁশীর সুর যেদিক থেকে ভেসে আসছে সেই দিকে।

চম্পা ছুটেছে ; বন-বাদাড় খেয়াল নেই, ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে দিয়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ছুটে চলেছে উন্মাদিনী চম্পা, আর তার পিছু পিছু ছুটেছে রতন।

রতন ডাকছে—চম্পা, চম্পা, চম্পা। চম্পা সাড়া দেয়,—আয় রতন, এই যে, আমার সঙ্গে আয়।

ছিঁড়ে গেছে তার ঘাঘরা, কাঁটা-বনের কাঁটায় হাতে পায়ে আঁচড় লেগেছে। জ্যোৎস্নার আলোতে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে রতন চম্পার হাতে-মুখে রক্তের ধারা। রতনের খেয়াল নেই; তারও হাত-পা আঁচড়ে গেছে। জ্বালা-যন্ত্রণা সে-ও ভুলে গেছে। এ যে সেই পাগল করা বাঁশীর সুর,—রাজকুমার মদনের বাঁশী। কিন্তু কই? কোথায়? চম্পা পথ ছেড়ে যেদিকে খুশী সেদিকে চলেছে। রতন তীর-ধনু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বর্শা হাতে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ছুটে যায়; চম্পাকে ধরতে চায় সে। কিন্তু কোথায় চম্পা? সে কি অদৃশ্য হয়ে গেল। ঘোর বন-জঙ্গল ভেঙ্গে কোথায় যায় চম্পা? বাঘ-ভল্লুক, জন্তু-জানোয়ার রয়েছে! হঠাৎ রণশিঙায় ফুঁক দিয়ে ওঠে রতন;—বিপদের সঙ্কেত! নিজের যে প্রাণ যাবে সেদিকে খেয়াল নেই। পাহাড়ের আনাচে-কানাচে সাতপুঞ্জী মথিত ক'রে তার প্রতিধ্বনি ওঠে শত শত শিঙায়!

ভাটি গল্প শুনে চমকে ওঠে। তার সমস্ত শরীর যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তার নরম আঙুলগুলো বরফে-ধোয়া বেলফুলের মত আমার হাত জড়িয়ে আছে। আমারও কৌতূহল বাড়ে। ভাটিকে বলি,—বড় ভীরু তুই! গল্প শুনে হিম কাঠ হয়ে যায় আবার!

লবাই সর্দার বলে,—হবে না দাদাঠাকুর! মোদের যে রক্তের টান রয়েছে। চম্পা যে মোদের ঘরেরই মেয়ে! আর আমার ভাটি,—ঠিক যেন চম্পাই আবার ফিরে এসেছে!

আমি রসিকতা ক'রে বললাম,—তা'হলে ভাটি! তোর বাঁশী কই? আর রাজার ছেলেই বা কোথায়? রাজপাটে বাঁশী তো শুনিনে!

ভাটি বলে,—শুনবি রে শুনবি! আমি শুনেছি।

আমি হাসতে হাসতে বলি,—তা'হলে সেই রতনই মোহন হয়ে জন্মেছে।

লবাই সর্দার হঠাৎ চমকে ওঠে। সে আকুল সুরে বলে,—দাদাঠাকুর! ছাড়ান দাও ওসব কথা। ভাটি ভয় পেয়ে যাবে।

ভাটি উত্তর দেয়,—না, না দাদু! ভয় পাব কেন! চম্পার কথা শুনলে আমার বড় কষ্ট লাগে। বাঁশীর আওয়াজ যেন শুনতে পাই!

লবাই সর্দার বলে,—হ্যাঁ, শুনতে পাবি বৈকি? আমি বুড়ো হয়েছি আমিই শুনতে পাই!

সর্দার হোঃ হোঃ ক'রে হেসে উঠল। তারপর আবার সে গল্প শুরু করলে। রতনের শিঙার আওয়াজ যেন পাহাড়-জঙ্গল প্রতিধ্বনিত করছে মনে হ'ল।

তারপর শিঙার শব্দে হুলস্থুল ব্যাপার! বুড়ো শঙ্খ সর্দার শিঙার আওয়াজ শুনে ধড়মড়িয়ে ঘুম থেকে উঠল। চম্পার বিয়ের স্বপ্ন দেখছিল সে। শঙ্খ সর্দার তাকিয়ে দেখে,—চম্পা নেই; সে তো আনন্দের কথা! কাল যে চম্পার বিয়ে। রতনের মত জোয়ান মরদ নিশ্চয়ই একটা রাত তাকে লুকিয়ে রাখতে পারবে। কিন্তু এত শিঙা বাজে কেন? কোন বিপদ হ'ল নাকি? সারা পাহাড়টা যেন তোলপাড় হচ্ছে,—কি হ'ল! ওই যে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে শিঙার আওয়াজ আসছে।

বুড়ো সর্দার উত্তেজিত হয়ে সেই পুরনো শঙ্খ হাতে নিয়ে উঁচু মাচানের ওপর থেকে জোরে ফুঁ দিলে। শিঙা আর শাঁখের আওয়াজে সে কি তুমুল কলরব! রাজপাটে রাজা আর শাস্ত্রীরা সচকিত হয়ে উঠল। তা'হলে কি আবার লুসাইরা রাজ্যে ছড়াও হয়েছে? শঙ্খ সর্দারের শাঁখের আওয়াজে রাজারও আত্মা কেঁপে উঠল। সে যে অনেক কাল! কুড়ি-পঁচিশ বছর কেউ অস্ত্র ধরেনি! রাজার হুকুমে সাজ সাজ রব পড়ে যায় সেই গভীর নিশীথে!

হতভম্ব বুড়ো রাজা। মহারাণী ছুটে এসে বলেন,—সর্বনাশ হয়েছে; মদনকে দেখতে পাচ্ছিনে। তার ঘরে সে নেই। তার বাঁশীও নেই।

চারদিকে পাহারা! কেউ কিছু বলতে পারে না। একি হ'ল?

রাজা বলেন,—কি আর হবে? নিশ্চয়ই কোথাও বসে বাঁশি বাজাচ্ছে।

সত্যিই সেই তুমুল কোলাহল ভেদ ক'রে প্রাণ-মাতানো করুণ বাঁশীর সুর ভেসে আসতে লাগল। রাজা বললেন,—ওই শোন, ওই শোন! ওই সুর লক্ষ্য ক'রে ছুটে যাও। বৃদ্ধ সেনাপতি বললেন,—কিন্তু মহারাজ! এত রাত্রে শিঙা আর শাঁখের আওয়াজ সব গুলিয়ে দিচ্ছে। কিছুই বুঝতে পারছি নে। ওই দেখুন,—পুঞ্জীতে পুঞ্জীতে মশাল জ্বলে উঠেছে। ঘোরাঘুরি করছে মশালগুলো। নিশ্চয়ই কোন শত্রু রাজপুরী আক্রমণ করতে এসেছে।

চাঁদের আলো যেন রক্ত-রাঙা হয়ে উঠল সে মশালের আগুনে। কি ভয়ানক ব্যাপার! মদনকুমারের খোঁজে শাস্ত্রীরা ছুটেছে। রাজা ভাবেন,—দেখি কি খবর আনে। আমার সাতপুঞ্জীর সর্দারেরা বেঁচে

থাকতে ভয় নেই। এখনও শঙ্খ সর্দার বেঁচে আছে। তারপর রাজা সেনাপতিকে বলেন,—ভয় নেই সেনাপতি! শুধু মদনকুমারের জন্তেই আমার ভাবনা! আচ্ছা, কাল না চম্পার বিয়ে? তবে কি কুমার চম্পার কাছেই গেছে? পাহাড়ীদের রীতি পালন করবে রাজার ছেলে? বিয়ের আগেই বউকে চুরি করবে?

রাজা রাগে থরথর করে কাঁপতে থাকেন। চম্পাকে অজগরের মুখে দেবো!—রাজা উত্তেজনায় চীৎকার ক'রে ওঠেন। মহারাণী মিনতি ক'রে বলেন,—তার দোষ কি মহারাজ! চম্পা,—চম্পা সাধারণ মেয়ে নয়! চম্পাকে অজগরের মুখে দিলে সর্বনাশ হবে। ওদের হু'জনের মিলন ঘটিয়ে দাও, তাতে দোষ হবে না।

এবার রাজা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন,—কৃষ্ণ-সখা অর্জুনের রক্ত! সে রক্তের কথা ভুলে যাও কেন মহারাণী? রাণী বলেন,—ভুলিনি কিন্তু ক্ষত্রকুলে এ রীতি আছে। রাজা বলেন,—সে হয় না, সে হচ্ছে বীরের ধর্ম। বাঁশীর ধর্ম কুল মজানো। ক্ষত্রিয় কারো কুল মজায় না। লড়াই ক'রে বীরের মত নারীকে তারা গ্রহণ করে।

রাজা রাগে কাঁপতে থাকেন। রাণী লুটিয়ে পড়েন মাটির ওপর।

গল্প শুনে আমিও আতঙ্কে কেঁপে উঠি। রাজার হুকুম আমারও অন্তরাত্মাকে বিহ্বল ক'রে তোলে। ভাটির মুখে কিন্তু মৃদু হাস। আশ্চর্য হয়ে বলে উঠি,—ছিঃ ভাটি! এমন বিপদে হাসতে আছে?

ভাটি উত্তর দেয়,—হাসব না? তারপর তো কাঁদতে হবে? মেয়েদের পরাণ তো কাঁদবার জন্তে রে!

সবাই সর্দার বলে,—পাগলী দিদি আমার! বুঝলে দাদাঠাকুর! ওর বাপ মা মারা গেছে কোন্ ছোট বেলায়! সেই থেকে আগলে বসে আছি। সবাই জানে, আমিই ওর বাপ আর মা। আসল কথা ভাটিও অনেকদিন জানতে পারে নি। যখনি জানতে পেরেছে, তখন থেকেই ওর মুখের আগল খুলে গেছে; পাগলামি বেড়ে গেছে ওর। কত কি বলে বুঝতে পারিনে।

আজ ভাটির এক নতুন রূপ দেখলাম। ভাটি পাগল! দাদুর কথায় সে যেন একটু লজ্জিত হ'ল; কিন্তু গল্প শোনবার আগ্রহ তার থামে নি। সে প্রশ্ন করে,—আচ্ছা তারপর কি হ'ল রাজপাটে?

—কতদিন কতবার সে গল্প শুনেছিস ভাটি! সবই তোর জানা কথা। কত আর শুনবি? তাই তো বলি আমার পাগলী দিদি! লবাই সর্দার হোঃ হোঃ ক'রে হেসে ওঠে। তারপর বলতে লাগল,—তারপর কি আর হবে? রাজপাটের চত্বরে দাঁড়িয়ে রাজা, রাণী আর সেনাপতি পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। দূর থেকে বাঁশীর সুর ভেসে আসছে; আর সমস্ত মশালগুলো ছুটে চলেছে সে দিকে। কত মশাল! শিঙা আর শাঁখ তখনও বাজছে। বনের পশু-পাখীরাও সে কোলাহলে যোগ দিয়েছে। গাছপালাগুলো যেন নেচে উঠেছে; পাখারা কিচির-মিচির ক'রে আকাশে উড়া-উড়ি করছে। রাজার শান্ত্রীরাও বাঁশীর আওয়াজ লক্ষ্য ক'রে ছুটে যাচ্ছে; তাদের হাতের খোলা তলোয়ার চিক্‌মিক্ করছে। মশালের আলোতে বল্লম আর বর্শা দেখা যাচ্ছে পাহাড়ীদের হাতে। কারো হাতে বা বিষ-কাঁড়।

এদিকে পাহাড়ী-ছড়ার সেই কালো পাথরের ঢিবির ওপর রাজার ছেলে মদন বসে বাঁশী বাজাচ্ছে। শত শত ধারায় উছলে উঠছে ঝরণার জল। চাঁদের আলোতে অপরূপ শোভা তাকে ঘিরে রয়েছে। বুঝলে দাদাঠাকুর! মনে হচ্ছিল, বৃন্দাবনের সেই গোপীরা সেই জলের কলকল শব্দের সঙ্গে নিজেদের হাসি মিশিয়ে দিচ্ছে। আকাশ-গাঙে যেন নেমে আসছে রাশি রাশি পারিজাত ফুল। রাজকুমার আপন মনে বাঁশী বাজানোয় বিভোর। তার কোন খেয়ালই নেই। কোথা থেকে ঝড়ের মত আলুথালু বেশে ছুটে এল চম্পা। চম্পার হাত-পা ছিঁড়ে গেছে; নাক-মুখ আঁচড়ে গেছে কাঁটাগাছের কাঁটায়; হাতে-মুখে তার রক্তের ধারা। ছুটে গিয়ে সে রাজকুমারের পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসল! বাঁশীর করুণ সুর পালটে গিয়ে মিলন-রাগিনী বেজে উঠল।

পাহাড়ীরা এগিয়ে আসছে। ছুটে আসছে উন্মাদ রতন। হাতে তার বিষ-মাখা পাহাড়ী ছুরি। রাজার ছেলের বুকে আজ সে ছুরি বসিয়ে দেবে। তারপর বসাবে নিজের বুকে। টলতে টলতে এগিয়ে যাচ্ছে সে। চম্পা কিংবা মদন কারো সেদিকে খেয়ালই নেই। চম্পার মুখের দিকে তাকিয়ে মদনকুমার বাঁশী বাজাচ্ছে আর চম্পা তার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে, চোখে তার পলক নেই।

রতন গর্জে উঠল,—কুমার! কুমার!—কুমারের চোখ দুটি পলকহীন।

একমনে বাঁশীতে সে সুরই দিচ্ছে। রতনের হাতের ছুরি চিক্‌চিক্ ক'রে উঠল। একে তো জ্যোৎস্না, তার ওপর পড়েছে মশালের আলো। রতন ডাকলে,—চম্পা! চম্পা!

চম্পা সাড়া দেয় না। এদের দেহে কি প্রাণ নেই? থেমে গেল পাহাড়ীরা সে দৃশ্য দেখে। বল্লম বর্শার মাথা নীচু হয়ে গেল। রাজার শাস্ত্রীদের তলোয়ারও হেঁট হয়ে গেল। মন্ত্রমুগ্ধের মত সকলেই বাঁশী শুনছে। সেই যুগল-মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে রতন; হাতে তার ছুরি। সেও দাঁড়িয়ে রইল। ঝির্‌ঝির্ ক'রে তারও গায়ে-মাথায় পড়ছে ফোয়ারার ধারা। রতন আবার ডাকলে,—চম্পা! চম্পা! সত্যিই কি তুমি আমার হাতে ধরা দিয়েছ?

এবার যেন টনক নড়ল। চম্পা জড়ানো সুরে উত্তর দিলে,—হ্যাঁ, তুমি বিশ্বাস করো। এখন বাঁশী শুনতে দাও।

মদনকুমারের বাঁশীর সুর হঠাৎ কেটে গেল। সে যেন একবার রতনের দিকে তাকাল। পাশে তার চম্পা; চম্পার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বাঁশীতে সুর দিল। করুণ রাগিনীর আলাপ চলছে। বিরহী রাধার করুণ বিলাপ পাহাড়ের গায়ে ঠেকে ঠেকে ফিরতে লাগল সুরে সুরে।

রতনও যেন কেমন বিহ্বল হয়ে উঠল; একবার ওপরের দিকে তাকিযে হাতের ছুরিখানি তুলে ধরে রতন পলকের মধ্যে নিজের বুকেই বসিয়ে দিলে সে ছুরি। ফিন্‌কি দিয়ে রক্তের ধারা বেরিয়ে এল। ফোয়ারার ধারা আর রক্তের ধারা মিশে গিয়ে চম্পা আর রাজকুমারেরও দেহ রাঙিয়ে দিল সে ধারা। রতন পড়ে গেল ছড়ার জলে। শুধু তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল দুটি কথা,—তাই হোক, তাই হোক চম্পা।

রক্তে লাল হয়ে উঠল ছড়ার জল। 'হায়, হায়' ক'রে উঠল পাহাড়ীরা। এগিয়ে এল শঙ্খ সর্দার। রতনকে তারা তুলে নিলে। রাজার হুকুম এসেছে, —বন্দী করো চম্পাকে আর মদনকুমারকে; নিয়ে এসো রাজার পাটে। শাস্ত্রীরা এগিয়ে এল। রতনের দেহ নিয়ে শিঙা বাজিয়ে মশালের আলোতে বনভূমি কাঁপিয়ে চলল পাহাড়ীদের মিছিল। শঙ্খ সর্দারের হাত ধরে চলেছে রতনের অন্ধ বাপ। পাহাড়-জঙ্গল কেঁদে উঠল দাদাঠাকুর! সে রাত্তিরে এই বনভূমি সত্যিই কেঁদেছিল।

বুড়ো লবাই সর্দার চোখ মুছতে লাগল। আমারও মনটা কেমন ক'রে

উঠল ওই রতনের জন্যে। রূপকথার কাহিনী যেন শুনছি! এ কি সত্যিই ঘটেছিল?—হ্যাঁ, সত্যিই। এ যে রাজার পাট আর ঐ যে সাপ-নালা তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

সবাই সর্দারের গল্পের মূর্তিগুলি যেন চোখের সামনে ভেসে উঠে; গভীর নিশীথে পাহাড়-জঙ্গল ভেদ ক'রে যেন হাহাকার উঠেছে। মানস-চক্ষে দেখতে পাই, রতনের দেহ নিয়ে পাহাড়ীরা মিছিল ক'রে চলেছে। শত শত মশাল চলেছে বন-বনানী ভেদ ক'রে; আর রতনের অন্ধ বাপ শঙ্খ সর্দারের হাত ধরে তার পিছু পিছু চলেছে।

সবাই সর্দার বলতে লাগল,—রাজপাটের উঁচু চূড়ার পাশেই গভীর খাদ; মস্ত বড় গহীন গহ্বর। তার মাঝে থাকে মস্ত বড় এক অজগর, রাজপুরীর বাস্তুদেবতা। রোজ রোজ আস্ত বড় ছাগল কিংবা ভেড়া ছেড়ে দেয় রাজবাড়ির জল্লাদ সেই গহীন গুহা-গহ্বরে। বাস্তুদেবতার ভোগে লাগে সে সব। অজগর ফণা তুলে ওপরের দিকে বাড়িয়ে দেয় তার সেই বিরাট ফণা। দূরে দাঁড়িয়ে স্তব-স্তুতি করে রাজা আর রাণী।

পুন্নিমের রাতে চম্পা আর রতনের হবে বিয়ে; তাই ঠিক হয়েছিল। কোজাগরী পুন্নিমে দাদাঠাকুর! আকাশ-গাঙে নেমে আসবে লক্ষ্মীদেবীর নৌকো। রাজার বিচার। হুকুম হয়েছে, আজ গভীর নিশীথে বিয়ের লগ্নে চম্পাকে অজগরের মুখে দেওয়া হবে—এই তার শাস্তি। ভ্রষ্টা মেয়ে রাজকুমারকে বিগড়ে দিয়েছে; তার আর ক্ষমা নেই। বুড়ো শঙ্খ সর্দার রাজার হুকুম শুনে থমকে দাঁড়ায়। সর্বাঙ্গ তার থর থর ক'রে কেঁপে ওঠে। আগুন জ্বলে ওঠে তার চোখে। চোখের জল নয়, চোখে নেমে আসে যেন আগুনের বন্যা।

রাজার আদেশ শুনে মহারাণী মূর্ছা যান। মদনকুমার কিন্তু নিষ্পলক, নিথর; তার মুখে কোন কথা নেই। রাজা কারো অনুরোধ কিংবা উপরোধে কান দিলেন না। তিনিও যেন পাষাণ হয়ে উঠেছেন। চম্পা নির্বিকার হয়ে সে আদেশ শুনলে; রাজার কাছে শুধু সে একটা মিনতি জানালে,—নিজেই স্বেচ্ছায় সে গুহায় ঝাঁপ দেবে; শুধু তার হাতে বাঁশী দিতে হবে। রাজা তার শেষ ইচ্ছা পূরণ করলেন।

স্নান সেরে গোলাপী ঘাঘরা আর সোনালী আঙরাখা পরলে চম্পা।

বনফুলে হ'ল তার আভরণ। সে নিশায় লক্ষীর প্রদীপ আর কারো ঘরে জ্বলল না। রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে আরতির কাঁসর-ঘণ্টাও যেন কেঁদে উঠল।

রতনকে পাহাড়ের চুড়োয় গোর দিয়ে পাহাড়ীরা তার শোকে জ্বলে-পুড়ে পুঞ্জীতে ফিরলে। তার ওপর রাজার এই হুকুম শুনে তারা ক্ষেপে উঠল। সবাই ছুটে এল শঙ্খ সর্দারের ঘরে। তারা বললে,—হুকুম দাও সর্দার! রাজপাট আমরা উড়িয়ে দেবো; চম্পাকে আমরা ফিরিয়ে আনবো।

সর্দার বললে,—না, না, না। তা হয় না। রাজা নিজের পাপে নিজেই তলিয়ে যাবে; নির্বংশ হবে রাজা। তোমরা দেখতে পাবে,—আজ এই কোজাগরীর রাত্রেই চম্পার সঙ্গে সঙ্গে রাজলক্ষ্মীও রাজপাট থেকে বিদায় নেবেন; বাস্তুদেবতাও বিদায় নেবেন আজ। দেখে নিও তোমরা।

শঙ্খ সর্দারের কথায় পাহাড়ীরা শান্ত হয়। গভীর রাত্রে ডঙ্কা বেজে ওঠে! সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পাহাড় জুড়ে বেজে ওঠে শত শত শাঁখ! মশালে মশালে ছেয়ে যায় পাহাড়ের চুড়ো। পাহাড়ী মেয়েরা শাঁখ বাজাচ্ছে;—চম্পার বিয়ের লগ্ন। বাঁশীতে সুর দিয়েছে চম্পা; ধীরে ধীরে সে এগিয়ে চলে সেই খাদের ধারে। কাছেই দাঁড়িয়ে আছে মদনকুমার, তাঁর হাতেও বাঁশী। খাদের ধারে খানিক থমকে দাঁড়িয়ে চম্পা একবার মদনকুমারের দিকে তাকিয়ে বাঁশীতে ফুঁ দিলে। তারপর সে ঝাঁপ দিল সেই গুহাগহ্বরে!

কি আশ্চর্য! বাস্তুদেবতা অজগর বিরাট ফণা মেলে চম্পাকে মাথায় তুলে নিলে। সবাই আশ্চর্য হয়ে দেখে,—গুহা-গহ্বর ভেঙ্গে অজগর উত্তরমুখে ঐ নদীর দিকে চলেছে; তার ফণার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে মূর্তিমতী লক্ষ্মী চম্পা। তখনও বাঁশী বাজছে। হঠাৎ মদনকুমার ঝাঁপিয়ে পড়ল গুহা-গহ্বরে। 'হায়, হায়' ক'রে উঠল রাজা। সর্দারের মুখে বিকট হাসি—হাঃ-হাঃ-হাঃ!

আমার চোখের সামনে চম্পা আর মদনকুমারের বিদায়-দৃশ্য ভেসে ওঠে। ভূমিকম্পের মত সমস্ত পাহাড়টা কাঁপছে; ভেঙ্গে যাচ্ছে পাহাড়। অজগর চলেছে উত্তরমুখে ঐ গাঙের দিকে! বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে আমি হঠাৎ দেখি, লবাই সর্দার উপরের দিকে তাকিয়ে দু'হাত তুলে প্রণাম করছে। কার উদ্দেশ্যে তা বুঝতে পারিনে।

ছলছল-চোখে ভারি গলায় লবাই সর্দার বলে ওঠে,—বুঝলে দাদাঠাকুর, সেই দিন থেকে কোজাগরীর রাত্তিরটা আমাদের কাছে অক্ষয় হয়ে উঠেছে।

প্রত্যেক বছর কোজাগরীর রাত্তিরে সাত-পুঞ্জীর যত লোক জড় হয় এই রাজপাটে। ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-মদ্দা সকলে দু'গাছি ক'রে মালা দেয় ঐ গুহা-গহ্বরে। শুধু কি আমরা? দূর-দুরান্ত থেকে কত লোক আসে মালা দিতে। সেই রাত্তিরে রাজপাটের ঢিবির ওপর দাঁড়ালে চম্পা আর মদনকে দেখতে পাওয়া যায়।

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করি,—কোথায় দেখা যায় তাদের?

সর্দার উত্তর দেয়,—গাঙের ঐ ডহরে! বুঝলে দাদাঠাকুর! ডহরের মাঝখানে ফুলের মালাগুলো জড় হয়ে ঘুরপাক খেতে থাকে। তারপর দেখা যায়, অজগর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে মাঝগাঙে। চাঁদ থেকে জ্যোৎস্নার স্রোত তরতর ক'রে ঝরে পড়ে তার মাথায়। আর সে স্রোতে নেমে আসে চম্পা আর মদনকুমার,—মদন বাঁশী বাজাচ্ছে, আর চম্পা তাকে জড়িয়ে আছে; ঠিক যেন রাধা আর কৃষ্ণ!

—তারপর, তারপর কি হয় সর্দার?

—তারপর তারা কোথায় মিলিয়ে যায় জ্যোৎস্নার সঙ্গে। গাঙের ডহর তোলপাড় ক'রে অজগর ডুব দেয়; সে শব্দে চমকে ওঠে সব লোক; তারপর আর কিছুই দেখা যায় না।

সর্দারের কথা শুনে বিস্মিত হই। ডহরের বুকে চলে যায় আমার দৃষ্টি। আমিও যেন অজগরের মাথায় চম্পা ও মদনকুমারের যুগল মূর্তি দেখতে পাই। স্বপ্নে বিভোর হয়ে ওঠে আমার মন।

কৌতূহল দমন করতে না পেরে সর্দারকে বলি,—তুমি নিজে দেখেছো সর্দার? আমায় দেখাবে তুমি?

হাসিমুখে সবাই সর্দার উত্তর দেয়,—নিশ্চয়, নিশ্চয় দেখাবো। আসুক সে কোজাগরী পুন্নিমে,—সে তো অনেক দেরী।

—আমি দেখতে পাব তো সর্দার? সবাই কি দেখতে পায়?

—হ্যাঁ ঠাকুর! নিশ্চয় তুমি দেখতে পাবে! যাদের পুণ্যির বল আছে, তারাই দেখতে পায়।

সর্দারের কথা শুনে আমার পুণ্যির বল আছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ হ'ল। তাই তো! পুণ্যির বল? এমন কি কাজ করেছি যে পুণ্যি বাড়বে? শুনেছি,—পুজো-আর্চা করলে পুণ্যি বাড়ে; কিন্তু তা তো করিই না। সন্ধ্যে-আহ্নিক সে-ও ভুলে গেছি। মনে পড়ে, যখন আমার পৈতে হ'ল—তখন সে

কি উৎসাহ! জানতাম মাথা মুড়িয়ে সন্ন্যাসী সাজলে সবাই খুব খাতির করে; অনেক কিছু দেয় সবাই। টাকা, সিকি, আধুলি, সোনা ও রূপোর জিনিস নতুন ব্রাহ্মণকে দান করে সকলে। অন্ধকার ঘরে বন্ধ থাকতে হয় তিন দিন। তারপর কয়েকদিন কি উৎসাহ! সোনার আংটি পেয়েছিলাম চারটে; টাকাও পেয়েছিলাম শতখানেক। কিন্তু মুশকিল হয়েছিল, সকালবেলা অভুক্ত থাকতে হ'ত। স্নান-আহ্নিক না করে জলস্পর্শ করবার হুকুম ছিল না। যেখানে সেখানে যখন-তখন খেতেও পারতাম না। হাসি পায় সে সব কথা মনে হ'লে। আর পুণ্যি? বছর বছর বারুণী-স্নান করেছি, সব পাপ তো ধুয়ে মুছে গেছে। কিন্তু এখন তো আর বারুণী-স্নান করি না! তা'হলে পুণ্যির বল কি আমার আছে?—হ্যাঁ, হ্যাঁ আছে! ঐ যে একদিন একটা সাপের মুখ থেকে মস্ত বড় একটা ব্যাঙকে বাঁচিয়ে ছিলাম; ঢিল ছুঁড়ে সাপটাকে দূর ক'রে দিয়েছিলাম; ব্যাঙটা পালিয়ে বেঁচেছিল। মাকড়সার জালে আটকে পড়েছিল একটা ফড়িং। মাকড়সাটা তাকে প্রায় জড়িয়ে ফেলেছিল; সেই ফড়িংটাকেও মুক্ত করে-ছিলাম। এসব তো পুণ্যির কাজ! হঠাৎ মনটা খচ্ ক'রে উঠল। কিন্তু মাকড়সাটাকে মেরে ফেলেছিলাম; কি হবে তা'হলে?

আমায় চুপ ক'রে থাকতে দেখে সর্দার জিজ্ঞেস করলে,—কি ভাবছ দাদাঠাকুর? নিশ্চয় তোমায় দেখাব।

নিরুৎসাহের সুরে জবাব দিই,—না সর্দার, আমার দেখা হবে না। আমার কি পুণ্যির বল আছে!

হাসতে হাসতে সর্দার জবাব দেয়,—কেন থাকবে না। তোমাদের আবার পাপ কি? ছোটদের পাপ হয় না দাদাঠাকুর! জ্ঞান-গম্যি হ'লেই পাপের সুরু হয়, বুঝলে!

সংশয়-দোলায় দোলে মন। কি! আমার কি এখনও জ্ঞানগম্যি হয় নি? —কি বলে সর্দার? এত লেখাপড়া করছি; রবীন্দ্রনাথের কবিতা বুঝি। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের চোখ নিয়ে প্রকৃতির মাঝে প্রাণের স্পন্দনও পাই। শেকস্-পীয়রের নাটকও পড়েছি। আমার কি এখনও জ্ঞানগম্যি হয় নি?

ভাটির কথা এতক্ষণ ভুলেই গিয়েছিলাম। তার দিকে চোখ পড়তেই দেখি, দু'হাতে মুখখানা ঢেকে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সর্দারও ছিল আনমনা।

ভাটিকে একটু ঠেলে দিয়ে বললাম,—এ কি ভাটি? তুই কাঁদছিস

ভাটির মুখে কথা নেই ; সে কেবলই কাঁদছে। সর্দার বিচলিত হয়ে উঠল। সে বললে,—আবার সেই রোগে ধরেছে পাগলীটাকে।

ভাটি বললে,—না, না. আমার বড় ভয় করছে ; ঐ যে, ঐ যে!

সবাই সর্দার স্নেহ-কোমল স্বরে বলে উঠল,—দূর পাগলী! তাই তো আমি চম্পা আর মদনের গল্প বলিনে তোর কাছে। কি জানো দাদাঠাকুর গল্পটা শুনলেই ভাটি এমনি ক'রে পাগলামি করে।

সর্দার ভাটির মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। তবুও তার কান্না থামে না। সে যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। সর্দার বলে,—কিরে অমন করছিস কেন? ভয় কিসের?

ভাটি কাঁপা গলায় উত্তর দেয়,—ঐ যে ঘরের মধ্যে তারা রয়েছে। দেখতে পাচ্ছ না? চম্পা আর মদন ;—তারা আমায় ডাকছে।

হোঃ-হোঃ করে হেসে ওঠে বুড়ো সর্দার। তারপর ভাটিকে বলে,—দূর পাগলী! কই, কোথা? আমরা তো দেখতে পাচ্ছিনে। কি বল দাদাঠাকুর?

ভাটির কথায় আমারও গা ছম-ছম ক'রে ওঠে। মনে মনে ক্ষেত্রদিদির সেই কালীকে স্মরণ করি। চম্পা আর মদন কি ভূত হয়ে ঘুরছে? সর্দারের কথায় বুকটা ধড়াস ক'রে ওঠে! এদিক-ওদিক তাকিয়ে উত্তর দিই,—কই কোথা? আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে।

ভাটি আমার কাছে এগিয়ে এসে ঘরের উত্তর দিকে একটা জায়গা দেখিয়ে বললে,—ওই যে, ওই যে, মিলিয়ে গেল। তোরা দেখতে পাসনি? দাদু যেই বললে,—মদনকুমার ঝাঁপ দিল, আর রাজা 'হায় হায়' করে উঠল, অমনি দেখি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে চম্পা আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে ;—ঐ যে, ঐ যে আবার!

সে আবার দু'হাতে চোখ-মুখ ঢাকলে। আমি বলে উঠলাম,—বড় ভীতু তুই ভাটি! এই তোর সাহস? কবে কোন্ যুগে তারা মরে গেছে।

সর্দার বিহ্বল-উদাস দৃষ্টিতে ওপরের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লে। ভাটি ছলছল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল ; তার চাহনি আমাকে বিহ্বল ক'রে তুলল। চুলগুলো তার এলোমেলো হয়ে গেছে। ডাগর ডাগর চোখে সে কি ভীতি-বিহ্বল দৃষ্টি! ভাটি কি পাগল হয়ে গেল?

সর্দার বিড় বিড় ক'রে মন্ত্র পড়তে লাগল। এক নিমেষে তার চেহারা পালটে গেল। দেখি দৈত্যের মত আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে লবাই সর্দার। আমি যেন কোন স্বপ্ন-রাজ্যে এসে পড়েছি ; আমার অন্তরাত্মা তখন কাঁপছে।

"ও কি মোহন ? খবরদার !"—চমকে উঠি সর্দারের কণ্ঠে মেঘের গর্জন শুনে। আমার মাথার ওপর দিয়ে ঠিক সেই সময় সোঁ ক'রে কি যেন একটা উড়ে গেল। সামনের দেওয়ালে খট্ ক'রে শব্দ হ'ল ; তারপর একটা তীর পড়ে গেল মেঝের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে কে যেন লাফিয়ে পড়ল মাচানের ওপর থেকে।

তীরটা দেখে ভাটিও চমকে উঠল। গা-ঝাড়া দিয়ে সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললে,—মোহন! মোহনের এই কাজ!

সর্দার উত্তর দিলে,—হ্যাঁ। সাবধান ক'রে দিয়ে গেল। কেন ? কেন ? কি হয়েছে ভাটি ?

ভাটি দৃপ্ত কণ্ঠে বললে,—তা আমি জানি নে। সাবধান করে দিয়ে গেল কাকে ? আমাকে ? না আর কাউকে ! এখানে আর কে আছে দাদু ?

সর্দার সেই মঞ্চ-গৃহের মেঝেতে পায়চারী করতে লাগল। তারপর আপন মনে বলতে লাগল,—শঙ্খ সর্দারের রক্ত বইছে আমার গায়ে ; ভাটির গায়েও তাঁর রক্ত রয়েছে। চম্পা আমাদেরই ঘরের মেয়ে। না, না,—এ হতে পারে না।

ভাটি যেন সর্দারের কথা কেড়ে নিয়ে উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল,—এ হতে পারে না দাদু! মোহন কি মনে ক'রে তীর ছুড়েছে ? তাকে বলতেই হবে।

পাহাড়ী মেয়ে ভাটি ; তার চোখে দৃপ্ত দৃষ্টি ; এক নিমেষে সে-ও বদলে গেছে। তার এলোমেলো চুলগুলো সিংহের কেশরের মত ফুলে উঠেছে। চোখ দিয়ে যেন তার আগুন ঠিক্‌রে বের হচ্ছে। ভাটি ছুটে যেতে চায়। ক্ষিপ্তা সিংহী চেঁচিয়ে বলছে,—দাদু! মোহনকে আজই শেষ কথা শুনিয়ে দেবো।

সর্দার দু'হাতে ভাটির পথ আগলে দাঁড়াল। তারপর সান্ত্বনার সুরে বললে,—দূর পাগলী! ওর কি মাথার ঠিক আছে ? কি শোনাবি মোহনকে ?

উত্তেজিত ভাটি জবাব দেয়,—তীর মেরে সাবধান করেছে! কেন ? মারুক না আমার বুকে। আমি বুক পেতে দেবো।

সর্দার বলে,—না ভাটি! তোকে বুক পেতে দিতে হবে না। ছেলেটা ক্ষেপে গেছে। এ বয়সে সবাই অমন হয়ে থাকে। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব। তুই কি মোহনকে ভালবাসিস?

ভাটি বলে,—না, না, আমি কাউকে ভালবাসি নে।

সর্দার বললে,—তা'হলে মোহনকে তুই ভালবাসিস নে?

ভাটি জোর গলায় বলে,—না, না,। কতবার বলব।

সর্দার হেসে উঠল তার কথা শুনে! তারপর বললে,—নিশ্চয়ই তোদের মধ্যে খিটিমিটি কিছু হয়েছে!

ভাটি বললে,—মোহনকে বারণ করে দিও দাদু! যেন আমায় আর বিরক্ত না করে।

সর্দার বলে,—নতুন কথা শোনালি ভাটি! তা'হলে এতদিন যা দেখেছি, যা শুনেছি, সবই মিথ্যে।

ভাটি উত্তর দেয়,—কোন কিছুই মিথ্যে নয়। আমি চাইনে কেউ আমার পিছু-পিছু হন্তে কুকুরের মত ছুটাছুটি করে।

সবাই সর্দার হোঃ হোঃ ক'রে হেসে উঠল,—বুঝেছি, অভিমান হয়েছে। আমারই দোষ হয়েছে ভাটি! আমার ঘাড় থেকে এবার বোঝাটা নামিয়ে দেবো।

ভাটির মুখ রাঙা হয়ে উঠল। সে উত্তর দিল,—কি বললে? আমি তোমার ঘাড়ের বোঝা? বেশ, আমি সরে পড়ছি; আমায় ছেড়ে দাও।

সর্দার ম্লান হাস্তে উত্তর দেয়,—আমার কথা বুঝলি নে ভাটি! আর বুঝবিই বা কি ক'রে? পরের ঘরে যখন যেতে হবে, তখন বুঝে-সুঝে সময় থাকতে যাওয়াই ভাল। আমিও নিশ্চিন্দি হতে পারি।

ভাটি জবাব দেয়,—কার ঘরে যাব? মোহনের?

সর্দার হেসে হেসে বলে,—তাই তো জানি। মোহনের মত আর এ তল্লাটে তেমন ছেলে কে আছে ভাটি?

ভাটির সুর অনেকটা নরম হয়। সে আবদারের সুরে বলে,—তোমার কথাই ভাবি দাদু! আর কে আছে যে তোমায় দেখাশোনা করে? আমি না হয় চলেই গেলাম!

সর্দার হাসিমুখে বলে,—আমার জন্তে তোর এত ভাবনা? এতদিন তো

বেশ দেখাশোনা করেছিস দিদি! সারাদিন ঘুরঘুর করছিস, একে মারছিস, ওকে ঘুরপাক খাওয়াচ্ছিস; এখন একটু স্থিতি নে।

ভাটি বললে,—বেশ, বেশ। তাই করবো।

আবার ভাটির চোখে জল ঝরতে লাগল। সে যেন কাউকে দেখতে পেয়েছে। ভয়ার্ত-কণ্ঠে সে বলে উঠল,—দাদু! দাদু! ঐ যে আবার তারা এসেছে।

ভাটি সর্দারের বুকে মাথা লুকায়। একহাতে ভাটির মাথা বুকে চেপে ধরে, আর এক হাতের ইসারায় কাকে যেন চলে যাবার ইঙ্গিত করে সর্দার। সর্দারের চোখেও জল! সে বিড়বিড় ক'রে মন্ত্র পড়ছে। আমার কানে আতঙ্কের সুরে তা বাজতে থাকে—

মরাং মরাং হিড়িম্বা।
কিড়িং কিড়িং পেঁচার ছা॥
ঘটোৎকচ চিড়িং চিড়িং।
কাঁড়ে হাত পাণ্ডবা॥
হটুং ঠুং হটুং ঠুং হটুং ঠুং।
কিড়িং কিড়িং মিড়িং ফুং॥

নির্বাক বিস্ময়ে সে দৃশ্য দেখি। এ কি মন্ত্র? বনমালী কবরেজের ভূতের মন্ত্রের কথা মনে পড়ে যায়। এক অজানা আতঙ্কে আমি শিউরে উঠি। ভাটির কথাবার্তা আমার কাছে রহস্যময় ঠেকে। সে মোহনকে পছন্দ করে না; সেদিন আমাকেও এই রকম বলেছিল। আবার এখন চম্পা ও মদনকুমারকে দেখছে। চম্পা তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। একি সম্ভব? লবাই সর্দার বলেছে, তারা স্বর্গে চলে গেছে; তারা তো দেবতা—রাধা আর কৃষ্ণ! তারা আবার ভয় দেখাতে আসবে কেন? ভূতেরাই তো ভয় দেখায়! নিশ্চয়ই ভাটির মনের ভ্রম!

বুড়ো লবাই সর্দার কিছুক্ষণ পর শান্ত হ'ল। ভাটিকে তুলে ধরে বসিয়ে দিলে মেঝের ওপর। সে যেন আছন্ন হয়ে গেছে কিসের ঘোরে। সর্দার আমাকে বললে,—দাদাঠাকুর! আমাদের বংশের ওপর কি জানি কার অভিশাপ আছে। সেই থেকে, সেই চম্পা চলে যাবার দিন থেকে কোন মেয়েই বাঁচে না এ বংশে। তেরো-চোদ্দ কোজাগরীর বেশী তারা দেখতে

পায় না। ভেবেছিলাম, ভাটি সে অভিশাপ কাটিয়ে উঠেছে। মনে হয়, ঘোমটা কোজাগরী কাটিয়ে দিয়েছে সে।

সর্দারের কথায় বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করি,—সত্যি সর্দার? সত্যি তোমাদের মেয়েরা বাঁচে না?

—হ্যাঁ সত্যি। আজ অবধি কোন মেয়েরই বিয়ে হয়নি শঙ্খ সর্দারের বংশে।

—কিসের অভিশাপ সর্দার? অভিশাপে এমন হতে পারে?

—নিশ্চয়ই পারে। শঙ্খ সর্দার বলে গেছলো, এ বংশে মেয়ে বাঁচবে না? রতনের বাপই এ অভিশাপ দিয়েছিল রতনের শোকে।

—রতনের জন্যে কি শঙ্খ সর্দারের বংশ এ অভিশাপ ভোগ করছে?

—হ্যাঁ দাদাঠাকুর। চম্পাই এ বংশে অভিশাপ নামিয়ে দিয়ে গেছে।

সর্দারের কথায় ব্যথিত হয়ে উঠি। চম্পার কি দোষ? হ্যাঁ, চম্পা যদি মদনকুমারের ডাকে সাড়া না দিত, তা'হলে এ কাণ্ড ঘটত না। আবার ভাবি,—কি করবে চম্পা? চম্পার কি হাত আছে? চম্পা যে শাপ-ভ্রষ্টা দেবতা। অভিশাপ কাটাতেই সে এসে জন্মেছিল! কিন্তু তার অভিশাপ কি বংশের পর বংশ বহন করবে? রতনের অন্ধ বাপ কি তা বোঝেনি? হ্যাঁ, পুত্রশোক! দারুণ পুত্রশোক লোককে পাগল করে। সেই আউলিয়ার কথা মনে পড়ে গেল।

ব্যথিত স্বরে সবাই সর্দারকে বললাম—সর্দার! নিশ্চয়ই এ অভিশাপ কেটে গেছে। এবার ভাটির বিয়ে দিয়ে ফেল।

সবাই হাসলে। সেই হাসিতে তার মুখখানি আরো ম্লান হয়ে উঠল। সে আমাকে বললে,—তাই হোক্ দাদাঠাকুর। আমাব পাগলী দিদি বংশের অভিশাপ কাটিয়ে দিক্। তোমাকে পেয়ে আমার সেই ভরসাই হচ্ছে।

—আমাকে পেয়ে? আমি কি করতে পারি সর্দার, বল আমাকে।

—বলব, নিশ্চয় বলব দাদাঠাকুর। সময় হলেই বলব। আজ আমার সকল সন্দেহ কেটে গেছে। পাষাণী অহল্যার এবার শাপ মোচন হবে।

—হ্যাঁ হবে। ভাটির বিয়ে দাও মোহনের সঙ্গে!

—তাই দেবো দাদাঠাকুর। কিন্তু তার আগে ভাটিকে বাঁচাতে হলে একটা কাজ করতে হবে। সেটা আগে হোক্।

—যা ভাল বোঝো, তাই কর সর্দার! ভাটি যা ভয় পেয়েছে

—না, না, সবই আমি বুঝতে পেরেছি দাদাঠাকুর! শঙ্খ সর্দারের বংশে ব্রহ্মতেজ পড়ে সে অভিশাপ কেটে দেবে। সেই গোপন কথাটাই আজ হঠাৎ আমার মনে পড়েছে।

সর্দারের কথা আমার কাছে হেঁয়ালির মত ঠেকে। ব্রহ্মতেজ? সে আবার কি? তা'হলে নিশ্চয়ই, রতনের অন্ধ বাপ এই ধরণের কোন কথাই বলে গেছে। রামায়ণী পালায় অহল্যার শাপ-মোচন দেখেছি; অভিশাপ দিয়ে গৌতম আবার বলে দিয়েছিলেন ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র এসে যখনই পাষাণে পা দেবেন, তখনই অহল্যার শাপ-মোচন হবে। সকল অভিশাপের শেষেই এই রকম একটা বিহিত থাকে। তা না হ'লে পাষাণী অহল্যা আজও পাষাণীই থেকে যেত।

এদিকে ভাটি এতক্ষণ মোহগ্রস্তের মত প্রায় অচেতন ছিল! সে যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল; ধীরে ধীরে সে চোখ খুললে। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে আমাকে বললে,—ভৃগু, আমার কথা শোন; তুই এখান থেকে পালিয়ে যা। তুই-ই যত গোল বাধালি।

তার কথায় হেসে জবাব দিই,—আচ্ছা। আমি চললাম, আর তোদেব কাছে আসব না।

—না, তোকে আসতে হবে না।

—আমি মরি, তাতে তোর কি?

—না কিছুই নয়। তোর জন্যই তীর ছুড়েছে; তুই পালিয়ে যা।

—আমার জন্যে তীর ছুড়েছে! কেন? কেন?

—সাবধান করে দিয়ে গেল আমাকে; তোকে নয়। আমাকে বলে গেল,—এপথ ছাড়, না হলে তীর বিঁধবে বুকে; এই প্রথম, তারপর দুই। তিনে আর রক্ষে নেই।

—কার বুকে বিঁধবে তীর? আমার?

—না, না, তোর বুকে নয়। আমারই মরণের দিন ঘনিয়ে এসেছে। শুনলি তো শঙ্খ সর্দারের বংশে মেয়েরা বাঁচে না।

হঠাৎ জোর গলায় সবাই সর্দার বলে উঠল,—বাঁচবে, বাঁচবে, এবার বাঁচবে। মেয়েদের বিয়েও হবে দাদাঠাকুর! ভাটিকে বাঁচতে হবে। সময় হয়ে গেছে, আর দেরী করলে চলবে না।

বুড়ো সর্দার আর ভাটির কথা আমার মনে সংশয় জাগায়। দুরন্ত

পাহাড়ীদের বিশ্বাস নেই। কি জানি আমাকেই যা মেরে বসে! ভাটি বলেছে, আমার জন্মেই মোহন তীর ছুঁড়েছে। কিন্তু কেন? আমার অপরাধটা কোন্‌খানে তা বুঝতে পারিনে। ভাটিকে বললাম,—তোরা সুখে থাক ভাটি! আমি আর এদিকে আসব না, আর আমার এখান থেকে চলে যাবার সময়ও হয়ে এসেছে।

উত্তর দিল সবাই সর্দার,—দাদাঠাকুর! অপরাধ নিও না, এরা দু'জনেই ছেলেমানুষ। তোমরা ব্রাহ্মণ; দেবতার রক্ত আছে তোমাদের দেহে।

ভাটি এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে বললে,—ভৃগু, সত্যি তুই চলে যাবি? যা, তুই যা! তোরা উঁচু জাত। আমরা তোদের কাছে কুকুর-বেড়ালের সামিল। উঁচু জাতের এঁটো-কাঁটা খেয়েই আমাদের বেঁচে থাকতে হবে।

—কেন একথা বলছিস ভাটি! তোরাও মানুষ; এঁটো-কাঁটা খেয়ে বাঁচতে যাবি কেন? —সান্ত্বনার সুরে ভাটিকে বলি।

আমার কথা শুনে ভাটি হাসলে। সে আমার হাতখানি চেপে ধরল। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সে। তার স্পর্শ ও তার কথাবার্তা আজ সম্পূর্ণ নতুন ঠেকে। পাহাড়ী মেয়েরা নিশ্চয়ই মায়া জানে! কই? সুব্রতা, অচলা, নন্দা আর সুরবালা কত মেয়েকেই তো দেখেছি। তারা তো এমন মায়া জানে না! ভাটির মধ্যে আজ যেন এক অপরূপ মায়াবিনী খেলা করছে। এ কি আকর্ষণ তার চোখে-মুখে?

ভাটির কাঁধে হাত রেখে বললাম,—তুই আজ এ সব কি বলছিস ভাটি; আচ্ছা, মোহন যদি রাগ ক'রে থাকে, আমিই তাকে বুঝিয়ে বলব, আমার যাবার আগে তোদের সুখী দেখে যাব।

সর্দার গম্ভীর স্বরে হাসিমুখে বললে—না দাদাঠাকুর, তুমি ভুল বুঝো না। তুমি আসবে, তোমার কোন ভয় নেই।

উত্তর দিলাম,—ভয়? আমার আবার কিসের ভয় সর্দার? তোমরা রয়েছো, ভয় করব কাকে? তবু বলছি, মোহন যদি সত্যিই রাগ করে। আর সত্যি বলছি সর্দার, আমি অনেক দূরে চলে যাব।

ভাটি বললে,—তুই আমাদের ভুলে যাবি ভৃগু। কোথায় যাবি? অনেক দূরে,—রাজার শহরে সাহেবদের কাছে পড়বি?

ভাটির কথায় হাসি পেয়ে যায়। তাকে বললাম,—সাহেবদের কাছে পড়ব কেন? এদেশের লোকও পড়াতে জানে ভাটি!

সে অভিমানের সুরে বলে,—এত পড়ে কি হবে ভূত? অনেক তো পড়লি।

লবাই সর্দার বলে, ওঃ বুঝেছি,—হাকিম হবি, বিচার করবি। বেশ, বেশ, আমাদের ভুলে যাস নি।

হাসি পায় সর্দারের কথায়। আবার সেই হাকিম হবার কথা। আমি নিশ্চয়ই হাকিম হবো না। পাহাড়ীদের সর্দার মন্ত্র-তন্ত্র জানে, যাদু জানে সে। তুক্-তাক্ ক'রে লোককে বশ করতেও পারে। সেদিন ভাটি একটা মস্ত বড় কদম গাছ দেখিয়ে বলেছিল, এ গাছে দাদু বাণ মেরেছে, তাই এই গাছের পাতা শুকিয়ে যাচ্ছে; মরে যাবে এ গাছটা। এখন তো মানুষের ওপর মারতে পারে না; তাই বছর বছর গাছের ওপর দিয়ে বিদ্যেটা জিইয়ে রাখে।—বাণ! মন্ত্রের বাণ! যার ওপর বাণ মারে, তার মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে? দিন দিন শুকোতে থাকে সে, তারপর একদিন মরে যায়।

কত কথা মনে জাগে, কারো মুখ দিয়ে রক্ত উঠলে লোকে বলাবলি করে,—কোন দুষমণ বাণ মেরেছে। চিকিৎসায় কোন ফল হয় না। কত দেখেছি ছোট বেলায়। তারপর বনমালী কবরেজের কাছে শুনেছি, এরকম রোগও আছে। যক্ষ্মারোগ,—মুখ দিয়ে রক্ত উঠে। কবরেজ বলতেন,—'উদরী বাদরী যক্ষ্মা, এ তিনে নেই রক্ষা।' ভেবেছিলাম লবাই সর্দারের কাছ থেকে মন্ত্র-তন্ত্র শিখে নেবো, কিন্তু বাণ মারার কথা শুনে গা শিউরে উঠল; তা শেখবার প্রবৃত্তি আর রইল না। তবু আজ মনে হ'ল,—সেই জীবন পরামানিককে জব্দ করতে হ'লে এরকম বাণই মারতে হবে। চন্দ্রাদির মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে হবে।

সর্দারকে বললাম,—আমার একটা কথা রাখবে সর্দার?

লবাই সর্দার উত্তর দেয়,—কি দাদাঠাকুর? তোমার কথা রাখব, সে তো আমার ভাগ্যি। কিন্তু আমারও একটা কথা তোমায় রাখতে হবে!

কোন কিছু না ভেবেই বললাম,—নিশ্চয় রাখব। তুমি আমায় বাণ মারাটা শিখিয়ে দাও। না হয় তুমি আমার হয়ে একজনকে বাণ মেরে দাও।

হোঃ হোঃ ক'রে সর্দারের সে কি হাসি! তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললে,—দাদাঠাকুর! ছিঃ, ছিঃ, ওসব কুহকী বিছে শিখতে নেই। দেখছো না, বংশে আমাদের শান্তি নেই। জোয়ান ছেলেরা মরে যায়। বিয়ের বয়স হ'তে না হ'তেই মেয়েরা বিধেয় হয়। অমন যে শঙ্খ সর্দার, তারও বংশ লোপ পাবে ওই ভাটির সঙ্গে।

বুড়োর কথা শুনে ভয় হ'ল। মনে হ'ল, আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষেত্রদিদি হাতের ইসারায় আমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছেন। আমি তন্ময় হয়ে গেলাম। ভাটি বলে উঠল,—ছিঃ ভৃগু! কাকে বাণ মারবি? না, না, ওসব কথা ভাবতে নেই। যার যা কর্মফল সে তা ভোগ করবে। তুই নিমিত্তের ভাগী হতে যাবি কেন?

সর্দার বললে,—ভাটি ঠিক বলেছে দাদাঠাকুর! পাপের শাস্তি ভগবানই দেবেন। তাঁকে কেউ ফাঁকি দিতে পারবে না। তুমি কারো ওপর আক্রোশ রেখো না।

আমি বললাম,—সে যে মহাপাপী সর্দার! কতলোকের কত সর্বনাশ করছে—আমি জানি, আমি দেখেছি।

সর্দার বললে,—তা হোক্। তারও কারণ রয়েছে দাদাঠাকুর! সময় হ'লে তার শাস্তি আপনা-আপনি নেমে আসবে। ছেলেমানুষ তুমি, এখনও তা বোঝবার বয়স তোমার হয়নি।

তাদের কথায় যেন সম্বিৎ ফিরে এল। নিরুৎসাহ হয়ে বললাম,—আচ্ছা, তাই হবে। কিন্তু তোমার কথা কি বলবে বল সর্দার?

সর্দার বললে,—সে আমি আপনা থেকেই পাব দাদাঠাকুর, অপরাধ নিও না।

তার কথা বুঝতে পারিনে। ভাটির মুখ লাল হয়ে উঠে। সর্দার বলে,—হ্যাঁ, তোমায় ভাটির বিয়ে দেখে যেতে হবে দাদাঠাকুর! এই সামনের পূর্ণিমায়।

তারপর লবাই সর্দার ভাটির দিকে তাকিয়ে বললে,—কি বলিস দিদি! দাদাঠাকুরকে যখন কথা দিয়েছি তখন একটা কিছু তাঁকে দিতে হবে। আমার পাওনাও আমি পেয়ে যাব।

লবাই সর্দার তারপর বিড়বিড় ক'রে অস্পষ্ট ভাবে কি যেন আওড়াতে আওড়াতে মঞ্চগৃহ থেকে বেরিয়ে গেল। অকস্মাৎ কি যে হ'ল বুঝতে

পারলাম না। আমার চোখ দুটো ঘুমে জড়িয়ে এল। আমি চাটাইয়ের ওপর শুয়ে পড়লাম। তারপর মনে হ'ল, ভাটি এগিয়ে এসে আমার মাথা কোলে তুলে নিল। স্বপ্নের ঘোর না বাস্তব বোঝবার শক্তি আমার ছিল না।...শরীরে যেন কেমন একটা পুলক-শিহরণ জাগে।

•

কতক্ষণ যে ঘুমিয়ে ছিলাম বুঝতে পারিনি। ভাটি বললে,—চল্ ভৃগু, তোকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

বাইরে বেরিয়ে দেখি, অন্ধকার নেমেছে; পাহাড় জুড়ে জোনাকী জ্বলছে টিপ্ টিপ্ ক'রে। ভাটি আমার হাত ধরে এগিয়ে চলল। সর্দারকে আর দেখতে পেলাম না। আমার সে মোহ-ঘোর তখনও কাটেনি। কি যে হয়েছিল আমার! ভাটিকে বললাম,—আচ্ছা ভাটি। তোরা মায়া জানিস?

আমার কথা শুনে ভাটি হেসে ওঠে,—হ্যাঁ জানি। কেন? কি হয়েছে?

তাকে বললাম,—আমি কেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বলতে পারিস?

ভাটি মুচকি হেসে বললে,—দাদুই তার পাওনা উসুল করবার জন্যে তোকে ঘুম পাড়িয়েছিল।

—তোর দাদু আমাকে ঘুম পাড়িয়েছিল? কেন?

—তার সেই পাওনা আদায় করতে।

—কি পাবে সে আমার কাছে?

—ভুলে গেলি? তুই যে বলেছিলি তোর কথা রাখলে তারও কথা রাখবি।

—কই? সে তো কিছুই চায়নি আমার কাছে!

—মুখে চায়নি! কিন্তু মন্ত্রের জোরে তা আদায় ক'রে নিতে চেয়েছিল। আমিই তাকে ফাঁকি দিয়েছি; অথচ তার পাওনাও সে পেয়ে গেছে। শুধু আমিই ঠকে গেছি ভৃগু! আমার জীবনটাই আজ থেকে জ্বলে-পুড়ে ছাই হবে দিন দিন।

—তোর কথা বুঝতে পারলাম না ভাটি!

—বোঝবার দরকার কি? মনে রাখিস শঙ্খ সর্দারের বংশে বাতি দিতে আর কেউ থাকবে না! ব্রহ্মতেজ ধরতে গিয়ে দাদু ফাঁকিতে পড়ে গেছে

—ব্রহ্মতেজ ? সে কি ভাটি !

—হ্যাঁ ব্রহ্মতেজ। তুই যে ব্রাহ্মণ। তোরই তেজ আমাকে দিয়ে ধরাতে চেয়েছিল। বুঝলি ?

বিস্মিত হই ভাটির কথায়। তার কথার মর্মার্থ তখন বুঝতে পারিনি। ভাটি আমার হাতে মৃদু চাপ দিল ; কি যেন উষ্ণতা তার দেহে তরতর করে বইছে !

হঠাৎ ভাটি নিচু হয়ে আমায় প্রণাম ক'রে বললে,—আমায় ক্ষমা কর ভৃগু ! তোর অনিষ্ট আমি করতে পারব না। তুই আর এখানে আসিস্ নে। চম্পা আমায় ডেকেছে, আর আমি বেশী দিন থাকব না রে ! তোর মাঝে আমি বাঁশী হাতে মদনকুমারকে দেখেছি।

ভাটির হাত ধরে তাকে উঠিয়ে বললাম,—ছেলেমানুষী করিস নি ভাটি ! এসব গল্প শুনতে শুনতে তোর মাথা বিগড়ে গেছে। আমি বলছি তুই মোহনকে বিয়ে কর।

ম্লান হাসি ভাটির মুখে দেখা দিল। সে আমায় অনুযোগের সুরে বললে,—আমার বিয়ে হয়ে গেছে ভৃগু।

আশ্চর্য হয়ে বলি,—বিয়ে হয়ে গেছে ? কার সঙ্গে হ'ল ?

ভাটি বলে,—হ্যাঁ হয়ে গেছে। একজন স্বামী থাকতে আর কি বিয়ে করা চলে রে ?

তার কথায় মনে সংশয় জাগে। হয়ত বা লুকিয়ে কাউকে বিয়ে ক'রেছে। পাহাড়ীদের বিশ্বাস নেই। সেইজন্যই আর মোহনকে চায় না। ভাটিকে জিজ্ঞেস করলাম,—তাই স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দে না বাপু। কাকে বিয়ে করেছিস দাদুকে জানিয়ে দে। বুড়ো মানুষ নিশ্চিন্দি হোক্। আর পাগলামি করিস নি।

ভাটি উত্তর দেয়,—বলবার সময় হ'লেই বলব ভৃগু ! আমি দেবতার পায়েই নিজেকে সঁপে দিয়েছি ! দাদু চেয়েছিল ব্রহ্মতেজ ; সে তেজ ধরেছি আমি অন্তরের মধ্যে ! মানুষের মাঝে আমি দেবতা দেখেছি। তুই আমায় ভুলে যাস নি ভৃগু !

তার কথার আবেগে আমি বিচলিত হয়ে উঠি। তাকে বলি,—তোকে ভুলব না রে। তুই সুখী হ'।

ভাটির দুই চোখে ধারা নামল। যাত্রা-নাটকে দেখা আত্ম-সমর্পণের

অভিনয় যেন আমার সামনে ঘটছে। পাহাড়ী অরণ্যপথে আমি আর ভাটি। আকাশে অসংখ্য তারকা ঝিকৃমিকৃ করছে; ঝোপ-জঙ্গলে জোনাকী পোকা মিট-মিট ক'রে জ্বলছে আর নিভছে। কাছে কোথায় শেয়াল ডেকে উঠল—হুক্কা-হুয়া, হুক্কা-হুয়া। পাশেই শিমুলগাছে কোকিল ডেকে উঠল—'কুহু কুহু'।

ভাটি বললে,—বনের পাখী বনেই থাকবে ভৃগু! সোনার খাঁচায় তাদের সুখ নেই। ঝড়-ঝাপটা সইলেও তাতেই তার সুখ।

—বেশ কথা বলতে শিখেছিস তো তুই! তা বনেই থাক। আমি বনের পাখী ধরতে আর আসব না।

—তুই বড় বোকা। ধরতে পারবি কেন? ধর দেখি।

মুহূর্তের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল ভাটির চোখে-মুখে। ফিকৃ করে হেসে আমার হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে সে পালিয়ে যাবার ভান করলে। হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে গেলাম, এদিক-ওদিক পাশ কাটালে সে। তারপর হঠাৎ এক সময়ে ধরা দিলে। তাকে জড়িয়ে ধরে বললাম,—আমিও বুনো হয়ে থাকব ভাটি তোদের সঙ্গে।

ভাটি ছিটকে দূরে সরে গেল। আদেশের সুরে যেন বললে,—যা, যা, ওই যে খেয়া নৌকো ঘাটে এসে পড়ল।

আশ্চর্য মেয়ে এই ভাটি! তার হাবভাব সম্পূর্ণ পালটে গেল। আমি ঘাটের দিকে এগিয়ে চললাম। ভাটি দাঁড়িয়ে রইল। বারবার ফিরে তাকাই তার দিকে। মনে সংশয় জাগে,—সত্যিই কি ভাটি আমায় বাঁচিয়ে দিয়েছে? সে কি আমায় ভালবাসে?

বাড়ি ফিরে দেখি তান্ত্রিক চন্দ্রনাথ এসেছেন। শৈশবের স্মৃতি ভেসে ওঠে। সেই চন্দ্র মামা,—কালভৈরবের তলায় সদ্য বলি দেওয়া পাঁঠার রক্ত যিনি পান করতেন। অনেকদিন পর তাঁকে দেখলাম। তপ্ত-কাঞ্চনের মত সুগৌর তাঁর গায়ের রঙ; একহারা লম্বা চেহারা। বয়স তখন ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হবে। লম্বা লম্বা সুন্দর চুল। সুকৃষ্ণ সুন্দর দাড়ি-গোঁফে মুখখানি যেন আরো সুন্দর হয়ে উঠেছে।

সকলেই বলত,—চন্দ্রনাথ কালী-সাধক। ভবতারণ আচার্যি বলতেন,—কালীর পাঁঠা। মদ আর রক্ত দুই-ই তাঁর কাছে সমান। পাঁঠা-বলির সময় উন্মত্ত হয়ে উঠতেন তিনি। 'মা' 'মা' বলে চীৎকার ক'রে কালভৈরবের

তলায় পড়াগড়ি করতেন চন্দ্রনাথ। সে সব কথা এখনও ভুলিনি। এগার-সতীর আচার্যি-পাড়ার সেই ভৈরবের বেদী এখন কি আর আছে?

মা বলতেন,—চন্দরদা মস্ত বড় সাধক রে! ওকে অবহেলা করিস নি। তুই যখন হামাগুড়ি দিতে শিখেছিস, তখন একদিন পিদীমের আগুন তোর জামায় লেগে যায়; সারা গা তোর পুড়ে গিয়েছিল! কি যন্ত্রণা তোর! হঠাৎ চন্দরদা কোথা থেকে ছুটে এসে নিজের আঙুল কেটে রক্ত বের করে এক বাটি নারকেল তেলে সেই রক্ত মিশিয়ে দিলে। তারপর সেই নারকেল তেল মাখিয়ে দিলে তোর গায়ে। তুই শান্ত হলি। দু'এক দিনেই তুই ভাল হয়ে উঠলি। কালীগঞ্জের ডাক্তার সুদ্ধ আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল! ফোস্কা মিলিয়ে গেল, গায়ে কোন দাগও পড়েনি।

সেই চন্দ্রনাথ আমার সম্মুখে। তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন,—কি রে ভৃগু! বেশ বড় হয়েছিস তো? কলেজের পড়া শেষ হয়ে গেছে! এবার মা-কালী তোকে ডাকছেন। কালীর স্থানে কলকাতায় যাবি। তার আগে তোর মা যে মানত করেছিল, সেটা পালন ক'রে যেতে হবে।

শুনেছিলাম সেই আগুনে পুড়ে যাবার দিন মা মানত করেছিলেন,—বড় হয়ে ভুবন পাহাড়ে ভুবননাথের মাথায় আমি একশো আটটা বেলপাতা দিয়ে আসব। আজ অবধি তা হ'য়ে ওঠেনি। মা, বাবা—দু'জনেই চলে গেছেন। নিজের মনেও যথেষ্ট দ্বিধা আর সংশয়। এসব মানত করার কি কোন অর্থ আছে? দেবতাকে ঘুষ দেওয়া বৈ তো নয়? রামায়ণের রামচন্দ্রের দুর্গা পুজোর কথা মনে পড়ে যায়,—দুর্গাকে ঘুষ দিয়ে রামচন্দ্র রাবণ বধ করেছিলেন।

চন্দ্রনাথ বললেন,—তাই আমি এসেছি রে! আর তো কেউ নেই। তুই যাবি পশ্চিমে। পুবে কি আর ফিরবি? পুবের দেবতাকে প্রণাম না ক'রে গেলে পশ্চিমের যাত্রা তোর সফল হবে না। দেবতাকে বঞ্চিত করতে নেই বাবা!

মদ্যপান করলে আবোল-তাবোল বকতেন চন্দ্রনাথ। কোনদিন এর বেশী বেচাল হ'তে তাঁকে দেখিনি! আজ কিন্তু তাকে বেশ ধীর গম্ভীর দেখাচ্ছিল। তরুণ শিবের মূর্তি যেন আমার সামনে। কপালে বেশ বড় রকমের সিঁদুরের ফোঁটা জ্বল জ্বল করছে। চোখ দুটি রক্তাভ এবং কেমন যেন ভাবঘোরে

বিহ্বল। ছোটবেলায় তাঁকে এড়িয়ে চলতাম আমরা। মনে করতাম,—মদ্যপায়ী চন্দ্রমামার দয়া-মায়া নেই; কালী-সাধকরা নির্মম নিষ্ঠুর; এঁরা মানুষকেও কাটতে পারে। জৈন্তার কালী-বাড়িতে নাকি কালী-সাধকরা নরবলি দেয় প্রতি অমাবস্যায়। ইংরেজের দাপটে কালী-সাধকরা এখন কতকটা ঢিট হয়েছে; তবুও লুকিয়ে-চুরিয়ে ঘোর জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ব্রাহ্মণের ছোট ছেলেদের বলি দেয়। কালী-সাধকরা আমাদের মনে বিভীষিকাই জাগিয়েছিল।

চন্দ্রনাথের কথায় আজ মন সাড়া দিয়ে উঠল। কোথায় কালী-স্থানে পশ্চিমে যাব আমি! এখনও যে তার কোন ব্যবস্থাই হয়ে ওঠেনি। সুদূরের পথে কে আমায় সাহায্য করবে? এত টাকাই বা দেবে কে? চন্দ্রমামাকে বললাম,—আমার মানত কি না দিলেই নয় মামা?

চন্দ্রনাথ বললেন,—দেবতাকে ফাঁকি দিতে নেই রে বাবা! এবার ভুবন পাহাড়ে ভুবননাথকে দেখতে চলেছি তোরই জন্যে। হঠাৎ তোর মায়ের কথা মনে পড়ে গেল; তাই ছুটে এলাম। তোর পিসীকে বলেছি তুই যাবি আমার সঙ্গে।

তা'হলে চন্দ্রনাথ সবই ঠিক ক'রে ফেলেছেন। আমি কালী-স্থান কলকাতায় যাব? আমার স্বপ্ন কি সত্য হবে? চন্দ্রনাথ কি ক'রে জানলেন, বুঝতে পারিনে। কিন্তু আমার যাবারও কোন ঠিক নেই। এত খরচ-পত্রই বা দেবে কে? কদিন থেকেই তা ভাবছি। তাঁকে বললাম,—কোথায় যাব তার ঠিক নেই; তার জোগাড়-যন্ত্রও হয়ে ওঠেনি।

তিনি বললেন,—হয়ে যাবে বাবা! তুই চল্ আমার সঙ্গে। আমার মা জগদম্বা রয়েছেন কি করতে? সে ব্যবস্থা তিনিই করবেন। আমি তোকে নিয়ে যেতেই এসেছি। বড় সুন্দর জায়গা; পাহাড়ে-ঘেরা সুড়ঙ্গ পথে যেতে হয়। তারপর দেখবি বাবা ভুবননাথ শিব। অর্জুন পুজো দিয়ে গিয়েছে রে। নাগরাজকন্যা উলুপী ও অর্জুনের প্রতিষ্ঠিত এ শিব।

ভুবন পাহাড়ের শিবের কথা শুনেছি। অর্জুনের কাহিনীও জানি। কিন্তু এ শিব যে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত তা জানতাম না। সুড়ঙ্গ পথে যেতে হয় সেখানে! কত অদ্ভুত কথা শুনেছি এই সুড়ঙ্গ-পথের সম্বন্ধে! ভাবতাম, এত দূরে জনহীন পাহাড়ের মাঝখানে কোথা থেকে এ শিব এসেছে! শুনেছি নাকি কত দেব-দেবীর মূর্তিও আছে ঐ সঙ্গে। শুধু শিবচতুর্দশীতেই লোকে

যেতে পারে ; অন্য সময় যাবার কোন উপায় নেই। বাঘ-ভালুকের মেলা। অন্য সময় ঐ পথে পা বাড়ালে নির্ঘাত মৃত্যু ? এমনি বাবা ভুবননাথের লীলা। —আজ আকস্মিকভাবে চন্দ্রনাথের এই আবির্ভাব এবং তাঁর প্রস্তাব আমার কাছে দৈববাণীর মতই মনে হ'ল। তাঁকে বললাম,—হ্যাঁ আমি যাব।

চন্দ্রনাথ বললেন,—তোরা তো এসব বিশ্বাস করবি নে বাবা! জাগ্রত ঠাকুর আছেন সেখানে। ওখান থেকে একটা সুড়ঙ্গ-পথ চলে গেছে কামাখ্যায়, আর একটা চলে গেছে কাশীতে বাবা বিশ্বনাথের কাছে। মা-গঙ্গা সুড়ঙ্গ-পথে এসেছেন ভুবননাথের পা ধুয়ে দিতে। দেখবি, নিজের চোখে দেখলে বিশ্বাসও করবি। নাগ-কন্যা উলুপীর কথা তো শুনেছিস ? আর মণিপুরের রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার কথাও পড়েছিস মহাভারতে ? মণিপুর আর নাগরাজ্য পাশাপাশি রয়েছে। তারই পাশে ভুবননাথের আসন। অর্জুন এসে তাদের জন্যই ভুবন পাহাড়ে ভুবননাথ শিব স্থাপন ক'রে গেছেন। নাগারা এই শিবের পুজো করে।

মহাভারতের কাহিনী মনে পড়ে যায়। অর্জুন আর বভ্রুবাহনের যুদ্ধের কথা মনকে তোলপাড় করে। মণিপুরের রাজবংশ অর্জুনের পরিচয় দেয়। কাছাড়েই ছিল হিড়িম্বা আর ঘটোৎকচ! কাছাড়ে এসেছিল ভীম। সাপ-নালা আর রাজপাটেও পাণ্ডবদের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। চন্দ্রনাথকে বললাম, —যাব মামা, কিন্তু সে যে শুনেছি বড় অন্ধকার সুড়ঙ্গ-পথ।

চন্দ্রনাথ হেসে হেসে উত্তর দেন,—ভয় কি বাবা ? আমি সঙ্গে রয়েছি। হাজার হাজার যাত্রী যাবে সে পথে। আর কোনদিন এমন জায়গা দেখতে পাবিনি। পাহাড়ের দেশ যে তোকে ছাড়তে হবে। তোর মা যে আকাশ থেকে চেয়ে রয়েছে। তাঁর মানতও পূর্ণ হবে, আর দেখবি আলোয় আলোময় বাবা ভুবননাথ শিব।

চন্দ্রনাথ বলতে লাগলেন,—"অনেক দূর পাহাড়ের পথে যেতে হবে। সুড়ঙ্গ-পথে আলো নেই ; ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে হাতে মোমবাতি নিয়ে হাতড়ে হাতড়ে যেতে হয় সে পথে। আলো নিভে গেলে রক্ষে থাকে না। তবুও হাজার হাজার যাত্রী চলেছে সেই পথে।" ছোটবেলা থেকেই ভুবননাথকে দেখার লোভ ছিল। শিবচতুর্দশীতে বহু যাত্রীর সেখানে সমাগম হয় ; আজ হঠাৎ সে সুযোগ আমার সামনে উপস্থিত হয়েছে।

তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম,—এখনও শিবরাত্রির অনেক দেরী আছে মামা!

চন্দ্রনাথ উত্তর দেন,—সেখানে পৌঁছুতেই সাতদিন লেগে যাবে বাবা! বুধবার ভোরেই আমরা যাত্রা করব। কাল-পরশুর মধ্যে পাহাড়ী-পালা সাঙ্গ ক'রে ফেল।

চন্দ্রনাথ মুচকি হাসলেন। লজ্জা ও শঙ্কা এল মনে। চন্দ্রনাথ কি অন্তর্যামী? পাহাড়ী-পালা! হ্যাঁ, পাহাড়ী-পালা বৈকি! ভাটির মুখখানি আর তার ছলছল চোখ ভেসে উঠল মানসপটে। নব তারুণ্যের দুর্বলতা সত্যিই আমাকে পেয়ে বসেছিল। সবই চুকিয়ে-বুকিয়ে দিতে হবে। এবার পাহাড়ী-পালা সত্যিই সাঙ্গ করতে হবে। চুপ ক'রে কত কি ভাবতে লাগলাম; আমার দৃষ্টি নত হয়ে এল।

চন্দ্রনাথ বললেন,—ভয় কি বাবা! দেবাংশী সব মেয়ে; মা-কালী খেলা করেন তাদের মাঝে! ভুবননাথকে দর্শন করলেই সব বুঝতে পারবি।

রহস্যপূর্ণ চন্দ্রনাথের কথা! প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাবার জন্য তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম,—আচ্ছা মামা। আপনি তো কতবার ভুবননাথকে দর্শন করেছেন, বারবার একই জায়গায় যেতে কি ভাল লাগে?

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন চন্দ্রনাথ। তারপর বললেন,—নিত্য নতুন রূপে দেখি তাঁকে বাবা! রাত আর দিন তো নিত্যই ঘুরে ঘুরে আসে। তাতে কি বিরক্তি লাগে। সেই একই সূর্য, একই চন্দ্র, একই আকাশ; এ সবে কি বিরক্তি আসে রে। মহামায়ার খেলা! জ্ঞান হ'লে বুঝতে পারবি। জাগ্রত ঠাকুর বাবা ভুবননাথ।

—আচ্ছা মামা! ঐ গহীন জঙ্গলে পাহাড়ের মধ্যে সুড়ঙ্গ কেটেছে কারা?

—স্বয়ং বিশ্বকর্মা। অর্জুনের আদেশে বিশ্বকর্মা এসে সুড়ঙ্গ কেটে গেছেন; ভুবননাথ শিবও তাঁরই হাতে গড়া। একটা সুড়ঙ্গ-পথ চলে গেছে কাশীতে বাবা বিশ্বনাথের কাছে। মা-গঙ্গা আর একটা সুড়ঙ্গ-পথে এসেছেন পাহাড়ের তলায় বাবা ভুবননাথের পা ধুয়ে দিতে। দু'পাতা ইংরেজী পড়ে কি তোরা তা বিশ্বাস করবি?

—হ্যাঁ মামা, আমি বিশ্বাস করি।

—বেশ বাবা, বেশ। তোদের নাকি বাইবেল পড়ায়?

—হ্যাঁ, পড়ায়।

—ভাল, ভাল। বাইবেল ভাল বই রে। তাতেও গীতার মত সব কথা আছে।

—তবে যে আপনারা বাইবেলের নিন্দে করেন?

—যারা করে তারা মূর্খ। বাইবেল বড় ভাল বই রে বাবা। কোন ধর্মের বইতে কি খারাপ কথা থাকতে পারে? যীশুখ্রীষ্টের কথা শুনলে বড় আনন্দ পাই বাবা। নিজের রক্ত দিয়েও পাষণ্ডদের বাঁচালেন। কত বড় মহাপ্রাণ তিনি! তাঁকে পেরেক দিয়ে বিঁধে মারলে; তবুও বলতে বলতে মরলে—ওরা জানে না প্রভু! ওদের ক্ষমা কর!

আবেগে চন্দ্রনাথের স্বর জড়িয়ে গেল। তিনি যেন সম্মুখে ক্রুশ-বিদ্ধ যীশুকে দেখতে পাচ্ছেন! কিছুক্ষণ পরে বলে উঠলেন,—তারা, তারা! আনন্দময়ী মা!

—হ্যাঁ মামা! আপনি কি বাইবেল পড়েছেন?

—হ্যাঁ পড়েছি। পাদ্রীরা নমঃশূদ্রদের পাড়ায় বিলি ক'রে গেছে; তারই একখানা নিয়ে এসেছি। বড় সুন্দর বই। অনেক ভাল ভাল কথা আছে তাতে।

—তা'হলে তো দেখছি সকলে খ্রীষ্টান হয়ে যাবে।

—কেন খ্রীষ্টান হতে যাবে? আমাদের গীতায় কি কোন ভাল কথা নেই? মানুষ যা ধারণ ক'রে তার মনুষ্যত্ব বিকাশ করবে, তা-ই ধর্ম। এদেশে কি ধর্ম কথার অভাব আছে রে বাবা। অভাব থাকলেই তা পূরণ করতে হয়। কোন্ দুঃখে আমরা খ্রীষ্টান হব?

—কি ক'রে বুঝব বলুন? আমাদের গীতা, পুরাণ সবই তো সংস্কৃতে লেখা।

—এই সংস্কৃতই যত গোল বাধিয়েছে রে! জলের তলায় স্ফটিকস্তম্ভের ভেতর সোনার পেটরায় শাস্ত্র বন্ধ থাকলে কার কি উপকার হবে বাবা? তোরা লেখাপড়া শিখে সেই পেটরা ভেঙে সব বের ক'রে দে; ছড়িয়ে দে সবার মাঝে।

—আমরা কি তা পারব মামা? আমাদের শাস্ত্রে কি আছে? শুধু ঠাকুর-দেবতার কথা আর পূজো-আর্চার ব্যাপার।

—না বাবা। বেদ, উপনিষদ, গীতায় মানুষকে সত্যের সন্ধান দিয়েছে। পূজো-আর্চা আর ঠাকুর-দেবতার কথা তো ধর্ম নয়।

—তা'হলে এসব পূজো-আর্চা কেন?

—শুধু মনকে ভুলিয়ে রাখা। ঠাকুর-দেবতাদের সামনে রেখে মানুষ সংসারের মোহ থেকে মুক্তি চায়; এখন তা বুঝবি নে।

—বেদ, উপনিষদে তত্ত্ব-কথা আছে ; তাতে মানুষের কি উপকার হবে ?

—উপকার ? তা হলে শোন্—ধর্মের সার কথা হ'ল মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়া যে জগৎ-জোড়া মহামায়ারই সন্তান সে। তাঁরই কোলে সে রয়েছে। তার কোন ভয় নেই।

—ভয় নেই ? তা'হলে মানুষ পুণ্য করে কেন ?

—মনকে তৈরী করে বাবা ! শুধু মুখে বললে হবে না, সেটা মনে-প্রাণে বুঝতে হবে। তখনই মুক্তি, তখনই মোক্ষ। বলছি,—তোরা লেখাপড়া শিখেছিস, তোরাই পারবি এসব কাজ।

—কি করব আমরা ?

—শাস্ত্রের কথা বুঝে ঠিক ঐ বাইবেলের মত ঘরে ঘরে বিলিয়ে দে ; মানুষকে বল, তাদের জানিয়ে দে—তারা সকলেই মহামায়ার সন্তান ; তা'হলেই হবে।

—কি বলছেন মামা ? তর্করত্ন মশাই যে বলেন,—গীতা, চণ্ডী ব্রাহ্মণ ছাড়া কাউকে পড়তে নেই ; অব্রাহ্মণে পড়লে তার মাহাত্ম্য থাকে না। ছাপার অক্ষরে বের করলেও পাপ হয়।

হোঃ হোঃ ক'রে হেসে ওঠেন চন্দ্রনাথ।—বুঝিস নে ? এঁরা সোনার পেটরায় সব বন্ধ ক'রে রাখতে চান। তোরা তা মানবি কেন ? ছড়িয়ে দে, ছড়িয়ে দে,—মাকে তোরা বন্ধন-মুক্ত ক'রে দে ! মাটির মূর্তি হেসে উঠুক বাবা !

তান্ত্রিক চন্দ্রনাথ চিরকালই বেপরোয়া। তাঁর কথা শুনে উৎসাহ পাই। এখন বুঝি—আমাদের উপনিষদ, গীতা ও ভাগবতে কত সুন্দর সুন্দর কথা রয়েছে ; তা কেউ আমরা জানিনে। অথচ খ্রীষ্টান পাদ্রীরা সাত-সমুদ্র পার হয়ে এসে তাঁদের বাইবেলের কথা ছড়িয়ে দিচ্ছে ; পৃথিবীর সকল লোক খ্রীষ্টান হয়ে যাচ্ছে। আর আমাদের গীতা, চণ্ডী, ভগবতকে আমরা আষ্টে-পিষ্টে বেঁধে রেখেছি। আমাদের পাদ্রী নয়ানচাঁদেরা সমাজে পতিত ; তাঁরা একঘরে।

চন্দ্রনাথ বললেন,—যা বাবা ! তোর পিসীমা কত ভাবছে। সারাদিন পাহাড়ীদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াস ; এদিকে একটু নজর রাখতে হয়।

আমি বললাম,—রাখি বৈকি মামা ! আমি আর কি করতে পারি ? দু'দিন পরে তো চলেই যাব।

চন্দ্রনাথ বললেন,—তবুও বাবা! যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। মানুষের আশা মেটে না। যমে-মানুষে টানাটানি করছে, হাত-পা অসাড় হয়ে গেছে, চোখ খুলতে পারছে না, তবুও মানুষ আমার আমার ক'রে বুক ফেটে মরে।

তারপর তিনি বললেন,—যা বাবা! ভেতরে যা।

চন্দ্রনাথের কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ির ভেতরে গেলাম। পিসীমা আমাকে দেখতে পেয়ে বললেন,—হ্যাঁরে, তোর আক্কেলটা কি? এখন থেকেই আমাদের মায়া কাটিয়ে দিচ্ছিস বুঝি? তা বাবা! পাহাড়ের মায়া কি কাটাতে পারবি?

পিসীমার কথায় হাসি পায়; আমি মায়া কাটাচ্ছি! সত্যিই তো। তাঁকে বললাম,—না পিসীমা! মায়া কি কাটানো যায়? বড্ড খিদে পেয়েছে।

পিসীমা একটা বাটি ক'রে গুড় আর মুড়ি খেতে দিয়ে বললেন,—কোন্ দুপুরে বেরিয়েছিস; খিদে পাবেই তো। নে, এগুলো খেয়ে নে। রান্না হয়ে গেলে তোর চন্দ্রমামার সঙ্গে খেতে বসবি।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে আকাশ-পাতাল কত কি ভাবছি; সময় যে ঘনিয়ে এল। এখনও টাকা-পয়সার যোগাড় নেই। এত টাকা কোথায় পাই? দাদাও দিতে পারবেন না। পিসীমার কথা যেন কানে ঝঙ্কার দিচ্ছিল—পাহাড়ের মায়া কি কাটাতে পারবি! তন্ময় হয়ে ভাবছি। না, না, না—ভাটি আর চম্পা, মোহন আর রতন যেন আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বাঁশী শুনছি মদনকুমারের। ঐ যে ভাটি গুহা-গহ্বরে ঝাঁপ দিল! রক্ত—রক্ত—রক্ত! এত রক্ত কোথা থেকে এল। ঐ যে ক্ষেত্রদিদি! সেই বড় শহরটাতে এসে পড়েছি; আলোয় আলোময়—কত বড় বাড়ি। এ কি, সভা হচ্ছে! বাঁশীর মত কার গলার মধুর স্বর? ইনি কে? চিনেছি, চিনেছি,—ছবিতে দেখা রবীন্দ্রনাথ।—না যীশুখ্রীষ্ট! আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

পরের দিন একটু বেলা ক'রে ঘুম থেকে উঠেছি! ইতিমধ্যে পাড়ায় রাষ্ট্র হয়ে গেছে—নিদারুণ সে খবর! খুন হয়েছে! খুন! পাহাড়ীপুঞ্জী পুলিসে লাল হয়ে গেছে। একটা নয়, একসঙ্গে জোড়া খুন।

ভাটিকে মোহন খুন করেছে। আর মোহনকে খুন করেছে বুড়ো সবাই সর্দার। এ যে অবিশ্বাস্য কথা।

থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলাম। বুকের ভেতরটা যেন হিম হয়ে গেল। কাল সন্ধ্যে পর্যন্ত ভাটি আমার সঙ্গেই ছিল। ভাটির করুণ চোখ দুটি আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। ভাটির স্পর্শ এখনও আমি অনুভব করছি। গাঙের ঘাটে এগিয়ে দিতে এসে নিতান্ত আকস্মিক ভাবে ভাটি আমাকে প্রথম ও শেষ প্রণাম করেছে। কেন? কেন সে হঠাৎ এরকম করলে? তা'হলে কি ভাটি জানত যে তাকে মরতে হবে?—মাথাটা ঝিমঝিম করে। কানে যেন তীরের মত বিঁধছে,—ভাটিকে মোহন খুন করেছে।

খবরটা দিয়ে গেল জগাই। আগে-ভাগে জানতে পেরে আমাকে সাবধান ক'রে দিয়ে গেল।

সকাল বেলা। সূর্য তখন অনেকখানি ওপরে উঠে গেছে। বাগানে দাঁড়িয়ে অতসীলতাকে একটা করবী গাছের ডালের সঙ্গে জড়িয়ে দিচ্ছি। কিছুতেই লতাটা থাকবে না। বারবার মাটিতে পড়ে যাচ্ছে; এমন সময় জগাই প্রায় ছুটতে ছুটতে এল।

জগাই বললে,—এখনও তুই কিছু শুনিস নি ভৃগু? ভাটি খুন হয়েছে।

বিস্মিত ও ভয়ার্ত কণ্ঠে বললাম,—সে কি? ভাটি খুন হয়েছে! কে বললে? কোথায় শুনলি?

জগাই বললে,—গাঙের এপারে-ওপারে সব জায়গাতেই একথা রটে গেছে, আর তুই জানিস নে?

—না ভাই! কিছুই জানিনে। তুই কোথায় শুন্'লি?

—এসব কথা বাতাসে ওড়েরে; বাতাসে ওড়ে! পাহাড়ী-পুঞ্জী লালে লাল হযে উঠেছে। গাঙের পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখে এলাম—পাহাড় যেন শিমুল ফুলে ছেয়ে গেছে।

—ভাটিকে কে খুন করেছে?

—ভাটিকে খুন করেছে মোহন; আর মোহনকে খুন করেছে বুড়ো লবাই সর্দার।

—সত্যি বলছিস?

—হ্যাঁ রে। তোকে সাবধান করতে এলাম। তুই নাকি কাল সন্ধ্যে অবধি পাহাড়ী-পাড়ায় ছিলি?

—হ্যাঁ। আমি তো ভাটিকে সন্ধ্যের সময়ও দেখেছি; আমাকে এগিয়ে দিতে খেয়া-ঘাট পর্যন্ত এসেছিল।

—তারপরই খুন হয়েছে রে। তারপরই মোহন তাকে খুন করেছে।

বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে এল। জগাইয়ের কথা শুনে চঞ্চল হয়ে উঠলাম। মোহনের সেই তীর ছুঁড়ে সাবধান করার দৃশ্যটিও মনে পড়ল। ভাটির সেই মুখ আমার চোখে ভাসতে লাগল। কথা বলবার শক্তি যেন হারিয়ে ফেললাম।

আমায় চুপ ক'রে থাকতে দেখে জগাই বললে,—দেখ ভৃগু! বারবার তোকে ওদের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করতে বারণ ক'রে দিয়েছিলাম। তা তুই শুনলি না। এখন নিজেকে সামলাবি কি ক'রে?

—কেন? কি হয়েছে?

—বড় দারোগা তদন্তে এসেছে। তোরই কথা বলাবলি করছিল ছোটবাবুর সঙ্গে। এক্ষুনি জমিদার বাড়িতে তোর ডাক পড়বে; যা বলবার গুছিয়ে বলবি।

—আমার ডাক পড়বে? এ খুনের ব্যাপারে আমি তো কিছুই জানিনে।

—তুই বললে তো চলবে না। পুলিসের কাণ্ড তো জানিস। কত রকম জেরা করবে তোকে।

—করুক্ গে। আমি ভয় করি নে কিন্তু ভাটিকে মোহন খুন করলে; তারপর সবাই বুড়ো নিশ্চয়ই ভাটির শোকে মোহনকে খুন করেছে।

—তা হবে। কিন্তু পুলিসের কাছে নিজেকে বাঁচিয়ে সব বলবি। বাব্বা! কথায় বলে 'চাচা আপন বাঁচা'।

হিঃ হিঃ ক'রে ওঠে জগাই। তার হাসি আমার ভাল লাগে না। তাকে বললাম,—তুই হাসছিস জগাই! তোর কষ্ট হয় না? দু'দুটো খুন হয়ে গেল! সবাই বুড়ো নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছে।

জগাই অবজ্ঞার সুরে বললে,—খুন-খারাপী তো ওদের লেগেই আছে। কুকুর-বেড়ালের মত জীবন। ওরা মরলেই বা কি আর বাঁচলেই বা কি?

—ছিঃ জগাই! ওরাও মানুষ!

—তা দেখতেই পাচ্ছি। নচ্ছার মেয়ে ভাটি। ঢলাঢলি ক'রে ঘুরে বেড়াত। বেশ করেছে মোহন তাকে খুন করেছে।

—কি বলছিস জগাই? তুই যা, এখান থেকে চলে যা বলছি।

আমার কথায় রীতিমত উষ্মা প্রকাশ পেল। জগাই বিদ্রূপ ক'রে উত্তর দিলে,—বড় যে দরদ দেখছি! বুঝবে মজা!

জগাই চলে গেল। অতসী লতা মাটিতে পড়ে রইল; তার দিকে আর নজর দিতে পারলাম না। বাগান থেকে বের হয়ে বাড়ির ভেতর গেলাম। পিসীমা বলে উঠলেন,—হ্যাঁরে শুনেছিস, পাহাড়ী-পুঞ্জীতে নাকি খুন হয়েছে? একি! তোর আবার কি হ'ল? রাত্রে ঘুমোস নি?

পিসীমাকে বললাম—কিছুই হয় নি পিসীমা! বল দেখি.—চন্দ্রমামা কোথা?

পিসীমা বললেন,—সে তো ঠাকুরঘরে আহ্নিকে বসেছে; কখন বের হয় তার ঠিক নেই।

—পিসীমা, আমি একটু বেরিয়ে যাচ্ছি; ফিরতে দেরী হতে পারে।

—বেশী দেরী করিস নে। ঐসব খুন-খারাপী দেখতে বুঝি পাহাড়ী-পুঞ্জীতে যাচ্ছিস?

—না পিসীমা! একটু ঘুরে আসি, পাড়াতেই থাকব।

—যা বাপু, তোর যেখানে খুশী।

পিসীমা নিজের কাজে চলে গেলেন। আমি জামা গায়ে দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। ভাবলাম,—পাহাড়ী-পুঞ্জীতে গিয়ে ভাটির লাসটা দেখলে হয় না? তার জন্যে মনটা কেমন করতে লাগল। এ কয়েকদিন ভাটি আমার নিত্য সঙ্গী ছিল। লবাই সর্দার যখন রাজার পাটের গল্প বলছিল, তখন ভাটির উন্মনা ভাব ও ভীতির অবস্থা নিজেই দেখেছি। গত কাল ভাটির সাহচর্য এত ঘনিষ্ঠ হয়েছিল যে, আমার কাছে তা বিস্ময়কর লেগেছিল। ভাটি কি তবে আমাকে ভালবাসত? মোহনকে বিয়ে করার পথে কি বাধা ছিল তার? সে বাধার সূত্রও আজ যেন আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল।...সামনের রাস্তা ধরে জমিদার বাড়ির দিকে চললাম। খানিকটা এগিয়েছি, এমন সময় দেখি, আমাদের ছোটবাবু এদিকে আসছেন। আমায় দেখতে পেয়ে ছোটবাবু বললেন,—এই যে বাবাজী, তোমার খোঁজেই যাচ্ছি। কি সব হাঙ্গাম বাধিয়েছ! আমাদের কথা তো শুনবে না। পাহাড়ীদের সঙ্গে মেলামেশা করতে আমি কতবার বারণ ক'রে দিয়েছি; এখন ঠেলা সামলাও।

ছোটবাবুর কথার সুরে আশ্চর্য হলাম তিনি কোনদিনই আমায় বারণ করেন নি। বরং আমায় ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও রসিকতাই করতেন। আর তাঁকে তো মদ খেয়ে মাতাল হ'য়ে পাহাড়ী পাড়ায় গড়াগড়ি দিতেও দেখেছি। তাঁর কথা শুনে বিরক্তই হলাম।

ছোটবাবুকে বললাম,—কেন কি হয়েছে ?

তিনি বললেন,—হবে আর কি ? যতসব বদমাস ছোঁড়া আর ছুঁড়িতে মারামারি কাটাকাটি ! মাঝখান থেকে ভদ্রলোকের ছেলেকে নিয়ে টানাটানি। বড় দারোগা তদন্তে এসেছে, তুমি নাকি কাল পাহাড়ী-পুঞ্জীতে ছিলে ?

—হ্যাঁ ছিলাম। সন্ধ্যার পর আমি চলে আসি।

—বাবাজী ! ঘটে মোটেই বুদ্ধি নেই তোমার ! তুমি বলবে কাল পাহাড়ী-পুঞ্জীতে আমি যাই নি,—ছোটবাবুর সঙ্গে—এই আমার সঙ্গে আমাদের বাড়িই ছিলে।

—কেন, মিথ্যে কথা বলব কেন ?

—বলতে হবে বাবাজী। তুমি আমাদের কবরেজ মশাইয়ের ছেলে। তোমাকে বাঁচাবার জন্যে আমাদের চেষ্টা করতে হবে বৈকি ?

—আমাকে বাঁচাতে ? কেন ? আমি কি খুন করেছি, না আমার কথায় কেউ খুন করেছে ?

—হেঃ ! হেঃ ! বাবাজী ওসব বুঝবে না। এসব ব্যাপারেব ত্রিসীমানায় থাকাই ভাল নয়। পুলিস ধরে নিয়ে যাবে, থানা আদালত হবে। কত হাঙ্গাম ! বরং সোজা বলে দাও, তুমি কাল পাহাড়ী-পুঞ্জীতে যাও নি।

—একথা বললে কোন দোষ হবে না ছোটবাবু। সত্যি আমি গেছলাম। সন্ধ্যার পরই আমি চলে এসেছি ! কিন্তু খুন-খারাপী তো তখন হয় নি।

—সে কথা সত্যি। তবু ঐ বদমাস মেয়েটা তোমায় এগিয়ে দিতে এসেছে। পথে মোহনটা লুকিয়ে ছিল ; ফেরবার সময়ই ছুঁড়ীটাকে খতম করেছে। শুধু খতম নয় বাবাজী ! এরা পশু, পশুরও অধম। বুকে বিষ মাখা তীর মেরেছে। মেয়েটা পড়ে গেল তার ওপরও আবার বর্বরতা চালিয়েছে। ছিঃ ছিঃ, মুখের ঠোঁটের মাংস ছিঁড়ে নিয়েছে কামড়ে। পশু, পশুর অধম ওই মোহন ছোঁড়া !

—মোহনকে খুন করলে কে ?

—নাতনি ছুঁড়ীর খোঁজে বুড়ো লবাই এসে দেখে এই কাণ্ড ! তারপর টাঙ্গি মেরেছে মোহনের গলায়। জড়াজড়ি ক'রে ছোঁড়া আর ছুঁড়ীতে এখন পড়ে রয়েছে।

ছোটবাবুর বর্ণনা শুনে গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। দু'জনে একসঙ্গে মরেছে ! কি হিংস্র ঐ মোহনটা ! কি ভীষণ তার প্রতিহিংসা ! ভাটি

এমন কি অপরাধ করেছে? আমি জানি, ভাটি নির্মল, নিষ্কলঙ্ক। শুধু খেয়ালের বশে উন্মনা হয়েছিল সে। বঙ্কিমবাবুর চন্দ্রশেখরের শৈবলিনীর কথা মনে পড়ে গেল। কিন্তু ভাটি তার চেয়ে অনেক উর্ধ্বে।

ছোটবাবু বললেন,—তারপর লবাই সর্দার চীৎকার ক'রে উঠল। চার দিক থেকে লোকজন ছুটে গিয়ে দেখে এই ভয়ানক কাণ্ড! রাতারাতি পুলিস এল; তদন্ত করল। লবাই সর্দার তোমার কথা কি বলেছে বাবাজী! দারোগাবাবু বললেন, তোমার খোঁজে এখানে এসেছেন। হয় তো পুলিসই পাঠাতেন। ব্যাপারটা সামলে নেবার জন্যে আমি নিজেই এসেছি। এখন আমি যা বলি শোন।

বিরক্তি ও উত্তেজনা আমাকে বিচলিত করে তুলল! কেন? আমি কি করেছি? লবাই হয় তো কালকে যে সব ঘটনা ঘটেছে, তাই বলেছে। আমাকে সে জড়াতে যাবে কেন? আর সত্যি কথা বললে ক্ষতিই বা কি? ছোটবাবুকে বললাম,—দেখুন আমি মিথ্যে কথা বলতে পারব না।

ছোটবাবু গম্ভীর মুখে বললেন,—এ কি বলছ বাবাজী! মিথ্যে কথা আবার কি? তুমি তো খুন করনি! আর এসব ঘটবে বলেও জানতে না। তোমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রেও তারা এসব করে নি। তুমি শুধু বলবে, তুমি ওদের সঙ্গে কাল ছিলেই না।

—আমি ছিলাম ছোটবাবু! আমার মনে হয়, ভাটি আগে তা বুঝতে পেরেছিল।

—কি বুঝতে পেরেছিল?

—তার দিন ঘনিয়ে এসেছে। মোহন তাকে মেরে ফেলতে পারে।

—কি আহাম্মক তুমি! খবরদার বলছি,—দারোগার কাছে এসব কথা ঘুণাক্ষরেও বলবে না।

—সত্যি কথা বলা তো ভাল; সব সন্দেহ মিটে যাবে।

—কিসের সন্দেহ বাবাজী? ভাটিকে যে মেরেছে, সে তো মরেই গেছে। সুতরাং তোমার সত্যি কথা বলার কোন মানেই হয় না। বুঝতাম যদি মোহন বেঁচে থাকত, তা'হলে তোমার কথায় কাজ হ'ত। এখন সব কাজই ফতে হয়ে গেছে। এখন তোমায় নিয়ে না টানাটানি করে।

—কিন্তু লবাই বুড়োকে তো বাঁচাতে হবে।

—কেন বাবাজী? তোমার এত দরদ কেন?

—বুড়ো মানুষ। বড় কষ্ট পেয়েছে।

—ওদের আবার কষ্ট! হাসালে তুমি! ঝোঁকের মাথায় মোহনকে টাঙ্গি মেরেছে। ওরা নিজের ছেলেকেও খুন করতে পারে বাবাজী!

হোঃ হোঃ ক'রে ছোটবাবু হেসে উঠলেন। তিনি বললেন,—সবাই বুড়ো পাগল হয়ে গেছে। ওর জ্ঞান-গম্যি নেই। পাগলের আবার শোকদুঃখ কি? পাগলা-গারদে পাঠিয়ে দেবে।

—নিশ্চয়ই শোকে পাগল হয়ে গেছে ছোটবাবু! ভাটিকে সবাই বড় ভালবাসত। ভাটির মা-বাপ ছোটবেলায় মরে গেছে। এই বুড়োই তাকে মা-বাপের মত মানুষ করেছে। বুড়ো বড় দুঃখী! ছেলে-বৌ মরেছে। ছেলের মেয়ের মুখ চেয়ে বেঁচে ছিল। সেই আদরের নাতনিকেই মোহন খুন করেছে! মাথা কি আর ঠিক থাকে? মোহনকেও ভালবাসত সবাই সর্দার।

—ওদের আবার ভালবাসা! যাক্ যাক্ বাবাজী, এরকম খুন-জখম কত হয়, তোমার আমার তাতে কি? তুমি এখন কি করবে বলো!

—আমি যা জানি তা-ই বলব ছোটবাবু!

—দেখো বাবাজী, সত্যি কথা বলতে কি ছুঁড়ীটা তোমার মাথা খেয়েছে। যদি বেঁচে থাকত, তা'হলে না হয় অন্য কথা। যখন বেঁচেই নেই, তখন মিছামিছি ফ্যাসাদে পড়ছ কেন?

—ভয় নেই ছোটবাবু! ওতে কোন ফ্যাসাদ হবে না।

—ওঃ, ভুলেই গেছি তুমি এবার গ্র্যাজুয়েট হতে যাচ্ছ! আমাদের চেয়ে বেশী বোঝ তুমি! ভুল করলে বাবাজী! কলেজী বিদ্যায় এর পার পাবে না। খুন-জখমের কত মামলা আমরা চালিয়েছি। বেকসুর খালাস পেয়েছে আসামী। এ না হলে এত বড় জমিদারী চালাতে পারতাম না। দারোগার সঙ্গে সব ঠিকঠাক ক'রে এসেছি আমি। তুমি বলবে, তুমি কাল পাহাড়ীপুঞ্জীতে যাওনি।

ছোটবাবুর কথায় উত্যক্ত বোধ করলাম। তাঁকে বললাম,—বেশ, আমি না হয় তাই বললাম। কিন্তু অন্য কেউ যদি বলে আমাকে সেখানে দেখেছে?

উত্তেজিত ছোটবাবু হুঙ্কার দিয়ে বললেন,—কোন্ শালা সে কথা বলবে? কার ঘাড়ে দশটা মাথা আছে? দেখে নেবো না?

হাসি মুখেই উত্তর দিই,—কেন? ওই খেয়া নৌকোর মাঝি আর তখন যারা নৌকোয় ছিল।

উৎকণ্ঠার সুরে ছোটবাবু বললেন,—বলো কারা ছিল? এখনই লোক পাঠাচ্ছি।

—কি হবে লোক পাঠিয়ে? তাদের সকলের নাম তো আমি জানিনে। দু'একজনকে চিনি।

—সে দু'একজনের নামই বল না?

—হাতিম মিয়া, নবীন মাঝি, রতন পাটনি।

—বেশ! এতেই হবে। চল তুমি আমার সঙ্গে দারোগার কাছে। না,—থাক্, আমি আগে যাই। সব ঠিক করিগে। তুমি আধঘণ্টাটাক পরে এসো।

ছোটবাবুর ব্যগ্রতা দেখে কৌতুক জাগে। আমার জন্যে আমি ভয় করিনে। তবুও জানি পুলিসের দারোগারা অনেক সময় অযথা হয়রানি করেন। ছোটবাবুরা যে খুন-জখমের ব্যাপারেও আইনের চোখে ধুলো দিতে পারেন তা জানি। জমিদারী যে লাঠির জোরে চলে, তা-ও ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি। ইংরেজ আমলের এই খুদে রাজাদের দোর্দণ্ড প্রতাপে প্রজারা থরহরি কম্পমান!—ছোটবাবু আমাকে সাবধান ক'রে দিয়ে হন হন ক'রে চলে গেলেন। আমি বাড়ি ফিরে এলাম। তান্ত্রিক চন্দ্রনাথের তখন আহ্নিক শেষ হয়েছে; ঠাকুরঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি। আমাকে দেখতে পেয়ে ডাকলেন,—বাবা! কি হয়েছে শুনলাম!

—পাহাড়ীদের পাড়ায় দু'জন খুন হয়েছে।

—তারা! তারা!—কি বললে খুন হয়েছে?

—হ্যাঁ! দু'জন খুন হয়েছে।

—অসুরের বংশ এরা! নিশ্চয়ই নিজেদের মধ্যে মারামারি করেছে!

—হ্যাঁ। একটি মেয়েকে একজন খুন করে। তারপর সেই মেয়ের দাদু শোকে উন্মত্ত হয়ে সেই লোকটাকে খুন করেছে।

হঠাৎ পিসীমা ছুটে এসে বললেন,—চুপ কর ভৃগু! চুপ কর! তুই কি ক'রে জানলি? শেষে ফ্যাসাদে পড়বি। পুলিসের কানে কথাটা গেলে সাক্ষী হতে হবে। পুলিস বলবে—তুমি যে বলছ, তুমি জানলে কি ক'রে?

আশ্চর্য হই পিসীমার কথায়। তাঁকে বললাম,—একথা সবাই শুনেছে পিসীমা। সবাই বলেছে একথা। তোমার কোন ভয় নেই।

পিসীমা উত্তেজিত হয়ে বললেন,—যার ইচ্ছে বলুক গে। তোর আর বাহাদুরী করবার দরকার নেই। পুলিসের গোয়েন্দা চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কথাটা শুনতে পেলে তোকেই ধরবে।

পুলিসের গুপ্তচরের ভয় এখানেও! জানি কোন খুন-খারাপীর পলাতক আসামীকে ধরবার জন্যে কিংবা সন্দেহভাজন কাউকে খুঁজে বের করবার জন্যে গুপ্তচরেরা নানা বেশে ঘুরে বেড়ায়। স্বদেশী আন্দোলনে যাঁরা যোগ দিয়েছে, তাঁদেরই কার্যকলাপ গোপনে গুপ্তচরেরা লক্ষ্য ক'রে তাও জানি। সেই গুপ্তচরের ভয়ে আমার পিসীমা এই অজ পাড়াগাঁয়েও ভয়ে বিহ্বল।

চন্দ্রনাথ বললেন,—ভয় কি দিদি! খোকার জন্যে ভয় নেই। লেখাপড়া শিখে বিদ্বান হয়েছে। ওকে সবাই সম্মান করবে।

পিসীমা বললেন,—বিদ্বান হয়েছে কিন্তু এখনও ছেলেমানুষ রয়ে গেছে ভাই! সারাদিন ওই পাহাড়ে পাহাড়েই ঘুরে বেড়ায়। কি জানি, আমার বড় ভয় হয়!

পিসীমাকে আশ্বস্ত করবার জন্যে বললাম,—শোন পিসীমা! তোমার কোন ভয় নেই। যে প্রথম খুন করেছে, তাকে আর একজন খুন করেছে। আর সে নিজেই ধরা দিয়েছে। তোমার আমার তাতে ভয় নেই।

পিসীমা বললেন,—তাই হোক্ বাছা! তবু ওসব ষড়যন্ত্রের ব্যাপার! কাকে নিয়ে টানাটানি করবে কে জানে? বাড়ি থেকে তোকে আজ বের হ'তে দেবো না।

আমি বললাম,—তাই হবে। আমায় কিন্তু ছোটবাবু ডাকতে এসেছিলেন, একবার ঘুরে আসি।

"শীগগির আসবি"—বলেই পিসীমা ভেতরে চলে গেলেন। চন্দ্রনাথ বললেন,—কি হয়েছিল বাবা?

আমি উত্তর দিই,—ঠিক জানি নে। তবে যারা খুন হয়েছে তাদের সকলকেই আমি ভালরকম জানি।

চন্দ্রনাথ হেসে ফেলে বললেন,—কতটুকু জানো বাবা! মানুষের ভেতরে কি আছে, মানুষ নিজেই জানে না। যাক্ সবই মা তারার ইচ্ছা!

আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম,—কি হবে মামা? যে ধরা পড়েছে, সে যে নির্দোষ! তার নাতনিকে একজন খুন করেছে, তার শোকেই সে সেই খুনীকে খুন করেছে।

চন্দ্রনাথ বললেন,—মানুষের আইন বাবা! কিছুই ঠিক নেই; নির্দোষও শাস্তি পায়। খুনীও হাসিমুখে ঘুরে বেড়ায়। মানুষের আইনে আমার বিশ্বাস নেই।

আমি বললাম,—পুলিসের লোকেরা বড় জুলুম করে। আহা! বেচারী বুড়ো মানুষ!

চন্দ্রনাথ বললেন,—ওদের হয়ে বলবার কেউ নেই বাবা! তুমি কি করবে?

আমি বললাম,—সত্যি ওরা বড় নিরুপায়! আমি একবার দেখে আসি মামা!

—'যাও, কি করতে পার দেখো।' কিছুক্ষণ চুপ করে আবার হেসে জবাব দিলেন,—যাও বাবা! ওদের উপকার হবে।

তাঁর কথায় উৎসাহিত হয়ে জমিদার-বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম। বাড়ির বাইরে গিয়ে শম্ভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। ছোটবাবু শম্ভুকে পাঠিয়েছেন।

শম্ভু বললে,—অবনী দারোগা এসেছে, তোকে ডাকলে।

শম্ভুর কথায় সাহস পেলাম। অবনী দারোগা? তাঁকে তো আমি চিনি! সুবীরের মাসতুতো দাদা! তিনি আমায় খুব ভালবাসেন।

শম্ভুকে বললাম—অবনী দারোগা বুঝি এখন কাঞ্চনগড়ে এসেছে?

শম্ভু বললে—হ্যাঁ, তোর সেই সুবীরের দাদা। বেঁচে গেছিস। তোর নাম শুনেই তিনি এখানে এসেছেন নিজে। তা না হলে পুলিস পাঠিয়ে ধরে নিতেন।

আমি বললাম—কেন ধরে নেবে?

শম্ভু বললে—বাবা! এসব খুন-জখমের ব্যাপার! সহজে কি ছাড়ে?

আমি বললাম—না ছাড়ে দেখা যাবে। চল্ দেখি, কি বলেন অবনী দারোগা?

অবনীদার নাম শুনে উৎসাহিত হলাম। বড় আমুদে লোক তিনি। অনেকদিন পর তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।

ছোটবাবুদের বৈঠকখানায় শম্ভুর সঙ্গে এসে উপস্থিত হলাম। অনেক লোক জড়ো হয়েছে। পাড়ার মাতব্বরেরা প্রায় সকলেই রয়েছেন। হাতিম মিয়া, নবীন মাঝি ও রতন পাটনিকেও দেখলাম। পাশের বাড়ির কৈলাসবাবু আমায় কানে-কানে বললেন,—দেখ বাপু, তোমায় জিজ্ঞেস করলে স্রেফ্ বলে দেবে তুমি কোন কিছু জান না। হাতিম মিয়া এগিয়ে এসে বললেন,—ঠিক ঐ কথাই বলবে।

আমি বললাম,—দারোগাবাবু যে আমার চেনা লোক।

মৃদু হেসে কৈলাসবাবু বললেন,—বাবা! প্যাঁচ কষে মারবে। পুলিসের লোক, কেউটে সাপ! নিজের বাবাকেও খাতির করে না।

হাতিম মিয়া বললেন,—চেনা লোক বলে বিশ্বাস ক'রে কিন্তু মনের কথা খুলে বলে দিও না বাবা! ওরা সাংঘাতিক লোক।

নবীন মাঝি বললে,—বেশ মিষ্টি কথায় ওরা পেটের কথা বের ক'রে নিয়ে বিপদে ফেলে দাদাঠাকুর! পুলিসকে কখনো সত্যি কথা বলতে নেই।

ওদের কথায় বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করি,—কেন? তা'হলে ওরা সত্যি-কারের দোষীকে বের করবে কি ক'রে?

কৈলাসবাবু বললেন—ধর্মের কল বাতাসে নড়ে বাবাজী। সত্যি কি আর চাপা থাকতে পারে? তুমি আমি নিমিত্তের ভাগী হই কেন?

সকলের সহানুভূতি আমার ওপর। আমিই যেন খুনের আসামী। ব্যাপার দেখে মনে হ'ল, ওঁরা সবাই আমার হয়ে ওকালতী করবার জন্যেই এখানে জড়ো হয়েছেন। উদ্বেলিত মনে বৈঠকখানায় প্রবেশ করলাম। অবনীবাবু আমায় চিনতে পারলেন,—এসো, এসো অম্বুজ! কেমন আছো? অনেকদিন দেখিনি।

অবনীবাবুকে নমস্কার ক'রে এগিয়ে গেলাম। অবনীবাবু হাসি মুখে আমায় বললেন,—আগে বল, কেমন আছ? সুবীরের চিঠি-পত্র পাও তো?

উত্তর দিই—পাই অবনীদা। অনেকদিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা হ'ল। সুবীরও ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টে চাকরী করছে।

অবনীবাবু বললেন,—হ্যাঁ, মেসোমশাই আর পড়াতে চাইলেন না। তুমি তো এবার বি-এ দিয়েছ?

—হ্যাঁ অবনীদা।

—তোমাদের রেজাল্ট বোধ হয় শীগগির বের হবে। তুমি এখন কি করবে?

—আরো পড়াশুনোর ইচ্ছে আছে। দেখি কি হয়!

—বেশ, তাইতো চাই!

হঠাৎ অবনীবাবু সে-ঘরের সকলকে বেরিয়ে যেতে বললেন,—আপনারা সবাই একটু বেরিয়ে যান। অম্বুজের সঙ্গে আমার একটা কথা আছে, যান।

তারপর হাঁক দিলেন অবনীবাবু,—শরণ সিং, সুলেমান খাঁ!

দু'জন লাল পাগড়ী পুলিস এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল—হুজুর!

অবনীবাবু হুকুম দিলেন—দরজায় দাঁড়াও; কেউ যেন উঁকি-ঝুঁকি না মারে।

পুলিস দু'জনে দরজা আগলে দাঁড়াল। অবনীবাবু বললেন,—তোমরাও বাইরে যাও; দরজা বন্ধ ক'রে দাও।

দরজা বন্ধ ক'রে তারা বাইরে চলে গেল। অবনীবাবু বললেন,—আয় অম্বুজ! ভয় পাসনে। ব্যাপার কি আমায় খুলে বলত?

—কি বলব অবনীদা? আমি সকালেই সব শুনলাম।

—তুই জানবি কি ক'রে? বুড়োটাই বলেছে, তোকে এগিয়ে দিতে এসেছিল তার নাতনি। তার ফিরে যেতে দেরী হচ্ছে দেখে টাঙ্গি হাতে তার খোঁজে বেরিয়েছিল।

—তা হবে। মেয়েটা সত্যি খুব ভাল ছিল অবনীদা।

—বুড়োর কথা-বার্তায় তা-ই বুঝতে পারছি। আহা! কষ্টও লাগে। ছোঁড়াটা পাগল হয়ে গেছল হতাশ হয়ে। তাই এ কাজ করেছে।

—মোহনকে ছোটবেলা থেকে জানি অবনীদা! মোহন এ কাজ করলে?

বুঝিস না অম্বুজ! ভালবাসা মানুষকে উন্মাদ করে। যখনি বুঝেছে ভাটি তাকে চায় না, আর একজন তার পথে বাধা আনছে, তখনি মাথা ঠিক রাখতে পারে নি।

—আমিও তা বুঝতে পেরেছি অবনীদা!

—অথচ ভাটি জানত বামন হয়ে সে চাঁদ ধরতে যাচ্ছে। ইচ্ছে করলেই সে তার ভালবাসার জনকে বিপথে টেনে নিয়ে যেতে পারত, কিন্তু মেয়েটা ভাল রে। তা সে করে নি। সেই জন্যই দুঃখ হয়!

—তুমি এত সব এই অল্প সময়ের মধ্যে জানলে কি ক'রে অবনীদা? আমি এত বছরেও তা বুঝতে পারি নি।

—জানিস অম্বুজ! মেয়েটার হৃদয় আছে।

—হ্যাঁ।

—জানিস মেয়েটা কার জন্যে প্রাণ দিলে?

অবনীদার কথা শুনে আমার দৃষ্টি নত হয়ে গেল। দু'ফোঁটা জলও পড়ল গড়িয়ে। অবনীদা তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন—ছিঃ অম্বুজ! অত উতলা হ'স নে। ওতে তো তোর কোন হাত নেই। তুই কি করবি বল?

—অবনীদা! এরাও মানুষ, আমরা যে তা বুঝি না।

—সে দিন আসবে অম্বুজ! যেদিন ওদের সঙ্গে আমাদের কোন তফাৎ থাকবে না।

—অবনীদা! সবাই সর্দারকে তুমি বাঁচাও।

—আইনের চোখে সে দোষী! ভগবানের চোখে সে দোষী নয়। আমি তো বিচারের মালিক নই অম্বুজ!

—তা'হলে কি হবে?

—কি আর হবে? সে তো সবই স্বীকার করেছে, আর করবেও। দায়রায় বিচার হবে। জজের দয়া হতে পারে। তবু নির্ঘাত ছয়-সাত বছরের জেল।

—মুক্তি পাবে না অবনীদা?

—না রে! আর মুক্তি পেলেই বা ওর কি? বুড়োটা তো পাগল হয়ে গেছে। ছাড়া পেলেও সে বাঁচবে না।

—আমায় ডেকেছো অবনীদা?

—হ্যাঁরে, সব জেনে নিয়েছি। তোকে জড়াতে দেবো না। মিছিমিছি তোকে সাক্ষী হতে হবে।

—বুড়ো সর্দারের যদি উপকার হয়, আমি সাক্ষী হবো।

—না, দরকার নেই। সব কথা চেপে যেতে হবে। যদি প্রয়োজন হয়, বলবি—পাহাড়ে বেড়াতে গেছলি, ভাটি এগিয়ে দিয়েছিল। বোধ হয় দরকার হবে না। পুলিশ সাহেব মণীশবাবুকেও আমি বলে দেবো।

—তুমি যা ভাল বোঝ করো অবনীদা। আমি একবার ওদের দেখব। লাসগুলো কোথায়।

—পাহাড়ের পথেই পড়ে আছে। চল আমার সঙ্গে।

—তা'হলে চল অবনীদা!

—হ্যাঁ এক্ষুনি যাবো। আচ্ছা, সুবীর এখানে নেই বলে কি কাঞ্চনগড় আর মাড়াবি না? আমি এখানে রয়েছি, একদিনও দেখা করলি না।

—তুমি এখানে আছ, তা আমি কি ক'রে জানব অবনীদা! বৌদি কেমন আছেন?

—বেশ আছে! চল না আজই আমার সঙ্গে। যা বাড়িতে বলে আয় গে। রাত্রেই ফিরে আসবি।

অবনীদা হাঁকলেন—শরণ সিং!

দরজা খুলে গেল। অবনীদা বললেন,—যা চট্‌পট্‌ সেরে আয় গে। জমিদারের বৈঠকখানা থেকে বের হ'তেই হিতৈষী মাতব্বরেরা আমায় ঘিরে ধরলেন,—কি হ'ল বাবা! কিছু লিখিয়ে নিলে নাকি?

আমি হেসে উত্তর দিলাম,—না, থানায় আমার নিমন্ত্রণ আছে।

আমার কথা শুনে ছোটবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। কৈলাসবাবু বললেন—ঘুষ চায় নিশ্চয়! ঘুষ দিলেই সব হবে।

ছোটবাবু বললেন,—তার ব্যবস্থা আমি করছি। তুমি কোথায় চলেছ বাবাজী?

বাড়ির দিকে পা বাড়িয়ে বললাম,—আমি তৈরী হয়ে আসি। থানা থেকে কি আর ছাড়বে?

হাতিম মিয়া বললেন,—ভয় নেই বাবাজী! তুমি শীগ্‌গির এসো, আমরা সব ঠিকঠাক করছি।

আমি জবাব দিলাম—আমার দাদার তো টাকা নেই। আমায় যেতেই হবে।

ছোটবাবু বললেন,—আমরা আছি কি করতে? আমাদের মাথা হেঁট হয়ে যাবে না! যাও বাপ্! শীগগির ফিরে এসো।

বাড়ি ফিরে চন্দ্রমামা ও পিসীমাকে সব বুঝিয়ে বললাম। দাদা কাজে বেরিয়ে গেছেন। পিসীমা প্রথমে অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন; কিন্তু অবনী

দারোগার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা খুলে বলার শেষে আশ্বস্ত হলেন। তবু বললেন,—কি জানি বাবা! পুলিস তো, ওদের বিশ্বাস নেই। মা মঙ্গলচণ্ডী তোর মঙ্গল করুন! ভালয় ভালয় ফিরে আয়।

চন্দ্রনাথ বললেন,—ভয় কি দিদি! সকলই মায়ের ইচ্ছা! যাও বাবা! দেরী করো না।

তিনি গান ধরলেন,—

তুমি আমি কেউ কিছু নয়,
শ্যামা মা যে ঘুরোয় চাকি।
মিছে তোমার ভাবনা ভয়,
জীবনটা তোর নয়রে ফাঁকি॥

পাহাড়ী পথে অবনীদার সঙ্গে এগিয়ে চলেছি। সেই ছড়ার ধারে এসে পথটা বেঁকেছে। এখানে একটা মস্ত বড় বকুল গাছ। তারই আশেপাশে ঘন নল-খাগড়ার বন। অবনীদা বললেন,—'ঐ যে!' সামনে তাকিয়ে দেখি বাঁকের মোড়ে লোকে গিজ গিজ করছে। আট-দশ জন লাল-পাগড়ী পুলিস একটা জায়গা ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

অবনীদা আমাকে নিয়ে তাদের কাছে এগিয়ে গেলেন। ঐ যে! ঐ যে! ভাটি পড়ে রয়েছে। খোলা বুকের ওপর তীর বেঁধা জায়গাটা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়েছে। শুকিয়ে গেছে রক্ত; ডেলা ডেলা রক্ত! কালচে মেরে গেছে! কিন্তু এ কি! তার ঠোঁটের মুখের মাংসও যেন কে ছিঁড়ে নিয়েছে! ঘাঘরা রক্তে রক্তাক্ত হয়ে গেছে। মাটিতে রক্ত গড়িয়ে জমে রয়েছে! মোহনের একটা হাত ভাটির মাথার নীচে,—মাথাটা ছিটকে সরে গেছে। কি বীভৎস দৃশ্য!

চীৎকার করছে লবাই সর্দার! এসেছো দাদাঠাকুর! রাজপাটের গল্প শুনতে এসেছো! আমার ভাটি চলে গেছে। চম্পা নিয়ে গেছে তাকে। ঐ যে! ঐ যে! মদনকুমার বাঁশী বাজাচ্ছে!

লবাই বুড়োর হাতে হাত-কড়ি! হাউ হাউ ক'রে কাঁদছে লবাই! তার মুখের দিকে আর তাকাতে পারি না। চোখ-মুখ তার ঘোর লাল। গায়ে-হাতে তার শুকনো রক্ত! আমার চোখ বুজে এল। আমি কাঁপতে লাগলাম! অবনীদা বললেন,—চল্ হয়েছে। আর কি দেখবি? সঙ্গের

কনস্টেবলদের বললেন,—বারোটার ট্রেনে আসামীকে নিয়ে সদরে চলে যাও। আমি ছোট দারোগাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

অবনীদা আমার হাত ধরে প্রায় টেনে নিয়ে চললেন; কিন্তু আমার পা যেন চলে না। কি নির্মম মৃত্যু! হতাশ প্রেমিকের মধ্যে পশু জেগেছিল। মোহন পশু হয়ে উঠেছিল নিশ্চয়! শুধু হত্যা ক'রেই ছাড়ে নি। তার মাঝে আদিম মানুষের পাশবিক লালসা জেগে উঠেছিল। তারই নিদারুণ আবেগে ভাটি ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। মুমূর্ষু—বিষকাঁড়ের বিষে অচেতন নারীর ওপর অত্যাচার করেছে পাহাড়ী পশু মোহন!

অবনীদা আমাকে নিয়ে নৌকোয় উঠলেন। নৌকো কাঞ্চনগড়ের দিকে চলল। সংজ্ঞাহীনের মত এলিয়ে পড়লাম নৌকোর ভেতর। অবনীদা আমার চোখে-মুখে জল দিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। তাঁরও চোখে জল।

তিনি বললেন,—পুলিসে চাকরী নিয়েছি অম্বুজ। কত কি দেখতে হয়; কিন্তু এরকম কোথাও দেখিনি। এ বড় বীভৎস কাণ্ড।

আমি আর যেন কথা বলতে পারি না। অবনীদার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ভাটির মুখখানি বারবার আমার চোখে ভাসতে লাগল। অবনীদা বললেন,—এখন দেখছি, তোকে না দেখালেই ভাল হ'ত। আমি ভুল করেছি।

আমার কানে তখন ঝঙ্কার দিচ্ছে লবাই বুড়োর চীৎকার—দাদাঠাকুর! দাদাঠাকুর! চললে, বাঁশী বাজাও দাদাঠাকুর! দিদি আমার ছুটে আসবে, ছুটে আসবে। আয় আয় ভাটি! দিদি আমার! আয় রে! তারপর কি হ'ল জানিনে। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। এ কি! আমি কোথায় শুয়ে আছি? সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশ! কে ইনি? তাকিয়ে দেখি, বৌদি আমার বিছানার কাছে চেয়ারে বসে আমার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছেন। মুখে তাঁর উৎকণ্ঠা। তবু স্নিগ্ধ হাসি ফুটে রয়েছে। ইনি যে নমিতা বৌদি! আমি কি স্বপ্ন দেখছি? নমিতা বৌদি!—চার পাঁচ বছর পরে দেখা! সুবীরের বৌদি, অবনীদার স্ত্রী।

বৌদি বললেন,—চিনতে পারছ আমায়? ঐ যে খোকন এসেছে। ওকে চিনতে পারছ না?

আট নয় বছরের একটি ফুটফুটে ছেলে এগিয়ে এল। খোকন?—অবনীদার

ছেলে খোকন! হ্যাঁ, খোকনই তো! বৌদিকে বললাম,—আমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বৌদি? আমার যে কিছুই মনে পড়ছে না।

বৌদি বললেন,—মনে ক'রে আর কাজ নেই! বাব্বাঃ! যা ভাবিয়ে তুলেছিলে। নৌকোর ওপরেই ঘুমিয়ে পড়েছিলে তুমি। সে ঘুম এতক্ষণে ভাঙল।

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করি,—নৌকোর ওপরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এখানে এলাম কি ক'রে?

হাসিমুখে বৌদি বললেন,—তোমার ঘুম না ভাঙিয়ে তোমার দাদা তোমাকে তুলে নিয়ে এসে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছেন।

সব কথা ধীরে ধীরে মনে পড়ে গেল। শঙ্কিত হয়ে বৌদিকে বললাম,—বেলা কত হয়েছে বৌদি?

বৌদি বললেন,—বেলা? এখন রাত আটটা।

রাত আটটা! বাড়িতে পিসীমা যে ভেবে মরবেন বৌদি!—ব্যাকুল হয়ে উঠতে যাচ্ছি, কিন্তু ওঠবার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছি।

বৌদি বললেন,—সে জন্যে ভাবতে হবে না। খবর দেওয়া হয়েছে। তোমার দাদা সন্ধ্যার ট্রেনে সদরে গেছেন। কাল ভোরে ফিরবেন। আয় না খোকন! কাকুর কাছে।

খোকনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম। খোকন এসে আমার পাশে বসল। কাঞ্চনগড়ে বড় দারোগা অবনীবাবুর বাসাবাড়িতে বিছানায় শুয়ে পাহাড়ের সেই বীভৎস দৃশ্যের কথা ভাবি। বৌদি বললেন,—এত ভেবো না ভাই! পুরুষমানুষ এত মুষড়ে পড়তে আছে? তোমার দাদারই অন্যায় হয়েছে। তোমার কি এসব জায়গায় নিয়ে যেতে আছে?

তারপর বৌদি বললেন,—বেশী কথা বলো না ভাই! তুমি চুপ ক'রে একটু শোও। আমি আসছি।

বৌদি অন্য ঘরে চলে গেলেন! একটু পরেই গরম দুধ একবাটি এনে আমাকে খেতে দিলেন। বাধা দিলেও তিনি শুনতে চান না; কিন্তু বেশী খেতে পারলাম না। দুধ যেন গলায় আটকে যায়। বৌদিকে বললাম,—এখন আর খেতে পারব না বৌদি।

তিনি বললেন,—ওকি? সারাদিন কিছুই মুখে দাওনি। এইটুকু দুধ খেতে পারছ না?

"না বৌদি! মাথাটা বড্ড ঘুরছে!"—চোখ বুজে ফেললাম আমি। খোকন আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। বৌদি হাতপাখা নিয়ে হাওয়া করছেন। পায়ের শব্দে তাকিয়ে দেখি, দিব্যনাথ আর বুড়ো পার্বতী ডাক্তার ঘরে প্রবেশ করেছেন। লজ্জা ও সংকোচে চোখ বুজে এল।

দিব্যনাথ বললেন—এই তো ঘুম ভেঙেছে। বাব্বা! এত ঘুমোতে পারিস?

ডাক্তারবাবু আমার নাড়ী দেখলেন। স্টেথিস্কোপ দিয়ে বুক পরীক্ষা ক'রে হাসি-মুখে বললেন,—বেশ আছে। হাসি-খুশীতে ভুলিয়ে রেখে দাও বৌমা! আরও বিশ্রামের দরকার।

দিব্যনাথ বললেন,—কাল তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া হবে অম্বুজ! বেশ ছেলে তো? কাঞ্চনগড়কে ভুলে গেছলি? কাঞ্চনগড়ই তোকে টেনে আনল। আচ্ছা, এখন আমরা আসি!

কোন উত্তর দিতে পারি না। ডাক্তারবাবু বললেন,—এক্ষুনি একটা ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি বৌমা, খাইয়ে দিও।

বৌদি বললেন,—কিছু যে খেতে চাইছে না।

—না, না, খেতে হবে অম্বুজ! দুধ, ফলের রস যত পারো খাও, ভয় নেই—বলতে বলতে দিব্যনাথ আর পার্বতী ডাক্তার বে'রিয়ে গেলেন।

খোকন ইতিমধ্যে একখানা বই হাতে নিয়ে আমার পাশে বসে বললে,—তোমায় আর যেতে দেব না অম্বুজ কাকা! বৌদি হাসতে লাগলেন। খোকনের কবিতা শুনেও শুনছি না। কেমন যেন ঘোর লেগেছে তন্দ্রার। হঠাৎ কানে শিশু কণ্ঠের ঝঙ্কার এসে বিচলিত ক'রে তুলল,—

হারাই হারাই ভয়ে গো তাই,
বুকে চেপে রাখতে যে চাই,
কেঁদে মরি একটু সরে দাঁড়ালে।
জানিনে কোন মায়ার ফাঁদে
বিশ্বের ধন রাখবো বেঁধে
আমার এ ক্ষীণ বাহু দুটির আড়ালে॥

কাঞ্চনগড়ে দিন তিনেক কাটিয়ে বাড়ি ফিরলাম। বারবার খোকনের কথা মনে পড়ছে। সে আমায় কিছুতেই ছাড়বে না। তারই নজরবন্দী ছিলাম আমি! নমিতা বৌদিও সজল চোখে বিদায় দিয়েছেন। এরা

যে আমার এত আপন জন তা কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিনি। বৌদি বলেছেন,—"বৌদিকে মনে রেখো ভাই।" অবনীদা বলেছেন,—"তুই যখন কলকাতায় যাবি আমার সঙ্গে দেখা করবি। টাকার জন্ম ভাবিস নে। বেশ একটা মজা হয়েছে, তখন তোকে বলব।"

গ্রামের হিতৈষীর দল আমাকে ছেঁকে ধরলেন। ছোটবাবু এক গাল হেসে বললেন,—বলেছি না আমরা থাকতে তোমার ভাবনা নেই। যাক, দারোগাবু আমাদের মানটা রেখেছেন।

পিসীমা বললেন,—শুনেছি পাঁচশো টাকা ঘুষ নিয়েছে বড় দারোগা। তোর সঙ্গে এত জানাশুনা, এত খাতির-যত্ন করলে। তবু এতগুলো টাকা নিলে?

পিসীমার কথায় বিস্মিত হলাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করি,—কে এত টাকা দিলে পিসীমা?

পিসীমা বললেন,—ছোটবাবুই যোগাড় ক'রে দিয়েছেন। তোর দাদা এত টাকা পাবে কোথায়?

মনে বড় আঘাত লাগল। এই করে ছোটবাবুর মানরক্ষা করেছে বড় দারোগা! এত স্নেহ-মমতা, এত দরদ—সবই তবে কৃত্রিম! পুলিসে চাকরী নিয়ে অবনীদা লজ্জা-শরমও বিসর্জন দিয়েছে! নমিতা বৌদি কি একথা জানে?—খোকনের হাসিমাখা মুখ চোখের সামনে ভাসতে থাকে! —না, না, নমিতা বৌদি নিশ্চয়ই এসব জানে না। অবনীদার সবই চালাকী। সাপও মরল, লাঠিও ভাঙ্গল না! আমার জন্ম পাঁচশো টাকা ঘুষ নিয়েছে? কেন কি করেছি আমি? না হয় কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে দু'কথা বলতে হ'ত! গাঁয়ের লোকগুলো কি বোকা! বোকাদেরই পুলিসের লোকেরা ঠকায়!

চন্দ্রনাথ হাসিমুখে বললেন,—অত ভাবছিস কেন বাবা! সবই মা আনন্দময়ীর ইচ্ছা। কালই আমাদের যাত্রা করতে হবে! যাবি তো?

অবনীদার ঘুষ নেওয়ার কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম। চন্দ্রনাথকে বললাম,—না মামা, আমি যাব না। সদরে গিয়ে আমি জবানবন্দী দিয়ে আসব!

চন্দ্রনাথ হো-হো করে হেসে উঠলেন। তারপর তিনি বললেন,—কি করবি? সদরে যাবি? অবনীবাবুকে বিশ্বাস নেই তোর? আমি বলছি, অবনীবাবু তোর ভালই করবে, তোকে সে ভালবাসে!

—ঘুষ নিয়েছে অবনী দারোগা। বিরক্তি প্রকাশ পায় আমার কণ্ঠে।

চন্দ্রনাথ বললেন,—ওসব বাজে কথা তুই বিশ্বাস করিস! গাঁয়ের লোকেদের তুই চিনলি না।

আমি বললাম,—তা'হলে ঘুষ নেওয়ার কথাটা মিছে?

চন্দ্রনাথ, বললেন,—সত্যি হোক মিথ্যে হোক তোর তাতে কি? অবনীবাবু যা করবে তোর মঙ্গলের জন্মই করবে।

চন্দ্রনাথের কথায় কতকটা শান্ত হলাম। অবনীদা নিশ্চয়ই এত হীন প্রকৃতির লোক নয়। পাঁচ বছর আগেকার কথা মনে পড়ে যায়; অবনীদা যখন সুবীরদের বাসায় আসতেন তখন তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। নিজের দাদার মতই আমার কত আব্দার মিটিয়েছেন। কাঞ্চনগড় থেকে পালিয়ে গিয়ে খোকনকে নিয়ে খেলা করতাম; চার বছরের সেই শিশুটি আমার কোল থেকে নামত না। ছোটবাবু নিজের কেরামতি দেখাবার জন্মই এ সব রটিয়ে বেড়াচ্ছেন। যাক, অবনীদাকে একদিন জিজ্ঞেস করলেই হবে।

ভুবননাথের যাত্রী। সঙ্গী জুটেছে অনেক! তাদের মধ্যে বিধবার সংখ্যাই বেশী। দাসেদের মেয়ে সুবালা। বছর দেড়েক আগে তার বিয়ে হয়েছিল; বিয়ের পর মাসখানেকের মধ্যেই সে স্বামীকে হারিয়েছে। সেও চলেছে আমাদের সঙ্গে। উনিশ কুড়ি বছরের মেয়ে; সুন্দর সুশ্রী চেহারা। আজ যেন সে পাষাণের মূর্তি; মাথার চুল সরু ক'রে ছাঁটা। পরনে তার থান কাপড়। নবীন মাঝি, মুরারি দত্ত ও পঞ্চু দে আছে আমাদের সঙ্গে। পঞ্চু আবার যাত্রার দলে সঙ সাজে; গানও গাইতে পারে। পঞ্চু!

ট্রেনেও যাত্রীর ভিড়। শিবচতুর্দশীর মেলায় ভুবননাথের পথে অনেকে পা বাড়িয়েছে! পোঁটলা-পুঁটলিতে ট্রেনে বসবারও জায়গা মেলে না। মেয়েরাই ভার বাড়িয়েছে অনেক। যতগুলি মেয়ে, পোঁটলা-পুঁটলি তার তিনগুণ। পান, দোক্তা, সুপারি থেকে আরম্ভ ক'রে তেল, নুন, লঙ্কা, গুড়, চিঁড়ে কিছুই বাদ যায় নি। মুক্তো ঠাকুরুণ আমাদের সঙ্গের মেয়েদের তদ্বির করছেন। তিনি বললেন,—বাবা! বিদেশ-বিভুঁই, সব জিনিসই সঙ্গে রাখতে হয়। কখন কি দরকার লাগে, বলা যায় না।

শহরের বড় স্টেশনে এসে ট্রেন থামল ; সেখান থেকে হাঁটাপথে ত্রিশ মাইল যেতে হবে। মুরারি দত্ত তাড়া লাগালেন। বেলা প্রায় পড়ে এসেছে। শহরের দোকান-পশারের দিকে অবাক হয়ে এরা তাকিয়ে থাকে ; হোঁচট খায় ; ঘোড়ার গাড়ি, সাইকেল আর গোরুর গাড়ীর তলায় পড়ি-পড়ি ক'রে বেঁচে যায়। তখনও মোটর কিংবা লরির তত চলন হয় নি। ভোট-ভাট আওয়াজ ক'রে মাত্র একখানি মোটর চলে যেতে দেখেছিলাম ; চন্দ্রনাথ বললেন,—দেখ, দেখ, হাওয়াগাড়ি চলছে। ইংরেজের বুদ্ধি বলিহারী যাই বাবা !

আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছিল ; তৃষ্ণায়ও বেশ কাতর হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু মুরারি দত্ত বললেন,—এগিয়ে চল বাবা ! এখানে জল-টল খাওযা চলবে না। জানা নেই, শোনা নেই, জাত-বেজাতের হাতে জল খাওয়া চলে না।

তারপর এক জায়গায় দেখা গেল—বড় বড় অক্ষরে সাইন-বোর্ড ঝুলছে —বিশুদ্ধ হিন্দু হোটেল। মুরারী দত্ত বললেন,—বিশ্বাস নেই বাবা ! আজকাল পৈতে গলায় দিয়ে কত জাত ব্রাহ্মণ সেজে বসে আছে। শহরের কে কার খবর রাখে। অবিশ্যি আমাদের দত্তবাবুদের জামাইয়ের বাসা-বাড়ির খোঁজ নিলে হ'ত।

চন্দ্রনাথ বললেন,—থাক্ বাবাজী ! চল না, মেহেরপুরের আখড়ায় ! বেশী দূর তো নয় !

শহর ছাড়িয়ে মেহেরপুরের আখড়ায় এসে পৌঁছলাম ; সন্ধ্যে হয়ে গেছে। আখড়ার নাটমন্দিরে জিনিসপত্র রেখে সব পুকুর ঘাটে চলে গেল। চন্দ্রনাথ বললেন,—আয় বাবা ! পুকুর ঘাটে হাত-মুখ ধুয়ে চিঁড়ে গুড় খেয়ে জল খাবি। তোর কষ্ট হবে জানি ; কিন্তু এ ছাড়া যে উপায় নেই। এ কদিন চিঁড়ে খেয়েই কাটাতে হবে।

বিস্মিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করি,—কেন মামা, আখড়ায় কি ভাত মেলে না ?

তিনি উত্তর দিলেন—আখড়ায় ভাত খাবি ? বোষ্টমের হাতে খেলে জাত যাবে যে। সঙ্গে এত লোক রয়েছে, এরা যে তোর জাত কেড়ে নেবে।

স্তম্ভিত হই চন্দ্রনাথের কথায়। তাঁকে বলি,—জাত কেড়ে নেবে ?

—হ্যাঁ ! দেখলি না শহরের কলের জল মুখে পর্যন্ত দিলে না, পাছে

জাত যায়। জাতকুল নষ্ট হলে ভুবননাথের দর্শন যদি না মেলে!—চন্দ্রনাথ কথাগুলি বলে হো হো ক'রে হেসে উঠলেন।

আমি বললাম,—আপনিও এসব মানেন মামা?

—মানি বৈ কি? এদের সঙ্গে যখন আছি, এদের সমাজে যখন বাস করছি, তখন মানতেই হবে।

—জেনে শুনে তা'হলে মিথ্যে গোঁড়ামির প্রশ্রয় দিতে হবে।

—মিথ্যে নয় রে! যখন যেখানে থাকবে, সেখানকার মতেই চলতে হবে। বিলেত যাও, বিলেতী সাহেব সাজতে হবে।

—সন্ন্যাসীরা তো সবার হাতে খায়।

—না তারা সবার হাতে খায় না। জাতকুল মানে না, এ কথা বলতে পারিস। নিষ্ঠার সঙ্গে যে দেয় তারই হাতে তারা খায়।

—আমি ওসব মানি না। মানবও না; আমার ক্ষিদে পেয়েছে।

চন্দ্রনাথ হেসে বললেন,—ঐ আখড়ার বাবাজী চাইলেও তোকে ভাত দেবে না। ওরও ধর্মভয় আছে! বামুনের ছেলের জাত মেরে সে কি মহাপ্রভুর কৃপা থেকে বঞ্চিত হবে?

আশ্চর্য হই চন্দ্রনাথের কথা শুনে। আচণ্ডালে যিনি প্রেম বিলিয়াছেন, সেই মহাপ্রভুর ভক্তেরাও তা'হলে জাত মানে। চন্দ্রনাথের অনুরোধে অগত্যা চিঁড়ে-গুড় খেয়ে ক্ষিদে মেটাতে হ'ল।

পরদিন সকাল বেলা চন্দ্রনাথ এক কাণ্ড ক'রে বসলেন; আখড়ার মোহান্তের কাছ থেকে মাটির হাঁড়ি বাসন যোগাড় ক'রে পুকুর-ধারে রান্নার আয়োজন করলেন। ডাল, ভাত আর আলুসিদ্ধ পরম তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া গেল। মোহান্ত করযোড়ে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সুবালার পাষাণ-মূর্তিতে এ দু'দিনে যেন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। মুক্তো ঠাকুরুণ গজর গজর করেই চলেছেন। সুবালা মেয়েদের মহল ছেড়ে এগিয়ে চলে। তার চাহনির মধ্যে চঞ্চলতা ফুটে ওঠে। পঙ্কু মাঝে মাঝে গান ধরে—

মরা গাঙে জোয়ার এল
কালার বাঁশীর সুরে।
ঘরে আমি রইতে নারি
পরাণ পাগল করে।
সইগো, পরাণ পাগল করে॥

মুক্তো ঠাকুরুণ মাঝে মাঝে বলে ওঠেন,—আ মর্ মুখপোড়া। তোর গানের মুখে ঝাঁটা।

সুবালা খিলখিল ক'রে হেসে ওঠে। মুক্তো ঠাকুরুণ বলেন,—হ্যাঁ রে সুবালা! তোরও মতিভ্রম হ'ল নাকি? কাঁচা বয়েস; পথে বেরিয়েছিস। সামলে চল বাপু!

সুবালা বলে,—আমার জন্য ভেবো না ঠাকুরুণ দিদি! পঞ্চুদা গায় ভাল। বেশ লাগে।

—মরণ আর কি? মুক্তো ঠাকুরুণ গজর গজর করেন। সুবালা হাসে। লক্ষ্য করি, মাঝে মাঝে সুবালার চোখে জল ও ঝরে!

পাহাড়ী পথ। আশে-পাশে চায়ের বাগান। রাস্তার ধারে কুলি-বস্তী, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ছুটাছুটি করছে। ঘন শ্যামল চায়ের ক্ষেত ছবির মত যেন দিগ্‌দিগন্ত ছেয়ে ফেলেছে। দূরে উঁচু টিলার ওপর বাগিচার সাহেবের কুঠি দেখা যাচ্ছে। কাতারে কাতারে যাত্রী চলেছে এই পথে। কুলী-কামিনদেরও দেখা যাচ্ছে; বাংলা আর হিন্দির খিচুড়ি-মেশানো তাদের কথাবার্তা। এরা না কি কোন সে সাঁওতাল-দেশের লোক! চন্দ্রনাথ বলেন,—গিরমিট দিয়ে এসেছে এরা, ফিরে যাবার উপায় নেই। ভুলিয়ে ভালিয়ে সই করিয়েছে। তারপর জোর ক'রে ধরে নিয়ে এসেছে সাহেবদের লোক!

গিরমিট কথাটা তখন বুঝিনি। চন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করলাম,—গিরমিটে সই করিয়েছে! গিরমিট কি মামা?

তিনি জবাব দিলেন,—গিরমিট বুঝলি না? চাকরীর দাসখৎ।

পরে বুঝেছিলাম—এরা এগ্রিমেণ্টে সই করেছে। চুক্তি করেছে, স্বেচ্ছায় চাকরী করতে যাচ্ছে একটা নির্দিষ্টকালের জন্য। প্রথম প্রথম তাদের বড় কষ্ট হ'ত। এখন হাজারে হাজারে এসে পড়েছে। নিজেদের ঘরবাড়ি ক'রে নিয়েছে; গড়ে উঠেছে কুলির সমাজ। বেশ আছে তারা!

পৈতৃক ভিটে-মাটি ছেড়ে এসেছে চা-বাগানের কুলির দল। মনে প্রশ্ন জাগে,—কুলিগিরির জন্যই কি বিধাতা এদের সৃষ্টি করেছেন! এ বিভেদ কি ভগবানের সৃষ্টি? জোর ক'রে নিয়ে এসেছে এদের। পালাবার উপায় নেই। নিজের দেশে ফিরে যাবার কল্পনাও এরা করতে পারে না।

চন্দ্রনাথ বলেন,—এখনও বছর বছর নতুন চালান আসে বাবা!

মা-বাপকে ছেড়ে দিয়ে ছেলেরাও চলে আসে লোভে পড়ে। তারপর কাঁদে।

কাঁদবে বৈ কি!—এই তো বাগিচার কুলি! ক্রীতদাস এরা। বাপ—মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসে এদের। এরা কি পায় তার বদলে? সারাদিনই খাটছে; কুঁড়ে ঘরে গোরু-ছাগলের মত বাঁচবার জন্যই এদের জীবন। এরা কি মানুষ নয়? কালো কুচকুচে চেহারা তাদের। তারা জংলী ভাষায় কথা বলে,—ভগবান কি এদের কুলিগিরির ছাপ মেরে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন? তাদের হাতে উল্কির ছাপ দেখে মনে হয়েছিল—এটাই সম্ভবত কুলিগিরির ছাপ।

চা বাগিচার কলঘরে বাঁশী বেজে উঠল; দলে দলে কুলি বেরিয়েছে। বাগানের চত্বরে বেশ সুন্দর লাগছে তাদের। কুলিদের শ্যামশ্রীমণ্ডিত মুখের সঙ্গে ঘনশ্যাম চায়ের কোরকের যেন কেমন মিল রয়েছে। দু'টি কিশোরী কেমন হাসিতে লুটিয়ে পড়ছে। দূর থেকে একটি কিশোর কুলি চায়ের সাদা ফুল ছুঁড়ে মারছে কিশোরীদের ওপর। ভাবি,—এরা কি নিজের অদৃষ্ট মেনে নিয়েছে? তা না হ'লে কি এমন হাসতে পারে! একটা জোয়ান কুলি-সর্দার হাতে বেত নিয়ে গোরু-ছাগলের মত একদল কুলি-কামিনদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে দেখলাম। একজন বুড়ো কুলি রাস্তার ধারে বসে হাঁপাচ্ছে।

কুলি আর মেথর। এদের কথা অনেকদিন থেকেই ভাবি। কোন কূল-কিনারা পাই নে। তর্করত্ন বলেন,—কর্মফলেই কুলি-মেথর হয়ে জন্মেছে। এদের ভগবান এই জন্যই সৃষ্টি করেছেন। তা না হলে এসব কাজ-কর্ম কে করবে? বেশ যুক্তি! সত্যই তো, মেথর, মুচি আর কুলিরা নিজেদের কাজ-কর্ম ছেড়ে দিলে আমাদের চলবে কি ক'রে? ভাগাড়ের মড়া-পচা খাবার জন্যই শকুনের সৃষ্টি! খ্রীষ্টান পাদরী পর্যন্ত এদের দিকে তাকায় না। পাহাড়ীদের বেলা তো একথা খাটে না। দলে দলে তারা খ্রীষ্টান হচ্ছে; লেখাপড়া শিখে বড় চাকরীও করছে। আমার সঙ্গেই কলেজে পড়ত মুরাং এন্টনি। পাহাড়ীদের ছেলে, স্কলারশিপও পেয়েছে ম্যাট্রিকে। কিন্তু এই কুলি আর শহরের মেথর! এদের জন্যে কেউ ভাবে না। এদের বড় হবার পথ বন্ধ।

চন্দ্রনাথ বললেন,—আজ চা-বাগানের বিনোদবাবুর বাসায় রাত কাটাতে

হবে বাবা! ভক্ত মনুষ, আদর যত্ন করবেন খুব!—দেখলাম, এ সব অঞ্চল চন্দ্রনাথের জানাশোনা। দু'একজন কুলি চন্দ্রনাথকে দেখতে পেয়ে প্রণাম করে। 'কেমন আছ ঠাকুর বাবা!' বলে পায়ের ধুলোও নেয়। বাগানের একপাশে বড় রাস্তার ধারেই বাবুদের বাসা। বাবুরা সকলেই বাঙ্গালী। বিনোদবাবুর বাসায় অনেকগুলি ঘর; রাত্রে বেশ আরামেই থাকা গেল। ভোজনের আয়োজনে প্রাচুর্য দেখে বিস্মিত হলাম; পাঁঠাও কাটা হ'ল একটা। অবশ্য চন্দ্রনাথ কালীপুজো ক'রে কালীর নামে পাঁঠাটাকে উৎসর্গ করলেন। অযথা নাকি জীব হিংসা করতে নেই! বৃথা মাংস ভক্ষণ মহাপাপ! মা-কালীর নামে উৎসর্গ করলেই সে দোষ কেটে যায়।

বিধবা সুবালা চিঁড়ে-গুড় ছাড়া এ কদিন আর কিছু খায় নি। তবু তার আচরণে এ কদিনেই একটা উন্মনা ভাব এসেছে। তার কথায়-বার্তায় উচ্ছলতা বেড়ে গেছে। তবে আজও সে ভাত খেতে রাজি হ'ল না।

সুবালাকে বললাম,—তুমি নিরামিষ খেলেই পারতে দিদি! এখানে তো আলাদা সব ব্যবস্থা রয়েছে।

সুবালা উত্তর দেয়,—আমার প্রবৃত্তি হয় না ভাই! আমার কথা ছেড়ে দাও।

সুবালার নিষ্ঠা দেখে আশ্চর্য হই; এই তরুণী মেয়ের কি কঠিন নিষ্ঠা! তাকে বললাম,—তবু কষ্ট হয় তো? সারাজীবন যে এরকম কাটাতে হবে!

সুবালা হেসে উত্তর দেয়,—অদৃষ্টের লেখা কে খণ্ডাবে বলো?

মুক্তো ঠাকরুণ বলেন,—এ জন্ম তো খোয়ালে, পরজন্মের কথা তো ভাবতে হবে।

আমি বললাম,—বিধবা সেজে নিরামিষ খেলে আর একাদশী করলেই কি পরজন্মটা ঝরঝরে হয়ে যাবে দিদিমা?

সুবালা ছিঃ ছিঃ ক'রে হেসে বলে,—ভৃগু কলেজে পড়ে কিনা! তাই এ সব কথা শিখেছে।

মুক্তো ঠাকরুণ বললেন,—সব একাকার হয়ে যাবে। জাত জন্ম খুইয়ে সব খ্রীষ্টান হবে, কলিযুগ এসে গেছে, সত্যনারায়ণের পাঁচালিতে ঠিকই

না মানিবে জাতি-ধর্ম না মানিবে বাপ।
কলিযুগে না লাগিবে জননীর শাপ॥
বিধবার বিয়ে হবে, যত কাঁচা রাঁড়ি।
মাছ খাবে মাংস খাবে যাবে শ্বশুরবাড়ি॥

সুবালা বলে,—কোন্ সত্যনারায়ণের পাঁচালিতে এ সব কথা লেখা আছে দিদিমা?

মুক্তো ঠাকরুণ ভ্রূকুটি ক'রে বলেন,—পাঁচালি তো শুনিস নি কোনদিন; আমার বাবা পড়তেন, ছোটবেলায় আমার শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে। ঠাকুর-দেবতার কথা তো তোরা পড়বি না?

বাঃ, ঠাকুর-দেবতার কথাই বটে। পাঁচালি-লেখকদের দিব্যদৃষ্টি ছিল বলতে হবে। হাসি পায় মুক্তো ঠাকরুণের কথা শুনে। মুরারি দত্ত বলে,—কল্কি পুরাণে এ সব কথা আছে বাবাজী! কল্কি পুরাণ পড়েছ? আমাদের শাস্ত্রে সব কথাই লেখা আছে; পঞ্জিকায় দেখো নি? এই যবন ইংরেজেরা যে আসবে, কলিযুগের কথায় তাও লেখা আছে।

আমি বললাম,—তা'হলে এই ইংরেজদের পর কে আসবে, তাও নিশ্চয়ই লেখা আছে।

মুরারি দত্ত বললেন,—আর কেউ আসবে না বাবাজী! এখানেই কলি পূর্ণ হবে। ইংরেজ গেলে কি আর আমাদের রক্ষে আছে? ভগবানই তাদের পাঠিয়েছেন বাবা!

এদের কথায় আপসোস হয়; বিধিলিপি আর বিধাতার বিধান এরা মেনে নিয়েছে। উনিশ বছরের মেয়ে চুল ছেঁটে ফেলেছে; নিরামিষ খাচ্ছে! একবেলা আহার করে, একাদশীর উপোস করে। লোভ, লালসা, প্রবৃত্তি দমন করতে যায়! হিন্দুর বিধবার কঠোর জীবন,—এই কি বিধিলিপি? কুলি কুলিই থাকবে; মেথর মেথরই থাকবে; বিধবাকে আমরণ মৃত স্বামীর মুখ স্মরণ ক'রে বেঁচে থাকতে হবে—এই কি বিধিলিপি? চন্দ্রনাথ বলেন,—"বিধিলিপি খণ্ডানো যায় না।" তা'হলে আমরা যা করছি, সবই আগে ঠিক হয়ে আছে! অদৃশ্য হস্তে কেউ কি আমাদের চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে? সুবালার বিধিলিপি কি খণ্ডানো যেত না? ঠিক ঐ সময়ে ঐ লোকের সঙ্গে বিয়ে না দিলে হয়তো সে বিধবা হ'ত না।

মনে পড়ে যায়, জ্যোতিষী সারদাচরণের কথা। তিনি তো ছক কেটে

সব বলে দিতে পারতেন। জ্যোতিষীরা তা'হলে আগে থেকে লোককে সাবধান ক'রে দেয় না কেন? অন্তরে প্রতিধ্বনিত হয়,—না, না, না। এ যে বিধিলিপি! সাবধান ক'রে দিলেও নিস্তার নেই, যা ঘটবার তা ঘটবেই। ভৃগু-সংহিতার কথাও ভাবি; জন্ম-জন্মান্তরে কি হবে না হবে, সবই ভৃগু-সংহিতায় লেখা রয়েছে। কত কোটি কোটি লোক আছে পৃথিবীতে, তাদের সকলের নাম-ধাম পর্যন্ত আছে ভৃগু-সংহিতায়! বিশ্বাস হয় না।

বিধবার বিয়ে হওয়া কি পাপ? সাহেবদের মধ্যে তো হয়। পছন্দমত তারা বিয়ে করে, আবার বিয়ে বাতিলও করে। বিয়ে আবার বাতিল হয়? ছিঃ ছিঃ—ভাবতেও ঘৃণা করে! আমাদের শাস্ত্রে আছে—বিবাহের বন্ধন জন্মজন্মান্তরের বন্ধন; এ বন্ধন ছিন্ন হতে পারে না। খ্রীষ্টান কিংবা মুসলমানের বেলা কি এ কথা খাটে না? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছবি মানস-চক্ষে ভাসতে থাকে; তিনিই বিধবার বিয়ের বিধান বের করেছিলেন। তবু তা চলল না। সতীত্বের বড়াই করে এরা। জানে না, শোনে না, ভালবাসে না,—এমন এক অপরিচিতের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হ'ল। সে হয়তো মাতাল, বদমাইস, অত্যাচারী; তাকেও মানতে হবে দেবতা বলে। এরই নাম সতীত্ব!

চন্দ্রনাথ আমাকে কাছে পেয়ে বলেন,—তুই বড় ভাবিস ভৃগু! এত লেখাপড়া শিখলি; মনে উৎসাহ নেই। এই নিয়ে দেশের কাজ করবি?

তাঁর কথার জবাব দিই,—কাজ করবার কি আর উপায় আছে মামা। আপনার সমাজ যে আমায় চেপে ধরবে।

তিনি হেসে বললেন,—সমাজ তোদের কি করবে বাবা। তোদের সংখ্যা যে দিন দিন বেড়ে যাবে।

নিরুৎসাহের সুরে বলি—আমাদেরও সমাজে থাকতে হবে; সমাজকে মানতে হবে মামা।

চন্দ্রনাথ হেসে উত্তর দেন,—হতাশ হয়ে পড়েছিস দেখছি; এ হ'লে চলবে না। এক বিবেকানন্দই দেশে কেমন তোলপাড় লাগিয়েছে। দেশ-বিদেশে কালীনামের জয় পতাকা উড়িয়েছে। হাজার হাজার বিবেকানন্দ তোদের মধ্যে তৈরী হবে। তোরা যে লড়াই করবি; সব ভেঙ্গে-চুরে দিবি!

চন্দ্রনাথের কথা মনে উৎসাহ আনে। সত্যিই, আমাদের সংখ্যাই দিন

দিন বেড়ে চলেছে। পুরনো সমাজ ভেঙ্গে-চুরে যাবে। স্বামী বিবেকানন্দের পাগড়ি-বাঁধা বীর-মূর্তি উদ্দীপনা জাগায়।

বিনোদবাবু ও তাঁর পরিবারের সকলেই যেন কৃতকৃতার্থ হয়েছেন আমরা তাঁর বাসায় আশ্রয় লওয়ার জন্য! আমাদের যাতে কোন অসুবিধা না হয়, সেদিকে তাঁদের প্রখর দৃষ্টি। আমার পরিচয় পেয়ে আমার প্রতি অতিরিক্ত যত্ন নিলেন। একখানা ঘরে দিব্যি সুন্দর বিছানায় আমি একাই শুলাম। মেয়েরা অন্য এক ঘরে; আর অন্যান্য পুরুষদের একখানা ঘরে ঢালা বিছানা হ'ল। চন্দ্রনাথ বিনোদবাবুকে নিয়ে অন্য এক ঘরে কারণ-বারিতে কালী-তর্পণ করতে লাগলেন। মাঝে মাঝে—"মা আনন্দময়ী, তারা!" কানে ধ্বনিত হতে লাগল।

রাত্রে ঘুমের ঘোরে চমকে উঠলাম। কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে? এ কি? প্রথমে মনে হ'ল স্বপ্ন দেখছি। কার কোমল হাতের স্পর্শ আমার ঘুম ভেঙ্গে দিল। কেউ তো এ ঘরে ছিল না! তবে কি হ'ল? দীর্ঘ উষ্ণ নিঃশ্বাস পড়ল আমাব বুকে! বুঝলাম, কেউ আমার কাছেই রয়েছে, একান্ত কাছে। তার চোখের জল পড়ল আমার গায়ে। অজানা আতঙ্কে বলে উঠলাম—"কে? কে?" চুপি চুপি সে বললে,—'আমি, আমি? চুপ কর ভৃগু! চুপ কর!'

—কে তুমি?

—লক্ষ্মীটি, চুপ কর। তোকে একটা কথা বলতে এসেছি।

—কে তুমি? সুবালাদি?

—হ্যাঁ আমি সুবালা।

বিস্মিত হয়ে বললাম,—কি? হয়েছে কি? তুমি এত রাত্রে এখানে এলে কেন? কে কি ভাববে বলত?

সুবালা বললে,—বুঝলি না তুই! তুই বুঝবি না ভৃগু!

তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে সুবালা বললে,—আর যে পারিনে ভাই! পথে বেরিয়ে আমি আর নিজেকে সামলাতে পারছি নে। আমার মনে হয়, পথ আমাকে ডেকেছে!

এত রাত্রে সুবালা কি বলতে এসেছে বুঝতে পারি নে। তার কথা হেঁয়ালির মত ঠেকে। ভয় হ'ল,—এত রাত্রে চুপি চুপি সুবালা আমার ঘরে এসেছে; কেউ যদি জানতে পারে? আমার সমস্ত শরীর শিউরে

উঠল। সুবালা কি পাগল হয়ে গেল? আমার হাত দুটি চেপে ধরেছে সে। তার চোখে অশ্রুর বন্যা! বিহ্বল চিত্তে ভাবতে লাগলাম। তাকে বললাম,—তুমি দেখছি আমায় বিপদে ফেলবে সুবালাদি! একি তুমি কাঁদছ!

সুবালা আমার হাত ছেড়ে দিয়ে বললে,—আমি যে আর পারিনে ভৃগু!

সেই তরুণী বিধবার মাথায় হাত বুলাতে বুলোতে সান্ত্বনার সুরে বললাম,—ভয় কি বোন্! আমরা তো রয়েছি। কেন এমন করছ? শীগ্‌গির চলে যাও তুমি!

সুবালা বললে,—আমার জীবনটা কি বৃথা যাবে ভৃগু? বল, কি করব আমি?

বিধবা সুবালার মর্মবেদনা হঠাৎ যেন আমায় সচেতন করে তোলে। তার কথার কোন উত্তর দিতে পারি নে। শুধু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি। আর তার মাথায় হাত রেখে চুপ করে বসে থাকি।

সুবালা বললে,—কোন উপায় নেই ভৃগু! একটা উপায় আমি খুঁজে বের করেছি। আমি ভেখ নিয়ে বেরিয়ে পড়ব।

—কেন? তুমি ভেখ নেবে কেন? বোষ্টমী হয়ে যাবে তুমি?

—আমার ডাক এসেছে ভৃগু! যে জীবন মানুষের কাজে লাগল না, সেটা সঁপে দেবো তাঁকে,—সেই বৃন্দাবনচন্দ্রকে।

একি বলে সুবালা? ভদ্রঘরের মেয়ে ভেখ নেবে? ইচ্ছা হয় ভেখ নিকগে। মিছামিছি আমাকে জড়ানো কেন? ছিঃ-ছিঃ!

সুবালা বললে,—ভৃগু তোকে একটা কাজ করতে হবে ভাই।

—কি করতে হবে বল?

—আমি আর দেশে ফিরব না! মাকে বলিস্ সুবালা ভেখ নিয়েছে। লক্ষ্মী ভাই আমার! মনে রাখিস্!

তারপর সুবালা চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল! ঘুম আর আসে না। আকাশ পাতাল চিন্তার ঢেউ খেলে মাথায়।

ভুবন-পাহাড়ে ভুবননাথের মূর্তির সম্মুখে অসংখ্য পুণ্যার্থীর ভিড়। কত জাতির কত লোক জড় হয়েছে; পাহাড়ীরাও জড় হয়েছে সেখানে।

মনিপুরী, নাগা, লুসাই, কাছাড়ী কত শ্রেণীর লোক। দুর্গম সে পাহাড়ে ছেলে, বুড়ো, নারী ও শিশুর সমাবেশ দেখে বিস্মিত হতে হয়। দোকান-পাটও বসেছে। পাহাড়ের চূড়ায় জলের কুণ্ডে অজানা কোন এক উৎস থেকে জলধারা নেমে এসেছে ভুবননাথকে অবগাহন করিয়ে দিতে!

শিবচতুর্দশীর রাত্রে কোলাহল ও হৈ-চৈ এর মধ্যে বেশ কাটল। ঘন ঘন "জয় বাবা ভুবননাথ" ধ্বনি আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলল। অর্দ্ধ-উলঙ্গ সন্ন্যাসীর দল,—মাথায় পাকানো জটার বেণী, গায়ে ভস্ম মাখা, ধবধব করছে তাদের গা। মহাভারতের বালখিল্য ঋষির দল যেন কাতারে কাতারে বসে রয়েছেন। গাঁজার ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ওপরের দিকে উঠছে। তাদের সামনে বড় বড় কাঠের গুঁড়িতে ধুনি জ্বলছে।

ঠেলাঠেলি ক'রে কোন রকমে ভুবননাথের মাথায় বেলপাতা দেওয়া গেল। চার প্রহরে পূজো। ওরা সকলে পূজো দেবার জন্যে ব্যস্ত। আমি দূরে একটা শুকনো শালগাছের তলায় বসে তাদের জিনিসগুলো আগলাতে লাগলাম। মুক্তো ঠাকরুণ গজর গজর করতে করতে চন্দ্রনাথের পিছু পিছু ছুটলেন; সুবালাও ভিড়ের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হ'ল। পঞ্চুর পাত্তা নেই, পঞ্চুর মধ্যে এ কদিন বেশ ভাবান্তর লক্ষ্য করেছি। সুবালা সবাইকে এড়িয়ে চলে। মাঝে মাঝে পাগলের মত হাসে কাঁদে সুবালা।

পরদিন সুড়ঙ্গ-পথে নামতে হবে। আমাদের দলের সকলেই একসঙ্গে জড় হয়েছে; কিন্তু সুবালাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। সুবালাকে খুঁজতে গিয়ে পঞ্চুও আর ফিরল না। মুরারী দত্ত আর নবীন মাঝি তন্ন তন্ন ক'রে তাদের খুঁজতে লাগল। কিন্তু কোথায় তারা? মুক্তো ঠাকরুণ বললেন,—বাইরের হাওয়া লেগেছে বাবা! কাঁচা রাঁড়িদের নিয়ে কি আর রাস্তায় বের হতে আছে! ওই পঞ্চু ছোঁড়াই যত নষ্টের গোড়া। তীর্থ-ধর্ম করতে বেরিয়েছেন না ঢেঁকি!

চন্দ্রনাথ গম্ভীর হয়ে উঠলেন। আমি মনে মনে সেই রাত্রির কথা ভাবতে লাগলাম। সুবালা ভেখ্ নিয়ে বোষ্টমী হবে। তা'হলে নিশ্চয়ই পালিয়েছে সুবালা। বোষ্টমদের আখড়াগুলি তো এইরকম ঘর-ছাড়াদেরই আড্ডা। আখড়াগুলি এদের আশ্রয় দেয়; ফোঁটা তিলক-কাটা তরুণী বোষ্টমী সুবালার ছবি মনে মনে কল্পনা করলাম। বেশ করেছে, বেঁচেছে সে! কিন্তু পঞ্চুকে কি বিশ্বাস করা যায়! অসহায় গাঁয়ের মেয়ে সুবালা!

তাকে যদি যেখানে-সেখানে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে আসে? ভুবননাথের কাছে সুবালার জন্য প্রার্থনা করতে লাগলাম; তারা সুখী হোক্!

সুবালাকে পাওয়া গেল না; যাত্রীদের মধ্যে আর কেউই সুড়ঙ্গ-পথে নীচে নামতে রাজী হ'ল না। চন্দ্রনাথ আমাকে নিয়ে অন্ধকার সুড়ঙ্গ-পথে নামলেন। মোমবাতি হাতে নিয়ে আমরা দু'জনে আগু-পিছু চলেছি। অনেকখানি যাবার পর দেখি,—আলো দেখা যাচ্ছে। জ্যোৎস্নার আলোর মত সূর্যের আলো পড়ছে সুড়ঙ্গ-পথের ওপর। সেখানটায় তিন দিকে তিনটি সুড়ঙ্গ-পথ চলে গেছে; তরতর ক'রে জলের ধারাও বইছে। ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখি, পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে। চন্দ্রনাথ বললেন—এটা গুপ্ত ত্রিবেণী বাবা! এই দেখো মা গঙ্গা চলে এসেছেন এখানে। ফুল ভাসছে জলের ওপর, দেখতে পাচ্ছ না? কাশী থেকে এ ফুল ভেসে এসেছে।

আমি বললাম—ঐ সুড়ঙ্গ-পথে চলুন এগিয়ে যাই।

চন্দ্রনাথ বললেন,—কোথা যাবে? কূলি-কিনারা পাবে না।

আমার কৌতূহল ও ঔৎসুক্য কিন্তু থামল না। আমি চন্দ্রনাথকে বললাম,—আপনি এখানে অপেক্ষা করুন; আমি একটুখানি ঘুরে আসি। চন্দ্রনাথ বাধা দিয়ে বললেন,—কেউ এ পথে যায় না বাবা! শেষে বিপদে পড়বি। একটা পথ নাগাদের দেশে চলে গেছে।

চন্দ্রনাথের বাধা না শুনে—"এক্ষুনি আসছি" বলে আমি প্রায় ছুটে পূব দিকের গুহা-মুখে এগিয়ে চললাম। আবার পিছু পিছু চন্দ্রনাথের আহ্বান প্রতিধ্বনিত হয়ে থেমে গেল—"ভৃগু! ওরে খোকা! ফিরে আয়।" কিছু দূর গিয়ে দেখি আবার দু'দিকে দুটো পথ! কৌতূহল দমন করতে না পেরে তারই একটা দিয়ে এগিয়ে চললাম; মাঝে মাঝে পাহাড়ের ফাঁকে সূর্যের আলো পড়ছে পথের ও পর—ঠিক সুড়ঙ্গ-পথ নয়। কিছু দূর এগোবার পর খেয়াল হ'ল এবার ফিরতে হবে! কিন্তু কোন পথে ফিরব? পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে গলি-ঘুঁজির মত কত পথ চলেছে; মনে ভীতির সঞ্চার হ'ল।

সাহসে ভর ক'রে পূব দিকে এগিয়ে চললাম; বন-গোলাপ আর কত রঙের কত ফুলের ঝোপ আশে-পাশে রয়েছে। হঠাৎ মানুষের কণ্ঠ, মানুষের হাসি কানে এল। বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে রইলাম। আমি কি অপ্সর-লোকে এসে পড়েছি! ওপর থেকে ঝির্ ঝির্ ক'রে ঝরণাধারা পড়ছে।

পাথরের ওপর দিয়ে কলকল শব্দে বয়ে যাচ্ছে সে জল স্রোত; তার ওপর সূর্য-রশ্মি পড়েছে। রামধনু দেখছি সে জলধারায়। অগণিত নারী কলহাস্যে সেই জলধারায় অবগাহন করছে; তারা সকলেই নিরাভরণ; পীতাভ সুন্দর তাদের দেহ-বল্লরীর লাবণি ঝরণাধারায় যেন উছলে উঠছে।

নির্বাক বিস্ময়ে কতক্ষণ যে তাকিয়ে রইলাম বলতে পারি নে। তাদের কথাবার্তাও বুঝিনে। কি করব ভেবেও পাইনে। এরা কারা? চন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ল। আমি কি নাগাদের দেশে এসে গেছি? তা'হলে সর্বনাশ হবে; অঙ্গামিরা যে মানুষ কাটে! আমি একটা উঁচু টিলার ওপর এসে দাঁড়িয়েছি; ঝরণাধারা পঞ্চাশ গজের মধ্যে! স্নানরতা সেই নারীদের কারো কারো দৃষ্টি আমার ওপর পড়ল; দুর্বোধ্য ভাষায় তারা চীৎকার ক'রে উঠল! তাদের সেই কলরব আকাশে-বাতাসে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। ভীষণ কোলাহল ক'রে বীভৎস-মূর্তি পাহাড়ী পুরুষের দল আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আর উপায় নেই; আমার চেতনা লোপ পেয়ে গেল।

মূর্ছার ঘোরে আচ্ছন্ন হলেও বীভৎস-মূর্তি সেই দৈত্য দলের দুর্বোধ্য কোলাহল আমার কানে যাচ্ছিল। চীৎকার করবার কিংবা কথা বলবার শক্তিও আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম। ভয়ে আমি অসাড়; অন্তরাত্মা কাঁপছে, হয়ত এক্ষুনি তারা আমাকে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলবে। নিশ্চয় আবার মুণ্ডটা তারা বর্শার ফলকে বিদ্ধ ক'রে উল্লাসে নৃত্য ক'রে উঠবে। এরা যে নর-মুণ্ড-শিকারীর দল।

হঠাৎ দূর থেকে ভেসে এল একটা ভয়াল কণ্ঠস্বর। কে যেন আদেশের সুরে চীৎকার ক'রে কি বলছে। সেই চীৎকার শুনে দৈত্য দলের কোলাহল থেমে গেল। বুঝতে পারলাম, তারা দু'তিনজন আমাকে পাঁজাকোলা ক'রে তোলবার চেষ্টা করছে। একজন আমাকে তার কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে এগিয়ে চলল। উঁচু নীচু পাহাড়ী-পথে তারা আমাকে নিয়ে এগিয়ে চলেছে বুঝতে পারছি। প্রায়-সংজ্ঞাহীন আমার অসাড় দেহ সেই দৈত্যের কাঁধে এলিয়ে দিলাম। তার অর্ধ-উলঙ্গ দেহের দুর্গন্ধে সেই অবস্থায়ও আমার দম আটকে যাবার যাবার হ'ল। নাড়ি-ভুঁড়ি ছিঁড়ে যেন বেরিয়ে আসে; তারপর আর কিছুই মনে নেই।

কতক্ষণ পর জানিনে আমার জ্ঞান হ'ল কি ঘুম ভাঙল বুঝতে পারলাম না;

আমি শুয়ে আছি। বেশ আরাম বোধ করছিলাম ; চোখ খুলে দেখি প্রদীপের আলো। প্রায় অন্ধকার একটা ঘরে বিছানার ওপর আমি শুয়ে আছি। হঠাৎ সব গুলিয়ে গেল ; আমি কোথায় ? না, এটা তো ঘর নয় ! আবছা আলোতে সারি সারি নরমুণ্ডের কঙ্কাল দেখা যাচ্ছে। ধীরে ধীরে সব কথা মনে পড়ল। শিউরে উঠলাম ; আমি যে নর-মুণ্ড-শিকারীদের কবলে ! তবু এ নরম বিছানা কোথা থেকে এল ? তাদের তো দয়া-মায়া নেই। তা'হলে আমি কি স্বপ্ন দেখছি ? সত্যিই আমি কি বেঁচে আছি ? নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জাগল। আমি কি প্রেতাত্মা ? এ কি প্রেতলোক ? শুনেছিলাম প্রেতাত্মাদের স্থূল দেহ থাকে না, সেইজন্য নিজের গা ও মাথায় হাত বুলিয়ে দেখলাম সত্যি তা আছে কিনা ? হ্যাঁ, এই তো আমি বেঁচে রয়েছি ! দারুণ আতঙ্কের অবসাদে এবার আমার চোখ বুজে এল। তারা নিশ্চয় আমাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবার জন্য বাঁচিয়ে রেখেছে।

মাঝে মাঝে চোখ খুলে দেখি ; আবার তখনই চোখ বুজে ফেলি। চোখ খুললেই ভয় বেড়ে যায়। সেখানে কেউ আছে কিনা জানবার আগ্রহ প্রবল হয়ে উঠল ; কিন্তু সে আগ্রহ মৃত্যুর বিভীষিকাই সৃষ্টি করছে। মৃত্যুদূত হয়ত আমাকে পাহারা দিচ্ছে। চুপি চুপি মাথা তুলে এপাশ-ওপাশ তাকাই কাউকে দেখতে পাইনে। মনে হ'ল পালিয়ে যাই। কিন্তু বিছানা থেকে ওঠবার শক্তিও যেন আমি হারিয়ে ফেলেছি ; নিশ্চয়ই তারা দোর আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে ; পালাবারও উপায় নেই।

হঠাৎ একটি ছায়া-মূর্তি চোখে পড়ল। একি মৃত্যুদূত সত্যিই এগিয়ে আসছে ! আবার চোখ বুজলাম ; বুকের রক্ত হিম হয়ে এল। ছোটবেলায় দুই বন্ধু ও ভল্লুকের গল্প পড়েছিলাম ; মরা জীব-জন্তুকে নাকি ভল্লুক স্পর্শ ক'রে না ! তাই মড়ার মতই পড়ে রইলাম ; মড়াকে নিশ্চয়ই তারা রেহাই দেবে !

পদশব্দে বুঝলাম সেই মূর্তি আমার কাছে এগিয়ে এল। এ কি ! আমায় যে পরীক্ষা করছে ! আমার কপালে সে হাত রাখলে। কিন্তু এ যে বড় কোমল স্পর্শ ! সে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। আমার চোখে-মুখে আলোর ছটাও পড়ছে বুঝতে পারলাম।

"বাবা, ভয় নেই তোর !"—বলে সেই মূর্তি আমার চুলের মধ্যে সস্নেহে

আঙ্গুল চালাতে লাগল। তার স্পর্শে অভয়ের সাড়া রয়েছে। আবার সে ডাকলে—"বাবা! কথা বল, তোর ভয় নেই।"

তার আচরণ আমাকে কতকটা সাহস দিলেও চুপ ক'রেই রইলাম। সে আমার চোখ-মুখ ও নিঃশ্বাস পরীক্ষা করতে লাগল। এবার কতকটা সাহস সঞ্চয় ক'রে একটুখানি চোখ ফাঁক ক'রে দেখলাম, তার এক হাতে প্রদীপ রয়েছে। এ যে নারী মূর্তি! কপালে অর্ধ চন্দ্রের মধ্যে সিন্দুরবিন্দু জল জল করছে; রুক্ষ বেশ-ভুষার মধ্যেও ফুটে উঠছে নারী-সুলভ কমনীয়তা। কানে তার বড় বড় কুণ্ডল; মাথায় জটায় মত চুলের ঝুঁটি বাঁধা। নর-মুণ্ড-শিকারীদের দেশে এ ভৈরবী? নাগাদের মাঝে বাঙ্গালী নারী!

"বাবা! তুই জেগে আছিস? এটুকু খেয়ে নে লক্ষীটি।"—কি স্নিগ্ধ, কি স্নেহ-মধুর সে স্বর! সে স্বরে মা ও পিসীমার কণ্ঠের অনুভূতি জাগে; ক্ষেত্রদিদির মুখের ছায়া দেখি সে ভৈরবীর মুখে। হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরিযে এল,—মা গো, আমায় বাঁচাও!

সেই ভৈরবী হাসি-মুখে বললে,—নে খেয়ে নে, কোন ভয় নেই।

ঝিনুকে ক'রে আমার মুখে অমৃত-মধুর কি যেন পানীয় বারবার ঢেলে দিতে লাগলেন। আমি ঢক্ ঢক্ ক'রে তা গিলতে লাগলাম। কি সুন্দর সে পানীয়!

ভৈরবী বললেন,—খুব ক্ষিদে পেয়েছে, না? দুধের সঙ্গে ফুলের মধু মিশিয়ে দিয়েছি; সঞ্জীবনী লতার রসও আছে এতে।

আমার চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। তাঁর কথায় সাহস পেয়ে আশ্বস্ত হলাম। তাঁর পায়ে হাত দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম!—আমি কোথায়? ওরা যে আমায় কেটে ফেলবে।

ভৈরবী আমার মাথাটা তাঁর কোলে তুলে নিয়ে বললেন,—না বাবা! তোর কোন ক্ষতি ওরা করবে না। মহাকাল শিব আর মহাকালীর ভক্ত এরা! পথ ভুলে নাগার দেশে এসে পড়েছিস। কোন ভয় নেই; মায়ের ছেলে মায়ের কোলেই ফিরে যাবি।

বিস্ময়-বিমূঢ় সন্দেহাকুল চিত্তে তাকে জিজ্ঞেস করি,—তুমি—তুমি এখানে কেমন ক'রে এলে মা?

ভৈরবী সস্নেহে আমার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলতে লাগলেন,—আমার কথা শুনে কি হবে রে বাবা! আমি সন্ন্যাসিনী, আমি ভৈরবী; আমার কোন পরিচয় নেই।

ম্লান-মধুর হাসি ফোটে ভৈরবীর মুখে। তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করি,— তবু,—তবু বাঙ্গালী তুমি। তুমি নর-মুণ্ড-শিকারীদের দেশে কি ক'রে আছ?

ভৈরবী হেসে উঠলেন,—আমি যে তাদের ভৈরবী মা! তোরই মত পথ হারিয়ে এক বিধবা নাগা রাজ্যে এসে নাগাবাবারই আশ্রয়ে আজ ভৈরবী হয়ে উঠেছে।

কৌতূহল বেড়ে যায়; এদিকে সম্ভবত সঞ্জীবনী পানীয়ের প্রভাবে দেহেও আমার প্রচুর বল ও উৎসাহ জেগে উঠেছে। তাঁকে বললাম,—আমারই মত পথ হারিয়ে এখানে এসে পড়েছ; ফিরে যেতে পারনি নিজের দেশে?

তিনি বললেন,—না বাবা! ফিরে যাবার ইচ্ছেও আমার ছিল না। মানুষ রাধারমণ প্রলোভনের আলেয়া দেখিয়েছিল। আলেয়ার পিছু পিছু ছুটে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলাম। আলেয়া মিলিয়ে গেল! আলেয়ার মোহ কেটে গেছে। রাধারমণকে আব দোষও দিইনে।

—কি বললে? রাধারমণ? রাধারমণ তোমায ঘর ছাড়িয়ে বের করে এনেছিল?

—ওসব কথায় কাজ কি বাবা? বেরিয়ে এসেছিলাম বলেই আমায আলোর সন্ধান দিয়েছে নাগাবাবা। আমি যে বিশ্বজোড়া আসল রাধারমণকে পেয়েছি! আর কি ঘরে ফিরতে পারি?

ভৈরবীর কোলে মাথা রেখে পরম নির্ভয়ে তাঁব মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। নিশ্চয়ই ভৈরবী নির্ভরশীলতার কোন কিছু খুঁজে পেয়েছে নাগারাজ্যে! তাঁর মুখে রয়েছে কি যেন এক দিব্যজ্যোতি। আশেপাশের কঙ্কাল মুণ্ডগুলোর দিকে, তাকিয়ে অবশ্য মাঝে মাঝে শিউরে উঠেছিলাম। ভাবলাম, সাধনায় নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ কবেছে এই ভৈরবী। সিদ্ধিলাভ করলে যে ভূত-ভবিষ্যৎ সমস্তই চোখের সামনে ভাসে। ভৈরবী কি তাঁর সে বিদ্যা আমাকে দান করবে? যখন নাগারাজ্যে পথ হারিয়ে এসে পড়েছি, তখন এই সুযোগ নিতেই হবে। ভৈরবী আমায চুপ ক'রে থাকতে দেখে বললেন,— কি রে? কি ভাবছিস?

দ্বিধা-জড়িত কণ্ঠে জবাব দেই,—আমাকে তুমি সেই জ্যোতির সন্ধান দাও মা।

তিনি সহাস্যে বললেন,—জ্যোতির সন্ধান দেব? বিশ্ব জুড়ে সে জ্যোতি রয়েছে, দেখতে পাসনে? তোর তো এ পথ নয় রে বাবা!

ভৈরবীর মধ্যে এমন কিছু আমি দেখেছিলাম, যাতে ক'রে আমি যে এখন

এক বিপদসঙ্কুল স্থানে রয়েছি তা ভুলে গিয়েছিলাম। ঠিক যেন নিজের ঘরে বসে নিজেরই মায়ের সঙ্গে কথা বলছি। আবদারের সুরে বললাম,—কি বলছ মা? আমার এ পথ নয়?

তিনি বললেন,—না, তোর এ পথ নয়। সংসার করবি। মানুষের মত মানুষ হবি। তোর যে অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।

তাঁকে বললাম,—তা'হলে তুমি কি কোন কাজ করছ না মা?

হো হো ক'রে ভৈরবী হেসে উঠলেন,—আমি যে সব হারিয়ে এসেছি রে। তুই তো শুধু পথ হারিয়ে এখানে এসেছিস।—ভৈরবীর কণ্ঠে বিষাদের সুর ফুটে ওঠে।

ভৈরবীর আগের কথাগুলি মনে পড়ে। ঘর-ছাড়া বিধবা রাধারমণের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল আলেয়ার পিছু পিছু,—কথাগুলি মনের ওপর ছায়া-পাত করে। বুঝতে পারলাম, কোন মর্মান্তিক কাহিনী এই কথাগুলির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।

তিনি বললেন,—তুই ফিরে যাবি। তোর যাবার ব্যবস্থা কালই ক'রে দেবো। অনেক দূরে তোকে যেতে হবে বাবা! পাহাড়ে জঙ্গলে থাকবার জন্যে তোর জন্ম নয়!

বিস্মিত হই ভৈরবীর কথায়। বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়—নিশ্চয়ই ভৈরবী অন্তর্যামী। এঁরা সাধনার বলে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান জানতে পারেন। হ্যাঁ পারে। তাঁকে বললাম,—আমি কি এগিযে যেতে পারব মা? আমি যা চাই, তা কি করতে পারব?

দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দেন ভৈরবী,—নিশ্চয়ই পারবি বাবা! কাজ ক'রে যা ফল নিশ্চয়ই পাবি। নিজের ভবিষ্যৎ নিজে গড়ে তোল, ভবিষ্যৎ জানতে চাস নি।

—কেন? কেন মা? জানলে তো সুবিধেই হবে।

—না, না, না। একদিন তা বুঝতে পারবি, আজ নয়।

পরম নির্ভয়ে ভৈরবীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি আবার বললেন,—ভুল পথে চলেছিস তুই। তুই ফিরে যা। গিয়ে দেখবি তোর ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

—ঠিক বলছ তুমি?

—হ্যাঁ বাবা। আমি আশীর্বাদ করছি তুই সফল হবি। ভৈরবী আমার

মাথায় হাত রাখলেন। এমন সময় খটাখট্ খড়মের আওয়াজ শুনতে পেলাম। চমকে উঠে গুড়ি-সুড়ি মেরে আবার তাঁর কোলে মুখ লুকোলাম। তিনি বললেন,—ভয় পেলি ? তোকে দেখতে নাগাবাবা আসছেন।

চোখ খুলে বিস্মিত হলাম। এই নাগাবাবা! জটাজুটধারী কালভৈরবের মূর্তি আমার সামনে। পীতাভ রক্তিম তার দেহের আভা প্রদীপের আলোকে আরও রক্তিম হয়ে উঠল। ঘরটা হঠাৎ আলোয় আলোময় হয়ে গেল। জ্বলন্ত মশাল হাতে সেই দৈত্যদের কয়েকজন পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নাগাবাবার একহাতে ত্রিশূল, অপর হাতে কমণ্ডলু। নাগাবাবা আমার শয্যার পাশে এসে দাঁড়ালেন, মুখে তাঁর প্রশান্ত ভাব ফুটে উঠেছে। কমণ্ডলু থেকে জল হাতে নিয়ে তিনি কয়েকবার আমার মাথায় ছিটিয়ে দিয়ে বললেন, —বেটি! এই তো সেরে উঠেছে তোর ছেলে।

—হ্যাঁ বাবা! এতক্ষণ পর সঞ্জীবনী রসও দিতে পেরেছি। কথাও বলছে খুব।

—বেশ! কালই এরা ওকে শহরে পৌঁছে দেবে।

—কালই ?

—হ্যাঁ, আর মায়া বাড়াসনি মা! তোর ষোল বছরের সাধনাই মিথ্যে হয়ে গেল। ছেলে দেখে কেঁদে আকুল হলি ?

আশ্চর্য হই নাগাবাবার কথা শুনে। ভৈরবী আমার জন্য কেঁদেছেন! ভৈরবীর ছেলে আমি ? এই মমতাময়ী নারীই আমাকে বাঁচিয়েছেন! না হলে ওই দৈত্যেরা নিশ্চয়ই আমাকে মেরে ফেলত। জটাজুটধারী নাগাবাবা নিশ্চয়ই কাপালিক! কাপালিকেরা যে নরবলি দেয়!—আবার আমার সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে।

নাগাবাবা এবার আমাকে বললেন,— কি ভাবছিস বেটা! এমন মা পাবিনি আর! এ বেটি আমারও মা।

নাগাবাবার মুখে প্রশান্ত হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন,—ভয় নেই বাবা! তোর এ মাকে ছেড়ে যেতে হবে! কষ্ট হবে তোর। কিন্তু তোর এ মায়েরই কষ্ট হবে বেশী। আমার মত ছেলেকে ওর ভাল লাগে না। একদিনেই তুই এসে আমাদের পর ক'রে দিলি।

ভৈরবী হেসে উত্তর দিলেন,—পথহারা ছেলেকে পথ দেখিয়ে দিতে হবে তো বাবা!

নাগাবাবা সহাস্যে বললেন,—বেশ তো। রাত অনেক হয়েছে। আমি আসি।

মশালগুলি এগিয়ে চলল। খড়মের শব্দ কানে ভেসে আসছে। নাগাবাবা বেরিয়ে গেছেন। ভৈরবীকে বললাম,—এই নাগাবাবা কে মা?

তিনি বললেন,—তাঁকে নাগাবাবা বলেই জানি। ষোল বছর আগে এই মূর্তিতেই তাঁকে দেখেছি। তাঁর পরিচয় তাঁকে জিজ্ঞেস করবার অবসর পাইনি। শুধু জানি তিনি আমাদের নাগাবাবা।

—ইনি কি বাঙ্গালী?

—তাও বুঝতে পারিনি বাবা! বাংলা বলতে পারেন, আবার নাগাদের কথাও বলেন। বাবার চেলা সিটাংও নাগা সাধু। সে বলে নাগাবাবা তিব্বতে ছিলেন। বছর পঁচিশ আগে নাগা রাজ্যে এসে আশ্রম করেছেন।

—এরা কি ধর্মের কথা বোঝে? ওই সব জংলী-জানোয়ারদের মধ্যে আশ্রম করেছেন, এতে কি উপকার হবে?

—এদের মধ্যে কাজ আছে বাবা। এই পাহাড়ীরা তোদের মত এটা চাই ওটা চাই করে না। বনের মানুষ এরা। এদের পোষ মানিয়ে গড়ে তোলার কাজে নাগাবাবা এখানে রয়েছেন।

—ওঃ! কই? ওরা তো বেশ সভ্য হয়ে ওঠেনি?

—হাজার হাজার বছরের পর্দা পড়ে গেছে তাদের দেহ মনে। তা কাটিযে উঠতে সময় লাগবে। মনে রাখিস এরাও মানুষ।

হাসি পায় ভৈরবীর কথা শুনে। এরাও মানুষ! এদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে নাগাবাবা? দুর্দান্ত পাহাড়ী জাত, হিংস্র জীবন এদের! হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আমার সহপাঠী সিটাং তিজোর কথা। সে তো এদেরই জাত! না, না, এরাও মানুষ! স্বীকার করতে হ'ল হাজার হাজার বছরের পর্দা সরে যাবে তাদের দেহ মন থেকে।

ভৈরবী বললেন,—এখন ঘুমিয়ে থাক বাবা! আমি ঘরেই আছি। তোর ভয় নেই।

তিনি সেই ঘরের এক পাশে সরে গেলেন। খাটিয়ার মত একটা চৌকীর ওপর বসে তিনি যেন ধ্যানমগ্না হলেন। কিছুক্ষণ পর আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন সকালবেলা বুনো পাখীর ডাকে ঘুম ভাঙ্গল। ভৈরবী মা হাসি মুখে সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমাকে বললেন,—বাইরে চল।

ভৈরবীর সঙ্গে ঘরের বাইরে এসে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখলাম। দিগন্তের

কোল পাহাড়ের সিঁড়ি বেয়ে সূর্য উঠছে। শ্যামল চত্বর,—মাঝে মাঝে উলঙ্গ মূর্তি এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়ের চূড়া মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। ভৈরবীর আশ্রমের সামনে দাঁড়িয়ে পাহাড়ী প্রকৃতির মধুর মূর্তি প্রত্যক্ষ করলাম। নাগা বালক-বালিকা ছুটাছুটি করছে। নাগা বধূরা ভৈরবী-মাকে প্রণাম ক'রে যাচ্ছে। ভৈরবী-মা আমাকে বললেন,—তাড়াতাড়ি সব সেরে নে বাবা! তোকে রেখে আসতে এরা যাবে।

ভৈরবী একটি নাগা মেয়েকে ডাকলেন,—কান্তি! এঁকে নিয়ে যাও। তারপর আমার দুর্বোধ্য ভাষায় কি বললেন, বুঝতে পারলাম না। আমাকে বললেন,—ঝরণার জলে চান্ টান্ ক'রে নে। কান্তি তোকে সব দেখিয়ে শুনিয়ে দেবে। ভয় নেই, কান্তি বাংলা বোঝে।

কান্তিকে অনুসরণ ক'রে ঝরণার ধারে গেলাম। এখানে সেখানে নাম-না-জানা কত ফুল ফুটে রয়েছে। কালো পাথর দৈত্যের মত পাহাড়ের গায়ে উঁকি-ঝুঁকি মারছে। ঝির-ঝির ক'রে পড়ছে ঝরণাধারা। কান্তি দূরে দাঁড়িয়ে রইল।

ভৈরবীর আশ্রমে ফিরে এলাম। তিনি আমার খাবার আয়োজন করেছেন। ভাতের সুবাস মাতোয়ারা ক'রে তুলল। দু'তিন রকমের ব্যঞ্জন। বুনো হাঁসের মাংসও রয়েছে। তৃপ্তির সঙ্গে আহার-পর্ব সমাধা হ'ল। ভৈরবী মা নিজের মায়ের মতই অনুযোগ-উপরোধে স্নেহধারা ঢালতে লাগলেন। তারপর বিশ্রাম। ভৈরবী বললেন,—কিছুক্ষণ গড়িয়ে নে বাবা! আবার পাহাড়ী-পথে যেতে হবে। থাবায় ক'রে তোকে নাবিয়ে দিয়ে আসবে।

. .

আবার পাহাড়ারা জড় হ'ল। দাঁড়িয়ে আছেন নাগাবাবা আর ভৈরবী-মা। এবার বিদায়ের পালা! নাগাবাবা কমণ্ডলুর জল আমার মাথায় ছিটিয়ে দিলেন। ভৈরবী আমার শিরঃ আঘ্রাণ করলেন। তারপর আমার মাথাটি বুকে চেপে ধরে বললেন,—ভৈরবী-মাকে মনে রাখিস বাবা! তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু গড়াতে লাগল।

জোয়ান মরদ পাহাড়ীর পিঠে থাবায় বসে পাহাড়ের কোল বেয়ে নেমে যাচ্ছি, দূরে দাঁড়িয়ে ভৈরবী-মা!—বহুদিন হয়ে গেছে। এখনও সেই মূর্তি আমার স্মৃতিপটে আঁকা রয়েছে। ভৈরবী-মা হাত তুলে ইঙ্গিত করছেন। তাঁর অভয়-বাণী এখনও কাণে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ভুবনমাথের সম্মুখে এসে

দেখি, চন্দ্রনাথ বসে রয়েছেন একাকী। আমাকে দেখতে পেয়ে বললেন,—তোর জন্যে বসে আছি খোকা! আমি জানি তুই আসবি। ভুবননাথ বলে দিয়েছেন, নাগাবাবা তোকে ফিরিয়ে দেবেন। তাই কাল থেকে এখানে বসে রয়েছি। সবাই চলে গেছে।

পাহাড়ীরা আমাদের সেই চা-বাগান পর্যন্ত এগিয়ে দিল। পথে চন্দ্রনাথ কত কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমার সেই এক রাত্রির ইতিহাস আর যেন ফুরোয় না। সব কথা শুনে চন্দ্রনাথ বললেন,—নাগাবাবা সিদ্ধ-পুরুষ। তোর বরাত ভাল রে! তোর আর কোন বিপদ হবে না। ভৈরবী তোর দেহ বেঁধে দিয়েছে।

—বেঁধে দিয়েছে।

—হ্যাঁ রে! মন্ত্রের জোরে বেঁধে দিয়েছে। এমন মা পেয়েও হারালি?

চন্দ্রনাথের কথায় আপসোস হতে লাগল। ওদের ধরে থাকলে হয়ত উপকারই হত। আর তো ফিরে যাবার উপায় নেই। দূরের মায়া টানতে লাগল। আমায় যে এবার ঘর ছেড়ে অনেক দূরে যেতে হবে। ভৈরবী-মা বলেছেন,—"গিয়ে দেখবি সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে।" কিন্তু সেই ঘর ছেড়ে আসা বিধবা আর রাধারমণের ইতিহাস তো জানা হ'ল না!

বাড়ি ফিরে এলাম। কলকাতা থেকে বন্ধু হরপ্রসন্ন টেলিগ্রাম করেছে,—চলে এসো, তুমি পাশ করেছো। তার একখানি চিঠিও আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। তাতে আছে পথের নির্দেশ। সে আর বন্ধু বীরেন আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। পাড়া-প্রতিবেশী সকলেই আনন্দ করছেন। সকলেই উৎসাহ দিচ্ছে। ছোটবাবু বললেন,—আর কি হবে বাবাজী! এখানেই একটা মাষ্টারী জুটিয়ে নাও।

খবরটা দিতে কাঞ্চনগড়ে গেলাম। অবনীদা আর নমিতাবৌদির সে কি উল্লাস! বৌদি খোকনকে বলছেন,—অম্বুকা'র মত হবি! কলকাতা যাচ্ছে অম্বুজকা। তোকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেবো।

অবনীদা বললেন,—মজার কথা বলেছিলাম না অম্বুজ! তোদের ছোটবাবু আর হাতিম মিয়া পাঁচশো টাকা দিয়েছিল।

—কেন অবনীদা?

—বুঝলি নি? ওরা মনে করেছিল, সেই খুনের মামলায় তোকে জড়িয়ে ফেলব আমি। তাই দিয়েছে।

অবনীদা হাসতে লাগলেন।—তারপর ওদের জব্দ করবার জন্ত আর তোর কথা ভেবে টাকাটা নিলাম। তোর কাজে লাগবে বলেই রেখে দিয়েছি। পরের উপকারের জন্তই ভবানীঠাকুর ডাকাতি করত। দেবীচৌধুরাণীর সেই ডাকাতদের কথা মনে নেই?

অবনীদার কথা বলার ভঙ্গী দেখে আমিও হেসে ফেললাম। বৌদি বললেন,—সেটা কার বুদ্ধিতে হয়েছে বল?

অবনীদা বললেন,—হ্যাঁ, তোর বৌদিই বুদ্ধিটা দিলে।

অবনীদা আর নমিতাবৌদির কাণ্ড দেখে বিস্মিত হলাম। তাঁরা আমার জন্তে এত করেছেন। পিসীমার কথা মনে পড়ল,—অবনীদারোগা ঘুষ নিয়েছে। পিসামার কথা শুনে অবনীদার ওপর রাগও হয়েছিল। ঘৃণা এসেছিল তার পুলিস জীবনের শঠতা অনুমান ক'রে। আজ বুঝতে পারলাম, অবনীদা সত্যই ভবানীডাকাত। বঙ্কিমচন্দ্রের দেবীচৌধুরাণীর ছবি মানস-পটে ভেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ভাটি, মোহন আর লবাই সর্দার এসে মনটা দমিয়ে দিলে।

দিব্যনাথ এসে বললেন,—বাবা! আমার স্বপ্ন সফল হয়েছে। আরও হবে অম্বুজ! আমি যে তোর ভবিষ্যৎ ছবি দেখতে পাচ্ছি।

নমিতাবৌদি বললেন,—আর যাই করো ঠাকুরপো। পুলিসে চাকুরী নিয়ো না।

কেন বৌদি? অবনীদা তো বেশ চাকুরী করছেন!—বৌদিকে প্রশ্ন করি।

তিনি উত্তর দেন,—চোর ডাকাত ঠেঙ্গানো, রাতদুপুরেও হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি, এ আবার মানুষে করে!

অবনীদা সহাস্তে বললেন,—হ্যাঁ, মানুষেই করে। দেখছ না—এ তল্লাটের আমি হর্তা-কর্তা-বিধাতা।

বৌদি বললেন,—বেশ! তুমি বিধাতা হয়েই এখানো বসে থাকো। অম্বুজ ঠাকুরপো! তুমি ভাই কলেজের প্রফেসার হবে।

দিব্যনাথ বললেন,—ঠিক বলেছো বউমা! অম্বুজ কলেজের অধ্যাপকই হবে।

অবনীদা বললেন,—তা মন্দ নয় অম্বুজ! তোর বৌদি ফন্দি করেছে তুই প্রফেসর হবি, আর অমনি খোকনকে তোর কাছে পাঠিয়ে দেবে। ভারি স্বার্থপর!

আমি বললাম,—নিশ্চয়ই খোকন আমার কাছে থাকবে। কিরে খোকন?

খোকন ততক্ষণে আমার কোল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে। এরই মধ্যে আট-দশবার আমাকে জিজ্ঞেস করেছে—হ্যাঁ কাকা সত্যি তুমি চলে যাবে?

অবনীদা বললেন,—কথাটা বলতে ভুলে গেছি অম্বুজ! লবাই সর্দার মরে গেছে। মামলাটা আর চলবে না।

আঁতকে উঠলাম—লবাই সর্দার মরে গেছে? তা'হলে সত্যিই রক্ষা পেয়েছে বুড়ো সর্দার। দুঃসহ স্মৃতির বোঝা নিয়ে কি বেঁচে থাকা যায়?

অবনীদাকে বললাম,—তার কি হয়েছিল অবনীদা?

তিনি বললেন,—কি আর হবে? বুড়োটা শোকে পাগল হয়ে গিয়েছিল। জেলের গরাদে মাথা ঠুকে ঠুকে মরে গেছে সে।

অবনীদার বাসাঘরের বারান্দায় বসে আছি আমরা। সেখান থেকে পাহাড়ের চুড়া দেখা যাচ্ছিল। ভাটি নেই। পাহাড়ী মায়া কেটে গেছে। কিন্তু মায়ার আলেয়া ভেসে বেড়াচ্ছে ঐ পাহাড়ে!

সেদিন সন্ধ্যায় কাঞ্চনগড় থেকে বাড়ি ফিরলাম। পরদিন যাত্রা করতে হবে। পাড়ার সকলেই এসে খোঁজ-খবর নিতে লাগলেন। জগাই, শম্ভু আর প্রবীর রাত এগারোটা পর্যন্ত আমার সঙ্গে গল্প ক'রে গেল। দাদার পাঁচ বছরের মেয়ে খুকী অনেক রাত অবধি জেগে রইল। সে আমার সঙ্গে যাবে, আমার সঙ্গে খাবে, আমার কাছে ঘুমোবে। সত্যি সে সেদিন আমার বিছানায় আগে ভাগে শুয়ে পড়ল। আমিও তাকে খুশী করবার জন্য তার পাশে শুয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিলাম।

পরের দিন সকাল থেকে হৈ-চৈ। পাড়া-প্রতিবেশী সকলেই এসেছে। হাতিম মিয়া, নয়ান মাঝি, শচীন সাহা, রেজাক চৌধুরীও এসেছেন। গায়ের সকলেই হাজির। তাদের দেখে মনে মনে বেশ গর্ব অনুভব করলাম। কিন্তু মনটা কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল। নদীর ঘাট পর্যন্ত ছেলেমেয়েরাও আমাকে এগিয়ে দিতে এসেছে।

আমাকে নিয়ে নৌকা ভাঁটির দিকে চলেছে। জংশনের স্টেশনে মেলট্রেন ধরতে হবে। ও কি? এরা যে নদীর ধার দিয়ে এগিয়ে চলেছে। জগাই আর শম্ভু চোখ মুচছে! কে চীৎকার করে কেঁদে উঠল। এ কি? মাটিতে পড়ে গেল কে? মনটা বিচলিত হয়ে উঠল। মায়ার বাঁধন কি সহজে ছেঁড়া

যায়? আমারও চোখে জল! নৌকোর মাঝি বললে,—এখন কাঁদছ দাদাঠাকুর! সেখানে গেলে নতুন মানুষ পেয়ে সব ভুলে যাবে।

আলোর নগরী কলকাতায় সত্যিই এসে পৌঁছলাম। হর্ম্যমালা সুশোভিত বিচিত্র এ নগরীর আঁকা-বাঁকা পথগুলি আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিলে। এত লোক, এত পথ, এত বিচিত্র বিপণি, যানবাহন ও কল-কারখানা আমার কল্পনারও অতীত। সাতশ' মাইল দূরের আমার চির-চেনা পাড়াগাঁখানি স্মৃতির পর্দায় উঁকি মেরে যেন লজ্জায় লুকিয়ে গেল! কত রকমের পোষাক, কত জাতির কত লোক চলে এখানে! কত ভাষার বুলি শুনতে পাই। আমারই সগোত্র যারা, তারা বইএর ভাষায় কেমন সুন্দর কথা বলে। কান জুড়িয়ে যায়। তাদেরই অক্ষম অনুকরণ ক'রে কথা বলতে হয়। এটাও বুঝি, তারা আমার বুলি শুনে মাঝে মাঝে হাসি চেপে রাখে।

স্বপ্নে দেখা হর্ম্যগৃহে বিদ্যাভবনে কল্পনালোকের সেই মনীষীদেরও সাক্ষাৎ পেলাম। নতুন জীবনের নবীন উদ্দীপনা আমাকে উদ্দীপিত ক'রে তুলল। অধ্যাপন আর অধ্যাপনার নতুন ধারা, বিরাট পাঠাগার, জ্ঞান-বিজ্ঞানের জীবন্ত প্রতীক এই সব মনীষী আমায় চমক লাগাল। মাঝে মাঝে ভাবি এর শেষ কোথায়? এ যে অফুরন্ত! স্বল্প পরিসর এই জীবনের মধ্যে জীবন-বিকাশের সূত্র কি মানুষ এর মধ্যে খুঁজে পায়? এই সব মনীষী জীবন-জিজ্ঞাসার সমাপ্তি ঘটাতে পারবেন?

—না, না, না। বুঝলাম এঁদেরও জিজ্ঞাসার পরিতৃপ্তি হয়নি।

এদিকে জীবনযাত্রার দিক দিয়েও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারছি না। কলেজের পুরাতন বন্ধু প্রসন্ন আর বীরেন আমার তত্ত্বাবধায়ক হয়ে উঠেছে। বৈঠকখানার এক নিবাসে এসে বাসা বাঁধতে হ'ল। গলির ভেতর দোতলা বাড়ি। সামনে লেখা আছে—'পাইস হোটেল।' তারই দোতলায় পশ্চিম দিকের একটা কালি ঘরে প্রসন্ন থাকত, সিঙ্গ্‌ল সিটেড্‌ রুম। সিট অর্থাৎ তক্তাপোশটা এমনই যে আরামে লম্বালম্বি শুতে গেলে পা দু'খানি থেকে অন্ততঃ ছ'ইঞ্চি বাদ দিতে হয়। বন্ধুবর সেই সিটটাই আমায় ছেড়ে দিলে। সে বললে,—আমি মেঝেয় মাদুর পেতে শুতে পারব। তুই নতুন এলেছিস, তোর কষ্ট হবে। তুই ভাই তক্তাপোশে শুবি।

আমার কোন ওজর আপত্তি প্রসন্ন শুনত না, বরং বলত, যাহোক ক'রে দুটো পয়সা বাঁচালেই হ'ল। আর একটা সিট নিতে গেলে ছ'টাকা ক'রে লাগবে।

বিস্মিত হয়ে উত্তর দিতাম,—এক একটা সিট ছ'টাকা ?

প্রসন্ন বলত,—হ্যাঁ রে, এটা কলকাতা, পয়সার কলকাঠি। এখানে মাটিও পয়সা দিয়ে কিনতে হয়।

সত্যিই প্রথম কয়েকদিন মাটি আমার চোখে পড়েনি। মনে হ'ত,—সমস্ত শহরটাই শানে বাঁধানো। সকাল-বিকাল হুশ-হুশ ক'রে যখন জল ঢেলে রাস্তা ধুয়ে দিত তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখতাম। ধীরে ধীরে বিস্ময়ের ঘোর কাটতে লাগল। বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে এই বিচিত্র নগরীর সম্বন্ধে কতকটা অভিজ্ঞতা হ'ল। এদিকে প্রায়ই আমাদের হোটেলে চুরি হতে লাগল। আজ এর কলম নেই, কাল তার চশমা নেই, কার পকেট থেকে পাঁচ টাকা চুরি গেছে—নিত্য নতুন অভিযোগ। প্রসন্ন বললে,—সাবধান, ঘর থেকে বের হলে তালা দিয়ে যাবি। কোন কিছু বাইরে রাখবি না।

নিবাসের ম্যানেজার মণি চৌধুরী উপদেশ দেন,—নতুন এসেছেন কলকাতায়, সাবধান হয়ে চলাফেরা করবেন। মনে রাখবেন যত সব চোর, বাটপাড়, গাঁটকাটা আপনার আশে-পাশে ঘুরছে, চেনবার উপায় নেই। ঘরে-বাইরে নানা বেশে তারা আনা-গোনা করছে। একটু অন্যমনস্ক হলেই পকেট কাটবে, ছোরা মারবে।

মণি বাবুর কথা শুনে ভয় পাই। তাঁকে প্রশ্ন করি,—এখানে তা'হলে আপনারা এতদিন কি ক'রে আছেন ?

তিনি হেসে উত্তর দেন,—দশ বছর লোক চরিয়ে খাচ্ছি মশাই, কে কেমন লোক এক নজরে চিনতে পারি। সাবধান, টাকা কড়ি সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় বের হবেন না। গেঁয়ো লোকদেরই বেশী ভয়।

চৌধুরী মশাই হিঃ হিঃ ক'রে হাসতে থাকেন।

সত্যিই তো আমি নতুন লোক। সকালে খবরের কাগজ খুললেই চোখে পড়ে খুন জখম আর রাহাজানি নিত্যই ঘটছে। প্রকাশ্য দিবালোকে চৌরঙ্গীর মোড়ে টাকা লুঠ হয়ে যায়। বিস্মিত হয়ে ভাবি,—এত লোক, এত পাহারা, এত পুলিস,—তবু এ রকম হয় ?

এগিয়ে চলেছি জীবনের পথে। বৈঠকখানার বাসাও ভেঙে গিয়েছে। পুরানো বন্ধুরাও নিজেদের যাত্রা-পথে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। নতুন বন্ধুও জুটেছে দু'চারজন। ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েছে পুরাতত্ত্বের ছাত্র শঙ্কর। শঙ্করের বাড়ি যাতায়াত করি। তার পড়বার ঘরখানা যাদুঘরের সামিল হয়ে উঠেছে। শঙ্কর আর কাজরী—ভাই আর বোন। কাজরী শঙ্করের মামাতো বোন। দূর পাড়াগাঁয়ে বাড়ি, মাঝে মাঝে আসে। আমার ফেলে-আসা স্বজনদের কথাই তারা মনে করিয়ে দেয়। তাদের অভাবও পূরণ করে।

নগরীর সঙ্গে পরিচয়ও অধিকতর ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। হর্ম্যশোভনা নগরীর আলোর বুকেও বীভৎস অন্ধকার দেখতে পেয়েছি। তার সে ভয়াল রূপ আমার গেঁয়ো মনকে বিচলিত ক'রে তোলে। এ যে পাষাণ-পুরী! এর বুকটা শানে বাঁধানো। পল্লীর কাদামাটির পথের ওপর পথচারীর পায়ের চিহ্ন দাগ কেটে যায়, কিন্তু এর পাষাণ বুকে যে কোন দাগই পড়ে না। আমার কাদামাটির গাঁয়ের কথা মনে পড়ে। তার ধুলোকাদা যে মানুষকে আঁকড়ে রাখতে চায়। পাষাণপুরীর বুকে ধুলো-কাদা নেই। শানের ওপর রক্ত বয়ে গেলেও ধুয়ে মুছে যায় নিমেষের মধ্যে। এ যে নির্মম পাষাণপুরী। শীত গ্রীষ্ম সকল ঋতুতে একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তার রূপের কোন পরিবর্তন নেই।

বর্ষায় এই পাষাণপুরীর বুকে মাঝে মাঝে বৃষ্টির জল দাঁড়ায়। মনে হয়, পূতি-গন্ধময় ক্লেদ ভেসে উঠেছে। বৃষ্টি আমার ধুলো-কাদার পল্লীমায়ের কোলে যে পীযুষধারা বইয়ে দিত, মাঠে-ঘাটে জলের উচ্ছ্বাস প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মনের যোগ ঘটাত। এখানে তা নেই। মনে পড়ে,—বৃষ্টির ধারায় স্নানরতা সেইপল্লী-জননীর মূর্তি। আম-কাঁঠাল আর কদম্ব বৃক্ষের অপরূপ শোভা। ঝড়ে জলে বাঁশবন দুলে দুলে উঠছে। নৃত্যরতা তন্বী কিশোরীর মত নেচে নেচে কখনো বা তার শির ভূমি স্পর্শ ক'রে ধরণীকে প্রণাম জানাচ্ছে। ঝির-ঝির, টপ্-টপ্ শব্দের তরঙ্গে তান ধরেছে বৃষ্টির ধারা। গাছের ডালে কাক ভিজছে, শালিক-দোয়েল কিচির-মিচির করছে ঝোপে ঝোপে। ডোবার জলে ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙর ব্যাঙ্ ডাকছে। কই, মাগুর ও শিঙ্গি মাছ বৃষ্টির ধারার ডাকে পুকুর থেকে ডাঙায় উঠে পড়ছে। সিঁদুর মেখে পুঁটি মাছ নব বর্ষার তরঙ্গে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। চিল আর মাছরাঙা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়াচ্ছে।

চাষীরা টোকা মাথায় দিয়ে মাঠে লাঙ্গল চালাচ্ছে।—মানস চক্ষে ভেসে ওঠে বর্ষামুখর আমার সেই পল্লী-মাকে। পল্লীর কাদায়ও যে মাটির মায়া মাখানো ছিল। পা ধুতে গেলে মনে হয় এখনও সে কাদা পায়ে লেগে রয়েছে।

পাষাণপুরীর তপ্ত গরম পিচের রাস্তায় পা পুড়ে যায়। পায়ের তলায় ফোস্কা পড়ে। বড় লোকের গাড়ী নোংরা জল ছিটিয়ে দেয় গায়ে। আনমনা পথচারী গাড়ীর তলায় প্রাণ হারায়। হৈ হৈ হয় বটে, কিন্তু কেউ চোখের জল ফেলে না। রাস্তায় মানুষ মরে পড়ে রয়েছে দেখলে উঁকি মেরে চলে যায়, কিন্তু ষাঁড়ের লড়াই দেখতে শত শত লোক জড়ো হয়ে যায়। হর্ম্যশোভিত অভিজাতপূর্ণ বড় রাস্তার ওপর দিনের পর দিন মৃত্যুপথযাত্রী মুমূর্ষুকে পড়ে থাকতে দেখেছি। কেউ ফিরেও তাকায় না। পাশেই হয়ত বড় বড় শুশ্রূষাগার, বড় বড় চিকিৎসালয় রয়েছে, বড় বড় ডাক্তারের গাড়ী চলে যায় তার পাশ দিয়ে। অসাড়-দেহ মুমূর্ষু হয়তো অজানার উদ্দেশ্যে হাত বাড়ায়, আপন জনকে হয়তো খোঁজে। কেউ বা তার সে অসাড় হাতে দয়াপরবশ হয়ে দু'একটা পয়সাও দেয়। কিন্তু কি হবে সেই পয়সায়? কোন ভিখারী এসে সে পয়সাও চুরি ক'রে নিয়ে যায়।

এখানকার ফুটপাতে ঘর-সংসার ক'রে দিনের পর দিন কাটায় ভিখারীর দল। তাদের আবার বংশবৃদ্ধিও হয় এই ফুটপাতে। জীর্ণ শীর্ণ কচি শিশু ফুটপাতে গড়াগড়ি দেয়। এদের সংখ্যাও কম নয়। তাজ্জব এই ফুটপাতের সংসার! ভিক্ষাবৃত্তি যে একটা ব্যবসা হতে পারে তা আগে জানতাম না। এরা মানুষের মত বাঁচতে চায় না। বৃষ্টির জলে ভেজে, ভিক্ষে করে, ধীরে ধীরে শক্তি ক্ষয় হয়। রাস্তায়ই রোগে ভুগে মরে পড়ে থাকে।

পাষাণপুরীর বুকেও যে দগদগে ঘা রয়েছে! হর্ম্যমালার মাঝে মাঝে বেরিয়ে রয়েছে কঙ্কাল,—বস্তি। এটা যে যখের রাজত্ব,—সকলেই কর্ম-ব্যস্ত, কর্ম-ক্লান্ত,—টাকা-আনা-পাইয়ের ব্যাপার। কারো অবকাশ নেই। কারখানার মেশিন চলছে। উৎসব-উল্লাসেরও অন্ত নেই। প্রমোদ-গৃহ, হোটেল, রেস্তোরাঁ।—সর্বত্রই উল্লাস আর কর্ম-ব্যস্ততা! সেই উল্লাসের বুক চিরে ঘন ঘন রব ওঠে—বলহরি হরিবোল! রাবণের চিতা জ্বলে গঙ্গার ঘাটে—মড়ার বিরাম নেই। তবুও অফুরন্ত জনারণ্য! বিস্মিত হই!

এরই মাঝে টাকা-আনা-পাইয়ের সাধনাতেও নামতে হ'ল। অধ্যাপক

সেনের কৃপায় শিক্ষকতা জুটে গেল। মুকুল, অমিয়, উজ্জ্বল আর শ্যামল,—ফুটন্ত কৈশোরের মাধুর্য তাদের দেহে মনে। তাদের গড়ে তুলতে হবে। ভূগোল বিজ্ঞান আর অঙ্কের ধাঁধা মেটাতে মেটাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়। কাব্য কিংবা সাহিত্যের রস পরিস্ফুরণের পক্ষে পরীক্ষার পড়া বাধা সৃষ্টি করে।

ছাত্রদের নিয়ে বিপদেই পড়লাম। না!—এদের ভাগ্যের সূত্র খুঁজতে হবে, জ্যোতির্বিদ শাস্ত্রী বন্ধু পথের সন্ধান দিয়েছেন,—ভূত ভবিষ্যৎ আর বর্তমানের নির্দেশ দেবে জ্যোতিষীবিদ্যা। সেই উদ্দেশ্যে নানা জায়গা ঘুরেও এলাম। ভৃগু-সংহিতার মোহে কাশীর অলি-গলিও ঘুরলাম। ফুট-পাতে, তান্ত্রিকের আশ্রমে ও সাইন-বোর্ড-ওয়ালা মহা জ্যোতিষীদের সাকরেদিও করেছি। বইও পড়েছি অনেক। কিন্তু সবই ব্যর্থ হতে চলেছে।

ছকের পর ছক এঁকে চলেছি, কিন্তু জন্মকুণ্ডলীগুলো ধাঁধার সৃষ্টি করছে। কুলকিনারা দেখতে পাই নে। মানসপটে ভেসে ওঠে সেই ভৃগুশাস্ত্রীর মূর্তি। কি করুণ তাঁর মুখখানি! বিষাদকালিমা তাঁর চোখে-মুখে। কি নোংরা,—গায়ে ময়লার ছোপ পড়ে গেছে। কি বিশ্রী গন্ধ তাঁর গায়ে! কাছে বসা যায় না। ভৃগু শাস্ত্রী? না, না,—পিশাচসিদ্ধ!

ভৃগু শাস্ত্রী বলতেন,—বাবা, পরের ভবিষ্যৎ ঘাঁটতে ঘাঁটতে নিজের ভবিষ্যৎ মাটি করেছি। ঘরের দিকে তাকাইনি। স্ত্রী গেল, পুত্র গেল, আত্মীয়স্বজন সবাই গেল। ঐ যে দুটি ছেলেমেয়ে অবশিষ্ট রয়েছে। এদেরও নিয়ে যাবে পিশাচ। আমি বড় একা বাবা! আমাকে পিশাচে পেয়েছে, কিছুতেই ছাড়বে না। দিন রাত কানে গুন্‌গুন্‌ করছে কর্ণপিশাচ!

বিস্মিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম,—কর্ণপিশাচ? সে আবার কি?

তিনি বলেছিলেন,—লোকের জন্মকুণ্ডলী ঘেঁটে ঘেঁটে এমনি হয়ে গেছে বাবা! কাউকে দেখলেই তার ভবিষ্যৎ আপনা-আপনি কানের ভেতর গুন্‌গুন্‌ করে বেজে ওঠে। কে যেন বলে দেয় সব কথা।

আমি বলি,—ভালই হয়। আপনাকে আর পরিশ্রম করতে হয় না।

আমার কথা শুনে পাগলের মত হেসে উঠেছিলেন ভৃগু শাস্ত্রী। দরদর করে তাঁর চোখে ধারাও বয়েছিল। তিনি বলেছিলেন,—ঠিক বলেছ বাবা! পরিশ্রম করতে হয় না। কিন্তু কর্ণপিশাচ যে আমায় পাগল করে তুলেছে?

কেউ যদি তোমার কানের ভেতর রাতদিন গুন্‌গুন্‌ বকর বকর ক'রে, তা'হলে কি অবস্থা হয়, ভেবে দেখেছ কি ?

চুপ করে থাকি, ভৃগুশাস্ত্রীর কথায় বিশ্বাস হয় না। ভাবি,—টাকা, টাকা ক'রেই ভদ্রলোক এমন এয়ে গেছে। কর্ণপিশাচ নয়, অর্থ পিশাচ ! ছিঃ ছিঃ, বাচ্চা ছেলেমেয়ে দুটির দিকেও তাকায় না। কি নোংরা থাকে ওরা !

আমাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে ভৃগুশাস্ত্রী বলেছিলেন,—ওপথে যেয়ো না বাবা! পরের ভবিষ্যৎ ভাবতে ভাবতে নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার সময় পাবে না। এ-জিনিস মানুষকে আপন ভুলিয়ে দেয়। আর যা হবার তা হবে, আগে ভাগে তা জেনে লাভ কি ?

সেদিন ভৃগুশাস্ত্রীর কথায় তেমন আমল দিই নি। তবুও ভদ্রলোকের অবস্থা দেখে কষ্টই হয়েছিল। আজ মনে হ'ল, ঠিকই বলেছিলেন তিনি। আগে ভাগে ভবিষ্যৎ জেনে কি হবে? আবার ভাবি, সূত্র খুঁজে বের করতে হবে! কিন্তু ভুল হয়ে যায়, মুকুল,শ্যামল আর অমিয়ের জন্মকুণ্ডলী আমায় বিভ্রান্ত করে তুলেছে।

বড় বেশী আঘাত পেয়েছি সুধাংশুর জন্য। তার অদৃষ্টচক্রে কি এই ছিল? আমারই কাছে ছুটে এসেছিল সে। পাঁচপীরের দরগার পাশের সেই ছোট্ট ঘরখানি ভেসে ওঠে চোখের সামনে। ছলছল চোখে দাঁড়িয়ে ছিল সুধাংশু ! সেই রাত্রির কথা আর সেই কিশোর সুধাংশুর আকুতি-ভরা মুখখানি ভুলতে পারি নে। সুধাংশু শেষে বিপ্লবী হ'ল। বাংলার দু'প্রান্তে আগুন লেগেছে। বিপ্লবীর বোমার আওয়াজ যেন কানে ভেসে আসে। কিশোরী মেয়েরা গুলি করেছে বিদেশী-শাসকের বুকে।

ঘন ঘন কানে ভেসে আসছে—বন্দে মাতরম্‌-ধ্বনি! দেশটা পাগল হয়ে উঠেছে। খর্বদেহ কটি-বস্ত্রধারী এক অসীম শক্তিমান্‌ পুরুষ দেশকে খেপিয়ে দিয়েছে।—বন্দে মাতরম্‌,—পুলিসের লাঠি, রক্ত বইয়ে দেয় ময়দানে-মাঠে। অহিংস, নিরস্ত্র, কিশোর, যুবা, বৃদ্ধের দল লাঠি খেয়েও এগিয়ে চলেছে। বিরাম নেই, অন্ত নেই।

আমার মাথায় শুধু রাশিচক্র ঘুরছে। দু'ফোঁটা চোখের জলও গড়িয়ে পড়ে। দৈবশক্তি থাকলে নিমেষের মধ্যে এ কুরুক্ষেত্র থামিয়ে দিতাম। মন্ত্রশক্তি! মন্ত্রশক্তি চাই! কিন্তু কে শিখিয়ে দেবে! গুরু কোথায়?

পরীক্ষার পর পরীক্ষা চলেছে। ঘুঁটি চালিয়েছি। না,—নির্মল আর এগিয়ে যেতে পারলে না। অমিয়ও দু'বার ফেল করলে! একি? শ্যামল অকালে মারা গেল! ছিঃ! ছিঃ! স্বপ্নেও তা ভাবিনি। লগ্নে তুঙ্গী বৃহস্পতি, দশমে মঙ্গল স্বক্ষেত্রে! সেই ছেলে বিশ বছর বয়সে মারা গেল!

জ্যোতির্বিদ শাস্ত্রী কি তা'হলে ভুল শেখালে! অধ্যাপক সেনেরও কি ভুল হ'ল? হোরাসার আর বৃহজ্জাতক কি মিথ্যে হয়ে গেল?—না, না, মিথ্যে নয়! ভবিষ্যৎটা পুরোপুরি জেনে নিতে হবে। দিনের পর দিন কি ঘটবে না ঘটবে নখদর্পণে ভাসছে! অকালে যে মরে যাবে তার পেছনে খেটে লাভ কি? যে চিত্রশিল্পী হবে, তাকে ডাক্তারি পড়তে দেওয়া বিড়ম্বনা!

আমার শক্তি কতটুকু? এই যে লগ্নে রাহু মঙ্গল।—আঠারো বছর রাহুর দশাটা মঙ্গলই মাটি ক'রে দেবে, মাথা তুলতে দেবে না।—জন্ম-কুণ্ডলী সামনে ধরে আকাশ-পাতাল ভাবছি। নাঃ, পঞ্চমস্থ বৃহস্পতি ফল দেবে!

অধ্যাপক সেন এসে সামনে দাঁড়িয়েছেন, খেয়ালই নেই। 'কি করছ অম্বুজ!'—গলার স্বরে চমকে উঠে তাকিয়ে দেখি স্নেহদৃষ্টি ফেলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন অধ্যাপক সেন। সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধ অধ্যাপকের আকস্মিক আগমন আমাকে বিস্মিত করে। তাঁকে প্রণাম ক'রে চেয়ার এগিয়ে দিই।

অধ্যাপক সেন বললেন,—একটা কথা তোমায় বলতে আমি নিজেই এলাম অম্বুজ! এ চাকুরীটা তুমি নাই বা নিলে। আমি বলি,—জ্যোতিষে তোমার বেশ দখল আছে। তুমি ব্যবসা সুরু ক'রে দাও।

পুরাতন পুঁথির রেকর্ড-কীপারের চাকুরী। কোন ঝামেলা নেই। অধ্যাপক সেন আমায় ভালও বাসেন। কিন্তু এ কি বলছেন তিনি? সঙ্কোচের সঙ্গে উত্তর দিই,—ব্যবসা করব? কিসের ব্যবসা স্যার?

অধ্যাপক সেন হাসিমুখে জবাব দেন, জ্যোতিষের ব্যবসা। এ ব্যবসায় তোমার ভালই হবে।

অধ্যাপক সেনের কথা শুনে ক্ষোভ হ'ল। চাকুরিটা তা'হলে হবে না। অধ্যাপক সেন শেষে বিরূপ হলেন। নিশ্চয় গৌরদাস পণ্ডিতকে তিনি চাকুরীটা দেবেন! আমার দৃষ্টি নত হয়ে গেল। আমাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে অধ্যাপক সেন বললেন,—কি ভাবছ অম্বুজ! তোমায়

এ চাকরী দিলে, তোমারই ক্ষতি হবে। জীবনে এ ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না। পুরনো পুঁথি ঘেঁটেই শিশির মারা গেল। জেনেশুনে তারই জায়গায় তোমাকে বসাতে পারব না।

বৃদ্ধ অধ্যাপকের মমতাভরা সুর আমাকে কতকটা উৎসাহ দিল। তাঁকে বললাম,—চাকরীটা পেলে আমার ভাল হত স্যার! একটা নিশ্চিত অবলম্বন জুটলে আমার জ্যোতিষের রিসার্চটাও চালাতে পারতাম।

হাসিমুখে তিনি জবাব দেন,—পাগলামি ছেড়ে দাও বাবা! ছেলেদের ছক দেখে তাদের ভবিষ্যৎ তৈরী করবে তুমি?

—হ্যাঁ স্যার! মানুষের ভবিষ্যৎ জেনে নিয়ে সেই পথেই তাদের চালিয়ে দিতে হবে।

—ভুল করবে অম্বুজ! এ বড় কঠিন কাজ! শিব গড়তে গিয়ে শেষে বানর গড়া হবে। তোমার ভুলের জন্যই কারো জীবনটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে!

—জ্যোতিষের ব্যবসা করলেও যে বিপদ আছে স্যার?

—না, না। তুমি তো মানুষকে গড়ে তুলতে যাবে না। লোকের ভাল-মন্দ গণনা ক'রে দেবে। দু'এক বছরের মধ্যে তোমার বেশ নামডাক হয়ে যাবে অম্বুজ! টাকাকড়ির ভাবনা তোমার থাকবে না।

—মানুষের অদৃষ্ট নিয়ে ছিনিমিনি খেলার ব্যবসা করতে আমার প্রবৃত্তি নেই স্যার? আর জ্যোতিষের আমি কি-ই বা জানি?

—বেশ জান। তুমি যা জান, বলতে পার। ওই পেশাদারেরা অনেকেই তা জানে না অম্বুজ!

—কিন্তু বড় ভয় ক'রে স্যার। লোকের কাছ থেকে যখন পয়সা নোবো, তখন তাদের সব কিছু মিলিয়েও দিতে হবে।

—আমি বলছি, তুমি পারবে। এত ঘাবড়াও কেন?

—না, স্যার! আমার রিসার্চটা শেষ করতে দিন। মানুষ গড়ে তোলার সূত্রটা আমি জ্যোতিষ থেকে বের ক'রে নিই। ছেলেদের ভবিষ্যৎ জেনে নিয়ে তাদের সেই পথে ঠেলে দিতে হবে।

হোঃ হোঃ ক'রে হেসে ওঠেন বৃদ্ধ অধ্যাপক। তারপর তিনি বললেন,—তা'হলে যে ছেলে ডাকাত হবে, চোর হবে, তাকে চুরির পথে, ডাকাতির পথে এগিয়ে দিতে হবে তো! পাগলামি ছাড় অম্বুজ! অদৃষ্ট খণ্ডানো যায় না, আর তা জেনেও কোন লাভ নেই।

অধ্যাপক সেনের কথায় মনটা দমে যায়। সত্যিই তো,—যে ছেলে চোর হবে, ডাকাত হবে, তার আমি কি করব? না, না, তারও একটা উপায় বের করতে হবে। যাতে ক'রে ভবিষ্যতে কুফলটাও ঠেকিয়ে রাখা যায়। অধ্যাপক সেনকে বললাম,—নিশ্চয়ই তার কোন প্রতিবিধান আছে স্যার।

অধ্যাপক সেন আবার উচ্চহাস্যে জবাব দেন,—তার মানে যাগ-যজ্ঞ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, কবচ-মাদুলির ব্যবস্থা করবে, এইত?

তাঁর কথায় লজ্জিত হয়ে পড়ি। তিনি আমায় ভুল বুঝেছেন। এ ছাড়া কি আর কোন প্রতিবিধান নেই? এই প্রশ্নই দিনের পর দিন আমার মাথা গুলিয়ে দিচ্ছে।

বৃদ্ধ অধ্যাপক বললেন,—হ্যাঁ, তুমি মানুষ গড়ে তুলতে পারবে অম্বুজ! তাই তোমাকে শিক্ষাব্রতী হতে বলেছিলাম। ছেলেদের অন্তরের মানুষকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। তার জন্যই শিক্ষকের জীবন। সেই শিক্ষক হবার ক্ষমতা আছে তোমার। তাদের মনকে তোমায় মনের সাহায্যে জয় করতে হবে। ছক নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রে কি তাদের অন্তরের মানুষের খোঁজ পাবে অম্বুজ?

—তা'হলে কি করব স্যার?

—বলেছি তো, মাষ্টারি কিংবা জ্যোতিষী—দুটোর একটা তোমায় বেছে নিতে হবে। একটায় আর্থিক কষ্ট, অপরটায় প্রচুর পয়সা! আমায় আজই জানিয়ে দিও বাবা! আমি তার ব্যবস্থা করব।

অধ্যাপক সেন চলে গেলেন। তাঁর কথাগুলি আমার কানে ঝঙ্কার দিতে লাগল।—যে ছেলে চোর হবে, যে ছেলে ডাকাত হবে, তাকে কি ডাকাতির পথে এগিয়ে দিতে হবে? না, না, তা হয় না। আমি শিক্ষাব্রতীই হব। আমার অন্তরের শক্তি ও সাধনা দিয়ে তাদের অন্তরের শিবকে জাগিয়ে তুলব। অশিবকে মাথা তুলতে দেবো না। চিন্তাধারায় ভেসে চলি, সামনে ছড়ানো ছকগুলি বাতাসের ঝাপটায় উড়ে যায়।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি সে খেয়ালই নেই। হঠাৎ মনে হল আগুন লেগেছে কোথাও। ঐ যে আকাশের কোলে আগুন। তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমার দাদা। আতঙ্কে শিউরে উঠলাম, হয়ত চীৎকারও করেছিলাম।

আবার এ কি হ'ল ? কাজরী কোথা থেকে এখানে এল। বড় লাজুক মেয়ে, বড় অভিমানী। কথায় কথায় খেপে যায়। শহরের ওপর ভারি চটা সে। পিসীমাকে ভালবাসে, তাই আসে এখানে। শঙ্কর খেপায়। ভাই আর বোনে খুনসুটি লেগেই আছে! শঙ্কর-জননী হাসেন। কাজরী অদৃশ্য হয়ে গেল! না, না, এ যে পরিচিত মূর্তি! সুব্রতা দাঁড়িয়ে আছে! চিতা জলছে! গাঙের ধারে। সুব্রতা মরে গেছে! সতেরো বছর আগে সুব্রতা মরে গেছে! হাসছে সুব্রতা। শাপ-মোচন হয়েছে তার! সুব্রতা কাজরীর মধ্যে লুকিয়ে গেল,—আমি কি ছায়াছবি দেখছি! একই মূর্তি, একবার সুব্রতা আর একবার কাজরী!—কাজরী! কাজরী!

আমি কাজরী নই অম্বুজ! স্বয়ং শঙ্কর! তোমার নিশ্চয়ই দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটেছে!—হাসিমুখে শঙ্কর এসে সামনে দাঁড়ায়। চম্‌কে উঠি শঙ্করের গলার আওয়াজে। আমি কি স্বপ্ন দেখছিলাম ? সংশয় ও সংকোচ মনে জাগে। শঙ্করকে বললাম,—নিশ্চয়ই কাজরী তোমার সঙ্গে এসেছে।

শঙ্কর উত্তর দেয়,—ড্যাম ইওর কাজরী। সে তোমার এই মেসে আসবারই মেয়ে। নেহাৎ সিনেমা দেখতে ভালবাসে, তাই আমাদের বাড়ি আসে। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, মাটি আঁকড়ে থাকতে চায়। তাই তো মামাবাবু তার বিয়েই দিতে পারছেন না!

আশ্চর্য হই শঙ্করের কথা শুনে। পল্লীগ্রামের জমিদার। পাকা বাড়ি, খেত-খামার কত কি আছে শুনেছি। কাজরী দেখতে শুনতেও মন্দ নয়। লেখাপড়া অবশ্য বেশী করেনি। কিন্তু জমিদারের মেয়ে শহরে থাকতে চায় না। আশ্চর্য! শঙ্করকে বললাম,—কি বলছ, বিয়ে দিতে পারছেন না ?

—না। মামাবাবু চান শহরের শিক্ষিত ছেলে! আর কাজরী চায় শিক্ষিত হোক ক্ষতি নেই, কিন্তু পাড়াগাঁয়ে থাকতে হবে। বুঝলে ? —হোঃ হোঃ ক'রে হাসতে থাকে শঙ্কর।

তারপর শঙ্কর বললে,—তোমার জ্যোতিষ দিয়ে তার কোন কিনারা করতে পার অম্বুজ ?

—নিশ্চয়ই পারি! তার ছক আছে ?

—কি আছে না আছে মা-ই বলতে পারবেন।

—বেশ! না থাক্ ক্ষতি নেই। তার হাতটা দেখব।

—তা'হলে কালই আমার সঙ্গে সেই অজ পাড়াগাঁয়ে যেতে হবে।

—কেন? কাজরী আবার চলে গেছে?

—নিশ্চয়ই। আজই সে চলে গেছে। মামাবাবু এই মাঘেই তার বিয়ে দিতে চান। কাল আমি যাব সেখানে। তুমি যাবে অম্বুজ? বড় সুন্দর জায়গা. হাজার বছরের পুরনো নগরীর ধ্বংসাবশেষ রয়েছে সেখানে।

—কিন্তু কালই? অধ্যাপক সেন কি যেতে দেবেন? তাঁকে শেষ কথা জানিয়ে দিতে হবে।

—কি জানিয়ে দেবে?

—কি করব, মাষ্টারি না জ্যোতিষ।

—দূর, দূর জ্যোতিষ ক'রে কি হবে? শিক্ষিত লোক কি এ সব কাজ করতে পারে?

—শিক্ষিতেরা করে না বলেই জিনিসটা তলিয়ে যাচ্ছে শঙ্কর!

—দেখ! তোমার যা ইচ্ছে করতে পার। এখন কাল যাবে কিনা বল? সকাল ন'টায় ট্রেন। তার আগে অধ্যাপক সেনকে যা বলবার বলে দিও। এখন চল একটু ঘুরে আসি।

দু'জনে পথে নামলাম। কলেজ স্কোয়ার পুলিসে ঘিরে ফেলেছে। লাঠি কাঁধে সারি সারি পুলিস দাঁড়িয়েছে। মাঝে মাঝে সার্জেণ্টগুলো এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি হিংস্র তাদের দৃষ্টি! শঙ্কর বললে,—ভাই, আর এগিয়ে লাভ নেই। চল, বাড়ি ফিরে যাই। এক্ষুনি দমাদম লাঠি পড়বে।

আমরা মির্জাপুর স্ট্রীট ধরে শঙ্করদের বাড়ির দিকে এগিয়ে চললাম। পেছনে আওয়াজ এল—"বন্দে মাতরম্"। ছুটে আসছে লোকগুলো! এক ভদ্রলোকের কপাল কেটে রক্ত পড়ছে। এক হাতে কপালটা চেপে ধরে তিনি ছুটে এলেন আমাদের দিকে। তারপর হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন।

ডাণ্ডি অভিজান! লবণ সত্যাগ্রহ!

পশ্চিমবঙ্গের পল্লী-চিত্র বিস্ময় জাগায়। সাতশো মাইল দূরের আমার সেই পল্লীজননী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হাসেন! সেই ঘন-বসতি পল্লীরাণীর পাশে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ছাপ-লাগা সেই পল্লী। বড় বড় পাকা বাড়ি ভেঙ্গে পড়ছে। লোক নেই, জন নেই! বিরল-বসতি পাড়া-গাঁয়ের ভদ্রলোকেরা আজ শহরবাসী।

তবু সুন্দর লাগে। এর শ্যামল মাঠ, গাছের ছায়ায় হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। মাঠ ভরা ধানের ক্ষেত, এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে এবড়ো-খেবড়ো খেজুর গাছ। কলসী ঝুলছে গাছের গলায়। ধানের মরাই দেখে দূর থেকে মনে হয়েছিল,—হলুদ রঙের মন্দির গাছপালার মাঝে মাঝে উঁকি মারছে। গাঁয়ের বুকে মুক্ত আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে পূব দিকে ফিরে তাকাই, স্মৃতির পাতা খুলে যায়!

কৈশোরের স্বপ্নের কথা মনে পাড়,—এ যে আমার বড় পরিচিত! এই কি সুব্রতার দেখা তপোবন? না, না,—স্বপ্নঘোরে ত্রিকালদৃষ্টি এই গাঁয়েরই স্বপ্ন দেখিয়েছিল! ঐ যে ক্ষেত্রদিদি! অঙ্গুলি নির্দেশে কি দেখিয়ে দিচ্ছেন?

শঙ্কর হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এসে বললে,—চল অম্বুজ! তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। আর তুমি কিনা এই মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছ? ছিঃ ছিঃ। কি দেখবার আছে এখানে? চল, মামাবাবুর বন্দুক নিয়ে শিকারে যাই।

শঙ্করকে বললাম,—না ভাই! শিকার-টিকার আমি করতে পারব না। বরং পুরনো পুরীটা দেখতে চল।

শঙ্কর বললে,—আমি ক'দিন ধরে লক্ষ্য করছি, তোমার যেন কি হয়েছে। একা বিড় বিড় করে কি কথা বল, তার কোন মানেই হয় না। তন্ময় হয়ে এক একবার চুপ ক'রে বসে কি যেন ভাবো, বুঝতে পারিনে।

জবাব দিই,—না, কিছুই হয়নি তো।

শঙ্কর হুঙ্কার দিয়ে বলে,—নিশ্চয়ই হয়েছে। সকালে কাজরীর হাত দেখলে অথচ কোন কিছুই বললে না কেন? নিশ্চয়ই সাংঘাতিক কোন কিছুর আভাস পেয়েছ!

—না ভাই! কাজরীর হাতে খারাপ কিছুই নেই, কিন্তু বিচিত্র আর অদৃষ্ট!

—এ্যাঁ, কি বলছ? কি আছে তার অদৃষ্টে?

—কি বলব তোমাকে শঙ্কর! আমি নিজেই বুঝতে পারছি নে। মানুষের ভাষার বাইরেও একটা ভাষার তরঙ্গ বইছে। আকাশে-বাতাসে সে তরঙ্গ মাঝে মাঝে মানুষের কানে বুদ্ধির অগোচর অনেক কথা বলে যায়। কাজরীর হাত দেখতে গিয়ে আমি সে ভাষা শুনতে পেয়েছি। হাতের ভাষায় তা ধরা পড়ে না।

শঙ্কর বললে,—দেখ ভাই! ওসব হেঁয়ালি ছেড়ে দাও! আমরা কাজরীকে নিয়ে বড় দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছি। যখনই কোন ভাল সম্পর্ক আসে তখনই

কোন না কোন বিভ্রাট ঘটে। মামাদের একমাত্র মেয়ে কাজরী। মেয়ের আবার কত বায়নাক্কা।

—আচ্ছা, কাজরীর বয়স এখন সতের হবে না?

—হ্যাঁ, ঠিক সতের হবে।

—খুব বদরাগী, না? মাঝে মাঝে ফিট হয়, আর আবোল-তাবোল বকে?

সংশয়াকুল স্বরে শঙ্কর বলে উঠলো,—এই তো তুমি সবই ঠিক ঠিক বলছ। বল ভাই ওর কি কোন ফাঁড়া-টাড়া আছে?

শঙ্করকে আশ্বস্ত ক'রে বলি,—না, এবার সেরে উঠবে সে। শীগ্‌গির তার বিয়ে হবে। সুখী হবে সে, কিন্তু নতুন সংসারে অনেক ঝামেলা, অনেক দুঃখ কষ্ট।

শঙ্কর বলে,—সুখী হবে, অথচ দুঃখ কষ্ট পাবে—এ আবার কি কথা?

জবাব দিই,—তুমি বুঝবে না শঙ্কর, আর তোমায় আমি বোঝাতেও পারব না। বশিষ্ঠের আশ্রমেও দুঃখ কষ্ট ছিল, তা বলে অরুন্ধতী দুঃখী ছিলেন বলা চলে না।

শঙ্কর হো হো ক'রে হেসে ওঠে,—তোমার সবই হেঁয়ালি অম্বুজ! সবই হেঁয়ালি। আর কোন হদিস দিতে পার?

উত্তর দেই,—না ভাই! বলেছি তো সেই ভাষার তরঙ্গ আমার সব গুলিয়ে দিয়েছে।

শঙ্কর বলে,—তোমার হেঁয়ালি তোমারই থাক অম্বুজ! বশিষ্ঠকে পেলে তো এ অরুন্ধতীর জীবন ধন্য হয়ে যাবে। তোমার কথাবার্তা আমারই মাথা গুলিয়ে দেয়। চল এখন সেই মন্দির-পাট দেখে আসি।

শঙ্কর আর আমি পাশাপাশি চলেছি। হাজার বছরের সাক্ষ্য সেই রাজপুরী দেখতে। আমার মানস-নেত্রে তখন ছোটবেলার ছবি একে একে ভেসে উঠছে। সতের আঠারো বছর আগে সুব্রতা মারা গেছে। কাজরীর হাত দেখে তখন কিছুই বলিনি। তার হাতের ভাষা আমার মনে তখন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছিল। তার মাঝে সুব্রতার ছায়া দেখেছিলাম। ভাটির হাসিমুখও উঁকি-ঝুঁকি মেরেছিল! এটা দৃষ্টিবিভ্রম না ত্রিকাল-দৃষ্টি! দ্বন্দ্ব চলেছে মনে। এরা যে তা বুঝবে না।

পাড়াগাঁয়ের পথ। দু'পাশে ঝোপ-ঝাড় আর জঙ্গল। মজা দীঘি আর

ডোবা। আশে-পাশে দেখা যায় খড়ো বস্তি। বাউরি-বাগ্দীদের বাসা। বড় রাস্তার পরে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে কোলাহল শুনতে পাই। শঙ্কর বলে উঠল,—ওই দেখ মন্দির দেখা যাচ্ছে।

প্রকাণ্ড চত্বর। জানা অজানা কত বড় বড় গাছ। যুগ যুগান্তের সাক্ষ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মহাপাদপ বট। শাখা-প্রশাখা থেকে ঝুরির জটা নেমেছে ভূমিতে। একটি দুটি নয়, চারিপাশে সারি সারি বৃদ্ধ তপস্বী যেন কতকাল ধরে তপস্যা করছে। তাদের মাঝখানে যোগাসীন যোগেশ্বর শিব। মন্দির নয়, যেন জটাজাল বিস্তার ক'রে স্বয়ং মহাদেব ত্রিশূল হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

মন প্রাণ ভরে উঠল। ভক্ত নরনারী পূজো দিয়ে কোলাহল করে বেরিয়ে যাচ্ছে। শঙ্কর ঘুরে ঘুরে আমাকে প্রাচীন রাজপুরীর ধ্বংসাবশেষ দেখাতে লাগল।

—এই দেখ অম্বুজ! কত মূর্তি বেরিয়েছে মাটির তলা থেকে! হাজার বছর আগেকার কুয়ো, এই দেখ ছোট ছোট ইট। এ রকম ইট মহাস্থানগড়ে পাওয়া গিয়েছে। হর-পার্বতীর মূর্তি দেখেছ? কৃষ্ণ প্রস্তরে কি নিখুঁত মূর্তি খোদাই ক'রে গেছে কোন অজানা ভাস্কর!

শঙ্করের উৎসাহের অন্ত নেই। পুরাতত্ত্বের ছাত্র শঙ্কর!

ক্লান্ত হয়ে দুপুরবেলা দু'জনে কাজরীদের বাড়ি ফিরে এলাম। খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রাম করছি। শঙ্কর নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। আমি বসে বসে সেদিনকার খবরের কাগজ পড়ছিলাম, কিন্তু আমার মনোজগতে তখন এক তোলপাড় চলেছে।

এমন সময় কাজরী আমার কাছে এসে বললে,—আজই তো আপনারা চলে যাবেন। আচ্ছা, আমার হাতে কি দেখলেন বলুন তো?

তার মুখে ব্যগ্রতা ও ঔৎসুক্য ফুটে উঠেছে। তাকে আশ্বস্ত করবার জন্য বললাম,—তুমি সুখী হবে কাজরী। আর কোন কিছু আমায় জিজ্ঞেস করো না।

—সুখী হতে পারি, কিন্তু সে বোধ হয় হবে না—কাজরীর চোখে বিদ্যুৎ খেলে যায়, সে আর কোন কথা না বলে ছুটে পালিয়ে গেল।

সেই পাষাণপুরীর বুকে খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। কোথাকার ঢেউ কোথায় গড়ায়! বর-বেশে যেতে হবে সেই হাজার বছরকার পুরনো

পল্লীতে। অধ্যাপক সেন আমার কোন ওজর-আপত্তিই শোনেন নি। তাঁর স্নেহ-মধুর আশীর্বাণী কানে ভেসে আসছে,—আকাশের অসংখ্য তারার মুখেও সেই একই কথা,—তুমি অসহায় অম্বুজ! সহায় পাবে। ছন্নছাড়া জীবনে ছন্দ বেজে উঠবে। কাজরী তোমায় সুখী করবে।

অদূরে পার্কে দেবদারু গাছের ফাঁক দিয়ে আধ ফালি চাঁদ উঁকি মারছে। পূর্বাকাশে জ্বল জ্বল করছে কালপুরুষ—হাতে ধনুক, কোমরে কোমরবন্ধে তরবারি ঝুলছে। তারকার মালা ফুটে রয়েছে তার আশেপাশে। ঐ যে পুচ্ছ মেলে রয়েছে বিশাখা! রাশিবলয় দেখা যাচ্ছে। তাদের ভাষা পাঠ করছে মানুষ। তারাই মানুষের অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রণ করছে। কি আশ্চর্য! কালপুরুষ কি ইঙ্গিত করছে?

অতলান্ত এই আকাশ-সমুদ্র! অগণিত গ্রহ-নক্ষত্র পাহারা দিচ্ছে এই পৃথিবীকে। পৃথিবীর মানুষের জন্যই কি এদের সৃষ্টি? নিশ্চয়ই। সূর্য আলো দিচ্ছে, বরুণ জলধারা বর্ষণ করছে, আকাশ-বাতাস সবই এই পৃথিবীর মানুষের পরিচর্যা করছে অনন্তকাল ধরে। ধ্যানমগ্ন মহাকাল,—আদি নেই, অন্ত নেই। তারই বুকে চলেছে প্রকৃতির খেলা,—ভাঙ্গা আর গড়া।

বিজ্ঞানী অধ্যাপক সেন বলেছেন,—সমস্ত বিশ্বটাই এক সুরে এক উপাদানে গড়া। অণু-পরমাণুতে ছেয়ে আছে বিশ্বজগৎ। তাদেরই রূপান্তর ঘটছে। তোমাতে আমাতে চলেছে একই পরমাণুর খেলা। সমস্ত বায়ুমণ্ডল, শুধু বায়ুমণ্ডল কেন, সমস্ত শূন্যমণ্ডল জুড়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণু-তরঙ্গ চলেছে। তুমি, আমি, আর যারা দূরে আছে, কিংবা মরে গেছে, তারাও আছে এরই মধ্যে। কখনও বা তারা রূপ নিচ্ছে, কখনও বা অরূপই থেকে যাচ্ছে। বিজ্ঞানী বিজ্ঞানে, যোগী যোগে, ঋষি ধ্যানে তার অনুভূতি পায়। তাকে ধরতে চেষ্টা করে।

বৃদ্ধ অধ্যাপকের কথা যেন আমার সন্দেহাকুল মনের সংশয় দূর করে। বলতে ইচ্ছে হয়,—হ্যাঁ পেয়েছি, পেয়েছি, তার সন্ধান পেয়েছি। পরমাণু-তরঙ্গ রূপ আর অরূপের খেলা করছে। তাকে ধরা যায়। যে বহুদূরে আছে সে নিমেষে নিমেষে আমাকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। ব্যোমমণ্ডল জুড়ে যে অরূপ খেলা করছে, তাকে রূপ দিতে পারে মানুষের মন। হারিয়ে-যাওয়া কথা, হারিয়ে-যাওয়া গান, বাতাসে মিলিয়ে-যাওয়া সুরলহরী, আর পঞ্চভূতে মিশে-যাওয়া দেহ মন মিশে আছে এই মহাব্যোমে। তারাও রূপ নেয়, তারাও ফিরে

আসে। জন্ম-জন্মান্তরের স্রোত চলেছে অনন্তকাল ধরে। মানুষ যদি জাতিস্মর হ'ত? না, না—তা'হলে যে সেই জাতিস্মরতা অভিশাপ হয়ে উঠত,—পূর্বজন্মের স্বত্ব নিয়ে লড়াই সুরু হ'ত। সমস্ত সৃষ্টিধারাই ভণ্ডুল হয়ে যেত।—হাসি পায়।

শঙ্কর এসে আমায় রূঢ় বাস্তবে নামিয়ে আনলে। অনুযোগের সুরে সে বললে,—এই যে অম্বুজ! অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কি করছ? কখন জিনিসপত্র পাঠিয়ে দিয়েছ, তবুও কি তোমার কাজ ফুরোয় না? তোমার দেরি দেখে মা আমায় পাঠিয়ে দিলেন, চল, শীগগির চল। কত আচার অনুষ্ঠান রয়েছে।

শঙ্করকে বললাম,—যাচ্ছি ভাই! আমায় একটু ভাবতে দাও। সাতশো মাইল দূরে যাদের ছেড়ে এসে আজ জীবনে এক নতুন পথে পা বাড়াচ্ছি, তাদের কথা আমায় ভাবতে দাও।

—ছিঃ! তুমি বড় সেন্টিমেণ্টাল অম্বুজ! তোমার দাদা তো আসতে পারবেন না। আর কে-ই বা আছে?

শঙ্করের কথাগুলো যেন কশাঘাত করল অনুভূতির পর্দায়। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে জবাব দিলাম,—কে বললে নেই? তুমি কতটুকু জান শঙ্কর? আমার সবই আছে—।

শঙ্কর সহাস্যে জবাব দেয়,—বেশ, স্বীকার করছি ভাই! কিন্তু তারা কেউ নিশ্চয়ই এত দূর দেশে তোমার বিয়েতে আসবে না।

—নিশ্চয়ই আসবে। তুমি দেখে নিও।

—ভাল কথা। এখন চল, আমি মেসের ম্যানেজারকে বলে সব ঠিক ক'রে রাখছি।

শঙ্কর আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠল। আমার মন তখন পূর্বদিকে চলেছে,—সাতশো মাইল দূরের আমার পল্লী-মায়ের ছবি দেখছি,—ফেলে-আসা মুখগুলি হাসিমুখে সামনে দাঁড়িয়েছে। দিব্যনাথ আর চন্দ্রনাথ আশীর্বাদ করছেন। নমিতাবৌদি শাঁখ বাজাচ্ছেন। দাদার মেয়ে খুকী হলদে শাড়ী পরে হাসছে আর হাততালি দিচ্ছে।

মোটর থেকে নামতেই শাঁখ বেজে উঠল।

জীবনধারায় নতুন প্রবাহ। অতীতের দিকে ফিরে তাকাবার আর অবকাশ নেই। রূঢ় বাস্তবের আঘাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন অধ্যাপক

গেল। গাঁয়ের মাটি, গাঁয়ের আকাশ আবার ডাকতে রয়েছে। পাষাণ-পুরীর মোহজাল থেকে মুক্তি পাবার সুযোগ পেয়েছি।

ছন্নছাড়া জীবনে পেয়েছি ছন্দের সন্ধান। আমি আর একা নেই, কাজরী এসেছে জীবনে ভাগ বসাতে,—আমার সুখ-দুঃখ, আশা-আনন্দের ভাগ। এক যে বহুধা বিভক্ত হতে চলেছি। আমার চিন্তাধারা. মনের আবেগ, এমন কি হৃদয়ের স্পন্দনও যেন তার মনের তারে ধরা পড়ে! কোন কিছুই লুকোবার উপায় নেই।

বাপ-মায়ের আদরের মেয়ে কাজরী। তার দায়িত্ব মন্ত্রের মারফৎ আমার ঘাড়ে তুলে দিলেও বাস্তবক্ষেত্রে তার কোন পরিবর্তন আসেনি। প্রাচুর্যের মাঝে থেকেও অতৃপ্তি জেগে ওঠে। নীড় বাঁধতে চায় পাখী। কাজরী বলে,—এখানে আর ভাল লাগে না। চল, আমায় কলকাতায় তোমার কাছে নিয়ে চল।

নিজের অসামর্থ্য স্মরণ ক'রে শঙ্কিত হই। কাজরীকে আশ্বস্ত ক'রে বলি,—যাক্ আরো দু'চারদিন। ভাল বাড়ি খুঁজছি।

কাজরী বলে,—বাড়ি খুঁজছ কেন? দুএকখানা ঘর হলেই আমাদের চলবে।

কি বলব তাকে ভেবেই পাইনে। সে যে কত হাঙ্গামার ব্যাপার! ঠাকুর, চাকর, ঝি,—হাট-বাজার কে কি করবে? এত টাকাই বা কোথায়? কাজরীকে বলি,—হ্যাঁ এবার তোমায় নিয়ে যাব।

কাজরী বলে,—এত ভাবছ কেন? আমিই সব গুছিয়ে নেবো। ঠাকুর, চাকর আর ঝিয়ের দরকার হবে না। দু'জনের বেশ চলবে। তারপর—কাজরী থেমে যায়, সলজ্জ হাসি ফুটে তার মুখে।

কাজরীর মুখের অসমাপ্ত কথা পূরণ করি,—তারপর খোকা আসবে, তাকে নিয়ে খেলা করবে। কাজরী "ধ্যেৎ" বলে পালিয়ে যায়।

কাজরীর মাঝে এসেছে এক অভিনব পরিবর্তন। উচ্ছল-প্রকৃতি তেজোদীপ্ত তরুণীর মাঝে দেখি শান্ত-মধুর ভাব। সেই ভাবের আবেগে তার পদক্ষেপ, তার হাসি, তার সমস্ত কার্যকলাপ যেন নিয়ন্ত্রিত হয়ে চলেছে।

নারীজীবনের এ পরিবর্তন লক্ষ্য ক'রে বিস্ময় বোধ করি। কাজরী নারী,—মানবকে ধরে আছে এই নারী। নারী না থাকলে নরের কল্পনা, নরের আদর্শ কি রূপ পেত? নারীই সৃষ্টির সহায়। এত অন্তরঙ্গতা নারী

ছাড়া আর কার পক্ষে সম্ভব? আমার সুবিধা-অসুবিধা, পছন্দ-অপছন্দ, ভাল-লাগা, না-লাগা, কখন কি দরকার—সবই তার নখদর্পণে। আশ্চর্য করে কাজরী! এ যে অভিনব অভিজ্ঞতা। মনস্তাত্ত্বিকের তত্ত্ব স্বীকার করতে পারি নে। নিশ্চয়ই নর আর নারীর মধ্যে দেহ-মনে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে আরো একটা কিছু রহস্য রয়েছে।

হ্যাঁ, নীড় বাঁধতে হবে। কাজরীকে সুখী করতে হ'লে কলকাতায় ঘর ভাড়া ক'রে থাকতে হবে। কিন্তু কাজরীর বাপ-মা কি তাতে রাজী হবেন? শঙ্করই বা কি বলবে? না, অধ্যাপক সেন সহায় আছেন। তিনি বলেছেন,—আরো দিনকতক যাক, আমি তার ব্যবস্থা ক'রে দেবো।

অধ্যাপনার কাজ পেয়েছি। কিশোর আর তরুণের দল আসে আর যায়। কোন দায়িত্ব নেই। লেক্‌চার দিয়েই খালাস। মনে হয়,—অরণ্যে রোদন করছি। অমিয়, মুকুল আর সুধাংশুর কথা মনে পড়ে, তারা আর এরা! এরা যে দেশের ভবিষ্যৎ। হাজার তরুণের মাঝে কি দশটি অমিয়, কিংবা সুধাংশু লুকিয়ে আছে? তা যদি না থাকে, তা'হলে সবই অন্ধকার। রুটিন মাফিক কাজ চলে। ঘণ্টা বেজে যায়।

শাঁখ বেজে উঠল!—হ্যাঁ, ঠিক বারোটা পনের মিনিট।

দেওয়ালে ঘড়ি টিক্‌ টিক্‌ করছে। আমার টেবিলেও রিস্টওয়াচটা জলছে। তার রেডিয়ম ডায়েলগুলো জোনাকির আভা ছড়াচ্ছে। দুটো ঘড়িই এক কথা বলছে,—ঠিক বারোটা পনের।

ছক কেটে বসে আছি। লগ্নটা বসিয়ে দিলাম। তুলা লগ্ন,—হ্যাঁ তুলা লগ্নই ঠিক। আধ ঘণ্টা আগে হলেই বিপদ হ'ত, ঘণ্টা দেড়েক দেরী হলে বৃশ্চিক হয়ে যেতো। আঃ! বাঁচলাম। তবু কি বিপদ কেটে গেছে? মাথা গুলিয়ে যায়। হাত-পা, চোখ-মুখ সব নিখুঁত আছে তো? বাঁচবে তো সে?

কাজরীর গোঙানি কানে ভেসে আসছে। কি অসহ্য যন্ত্রণা! মা হওয়ার কি দারুণ অভিশাপ! আমার উৎকণ্ঠা বেড়েই চলেছে। ঝিমঝিম করছে মাথাটা। তার গোঙানির প্রত্যেকটি শব্দ যেন তীরের মত বিঁধছিল আমার বুকে।

শাঁক বেজে উঠল,—এক,—দুই, তিনবার!

কাজরীর কোলে ছেলে এসেছে! খিল্ খিল্ ক'রে সে হেসে উঠেছে। নন্দাদি! কাজরীর সইদিদি। উচ্ছ্বাসে আবেগে যেন আত্মহারা হয়েছে সে। ছুটে এসেছে নন্দাদি আমার কাছে—সোনা এসেছে অম্বুজবাবু! মানিক এসেছে কাজরীর কোলে! বকশিস চাই!

বুকটা যেন আবেগে ফুলে ওঠে,—কাজরীর ছেলে হয়েছে। দাঁড়াও নন্দাদি। জন্ম কুণ্ডলীটা দেখি,—এই যে লগ্নে বৃহস্পতি, স্বক্ষেত্রে শনি, শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ আকাশে হাসছে। নাঃ! রাহু আর মঙ্গল সব গোলমাল ক'রে দিলে। রবি পড়েছে তাদের আওতায়! রিষ্টি! রিষ্টি আছে কিনা দেখি,—ফাঁড়া।

—আস্ত পাগল তুমি, এই ক'রে ফাঁকি দেবে মনে করেছ? তা হবে না। ছিঁড়ে ফেল এসব ঠিকুজী-কোষ্ঠী। চল, চল, কেমন হয়েছে দেখবে চল—নন্দাদি আমার হাত ধরে টানাটানি করে।

—দাঁড়াও নন্দাদি, আগে ছকটা দেখি। এই নাও তোমার বকশিস—পকেটে হাত দিয়ে যা ছিল বের ক'রে নন্দাদির সামনে ছুঁড়ে দিলাম। হেসে লুটোপুটি খায় নন্দাদি।

—ছিঃ ছিঃ! পাগল তুমি। শীগগির চল।

নন্দাদি চলে গেল। নবজাতকের জন্ম-কুণ্ডলী দেখতে লাগলাম। তার প্রতি পদক্ষেপ স্থির ক'রে নিতে হবে। তার ভবিষ্যৎ থাকবে আমার নখদর্পণে! মহীয়ান্ গরীয়ান্ ক'রে গড়ে তুলব তার জীবন। নবজাতকের জন্ম-কুণ্ডলী—এ কি? শনি, রাহু, মঙ্গল আর রবি বাধা দেবে। এই, এই যে, সবই পরিষ্কার হয়ে গেছে। বিপদ রয়েছে! অনেক বিপদ! না, না, তার ভবিষ্যৎ তাকে জানতে দেওয়া হবে না। ভবিষ্যতের ছবি সামনে ধরলে ভবিষ্যৎ যে জটিল হয়ে উঠবে! শত্রু-মিত্র, ভাল-মন্দ, বিপদ-আপদ, ঘাত-প্রতিঘাত চোখের সামনে আগে-ভাগে দেখতে পেলে ভেঙ্গে পড়বে মানুষ। চলার পথে আগেই হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে। অর্জুন বিশ্বরূপ দেখেছিল। ভীতি-বিহ্বল অর্জুনের তা সহ্য হয়নি। সংবরণ করতে বলেছিল সে বিশ্বরূপ,—বিশ্বরূপ না ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট-চক্র! অর্জুনেরও বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল বিশ্বরূপ দেখে! মানুষের ভবিষ্যৎ তার সামনে খুলে ধরলে তারও বুদ্ধিভ্রংশ হবে। না-জানার আনন্দেই উদ্যম আসে, অনুপ্রেরণা পায় মানুষ। ভবিষ্যৎকে জানতে চেয়ো না, গড়ে তোল ভবিষ্যৎ! দুর্জ্ঞেয়

সৃষ্টি-রহস্য ভেদ করবে মানুষ,—সৃষ্টির পিছনে যে পরমশক্তি রয়েছে, তাকে রূপে, রসে, গন্ধে, স্পর্শে অনুভব করবে মানুষ! হ্যাঁ পেয়েছি, পরম সত্যের সন্ধান পেয়েছি। সোনালী পর্দার আড়ালে ভবিষ্যৎ লুকিয়ে থাক। পৃথিবীর মানুষকে ডেকে বলতে ইচ্ছা হয়,—তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, মহান, বরীয়ান্ ও গরীয়ান্। তোমার ওপরেই তোমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে! সুখ, দুঃখ, ঝঞ্ঝাট, রোগ, শোক কিছুই নয়! সবই তুচ্ছ ক'রে এগিয়ে যেতে হবে! পর্দার পর পর্দা আড়াল ক'রে রেখেছে সে মহান ভবিষ্যৎকে। হিমালয়ের উত্তুঙ্গশিখরে উঠতে হবে। নবজাতকের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলবার সুযোগ দিতে হবে—উদ্যম, উদ্দীপনা দিতে হবে তাকে।

হঠাৎ এ কি হ'ল? নবজাতকের জন্ম-কুণ্ডলী আকাশে উড়ে গেল। ধ্রুবতারা হাসছে। শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ থেকে নেমে আসছে আলোর স্রোত। সে স্রোতে আলোকোজ্জ্বল কাদের মূর্তি ভেসে আসছে! আবার শাঁখ বেজে উঠল! হ্যাঁ, চিনতে পেরেছি, হাসিমুখে এগিয়ে আসছেন ক্ষেত্রদিদি। তার সঙ্গে ভৈরবী-মা। ঐ আবার কে? চিনতে পেরেছি,—ভাটি! হাতে তার বন-গোলাপের গুচ্ছ। আকাশ জুড়ে ঐ যে বিরাট ত্রিশূল! ঐ যে, ঐ যে—ভৈরব-মূর্তি নাগাবাবা!

কাজরীর কোলে শিশু হাসছে! আমার দিকে হাত বাড়ায় সে শিশু! কি সুন্দর! ধ্রুবনক্ষত্রে চিক্ চিক্ ক'রে উঠছে তার জন্ম-কুণ্ডলী,—কেন্দ্রে বৃহস্পতি! ভয় নেই, ভয় নেই! ঐ যে সারি সারি চলেছেন, এঁরা কারা! দেশের মহীয়ান্, বরীয়ান্ সব মহাপুরুষের দল! আদর্শ রাখতে হবে নবজাতকের সামনে,—জন্ম-কুণ্ডলী কিংবা শনি রাহু নয়। ক্ষেত্রদিদির কণ্ঠস্বর কানে ভেসে আসে। আবার শাঁখ বেজে ওঠে—সবাই শাঁখ বাজাচ্ছে। মা, পিসীমা, সুব্রতা, নমিতাবৌদি, কনককাকীমা সকলেই এসেছেন! সকলেরই হাতে শাঁখ।

নাগাবাবার হাতের ত্রিশূলটা যেন মানুষের মত হেসে উঠল। এগিয়ে এসেছেন নাগাবাবা। কমণ্ডলু থেকে নবজাতকের মাথায় জল ছিটিয়ে দিচ্ছেন! কাজরী অবাক হয়ে দেখছে! পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে ভৈরবী মা হাসিমুখে কি যেন বলছেন! সুব্রতা শিশুটিকে কোলে তুলে নিলে।

নির্বাক বিস্ময়ে এঁদের দেখছি। কথা বলতে গিয়ে বলতে পারি নে। হাত বাড়িয়ে প্রণাম করতে গিয়েও হাত নড়ে না। তবু জোরে চীৎকার

ক'রে ডাকি—"ক্ষেত্রদিদি!—ভৈরবী-মা!" দম আটকে যায়। চোখের সামনে থেকে কে কোথায় মিলিয়ে গেল জানি নে। শুধু কানে ভেসে এল ক্ষেত্রদিদির স্নেহমাখা কণ্ঠস্বর—"ভৃগু!" কনকচাঁপা গাছের তলায় সেই বেদী! জল ঢালছি।

আবার শাঁখ বেজে উঠল। কান্না শোনা যাচ্ছে, ছোট শিশুর কান্না!—উঁয়া, অ্যাঁ—উঁয়া! তবু শাঁখ বাজছে। খিল্ খিল্ উচ্চ হাসি! কলরোল কানে ভেসে আসছে—চাঁদ নেমে এসেছে আকাশ থেকে! নন্দাদি বলছে—ডেকে আনি অম্বুজকে! বক্শিস আদায় ক'রে তবে ছাড়ব! মিষ্টিমুখ করাতে হবে।

শাঁখ বাজছে,—তার সঙ্গে শিশুর কান্না—উঁয়া, উঁয়া, উঁয়া।

এ্যাঁ। আমি কি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম! কাজরীর ছেলে হয়েছে! ঘড়িতে ঠিক—বারোটা পনের মিনিট।

সমাপ্ত